শীশ্ মহল

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

 [মূল্য ১॥৵ টাকা।

Amulya Dhan Mukherji Managing Proprietor & Printer
METCALFE PRESS
76, *Balaram Dey Street,—Calcutta.*

শীশ্ মহল

[তস্‌বীরের মূল্য]

প্রথম পরিচ্ছেদ

"এই তস্‌বীর্ বেচিবি—বুড়ী ?"

"কেন বেচিব না বাপধন ? বেচিতেই ত বসিয়াছি।"

আগরা চাঁদনীচকের এক দোকানের সন্নিহিত গলির মুখে, পথের উপর বসিয়া, এক বুড়ী কতকগুলি ছবি বেচিতেছিল। সেই সময়ে আমি অশ্বারোহণে, সহর-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম।

ঢাল-তরোয়াল আঁটা এক সৈনিকের আবির্ভাব দেখিয়া, বুড়ী একটু থতমত খাইল। আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় বুড়ী তিন চারিখানি ভাল ভাল তসবীর লইয়া, আমার সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইল।

বুড়ীর ছবি সংগ্রহের বাহাদুরী আছে। যে তিনখানি চিত্র সে বাছিয়া আনিয়াছিল—সবই স্ত্রীলোকের। আমি অপ্সরোনিন্দিত রূপ-মাধুরীমণ্ডিত, সেই চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া বড়ই আকৃষ্ট হইলাম। প্রথম খানি হাতে লইয়া বুড়ীকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ তসবীর কার বাদ্ধি ?"

বুড়ী বলিল—"এ তস্বীর আজমীরের বিখ্যাত আমীর, সুফী সোহান উল্লার কন্যার।"

"আর এ খানা ?"

"ওটা জিন্নৎ বিবির—এই সহরের শ্রেষ্ঠ বিলাসিনী !"

জিন্নৎ-বিবিকে আমি জানিতাম। আমি বলিয়া নয়, তাহাকে ত অনেক আমীর-ওমরাহই চিনিত! জিন্নৎ—সুন্দরী, সুরসিকা, উচ্চদরে প্রেম বেচিতে সিদ্ধহস্তা। কত আমীর-ওমরাহ, তার দ্বারে গড়াগড়ি যায়!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ দুখানা তস্বীরের দাম কত ?"

বুড়ী সেলাম করিয়া বলিল—"জনাবের মরজি হইলে, এ গুলি এক এক আসরফিতে বেচিতে পারি।"

আমি নবীন যুবা, তাহাতে রূপসীর ছবি হাতে পাইয়াছি—আর বুড়ীও মনে মনে একটা দাঁও কসিয়াছে। পদোচিত ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য, বুড়ীকে তৎক্ষণাৎ দুইটী আসরফি গুণিয়া দিলাম।

তৃতীয় চিত্রখানি আমার সম্মুখে ধরিয়া বুড়ী একটু হাসিয়া বলিল—"জনাব! আপনার মত দু'পাঁচজন দানাদার খরিদদার পাইলে, এ গরীবদের পেটের ভাবনা থাকে না। এই ছবি খানা একবার দেখুন।"

ছবি হাতে লইলাম। ছবি দেখিয়া মন ভুলিল—প্রাণ মজিল, হৃদয় চঞ্চল হইল। এমন অপূর্ব্ব চিত্রিত-প্রতিমা, জীবনে কখনও দেখি নাই। কি চোখ—কি সুবঙ্কিম ভ্রু-যুগ, কি রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর, কি গুলাবদল-গঞ্জিত আরক্তিম গণ্ডদেশ!

মনে ভাবিলাম—বুড়ী হয় ত এ খানার খুবই দর হাঁকিবে। ইয়ে! সুভান্ আল্লা! ঠিক তার বিপরীত ঘটিল। দামের কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই বুড়ী বলিল—"জনাব! এ ছবির মূল্য—পাঁচ জুতি! লইবেন কি ?"

"তাজ্জব! তাজ্জব! ছবির দাম পাঁচ জুতি! আমি ত খুব এক চোট হাসিয়া লইলাম। বুড়ীর সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্পর্ক নহে যে, সে রহস্ত করিবে। কিন্তু এই কথা বলিবার পর বুড়ীর মুখখানা বড় গম্ভীরভাব ধারণ করিল। আমি ছবিখানি হাতে লইয়া সহাস্তে বলিলাম—"জুতি মারিবে কে?"

বুড়ী বলিল—"যার তস্‌বীর—সে।"

আমি। তার নাম?

বুড়ী। তা জানি না।

আমি। এ তস্‌বীর কোথায় পাইলে?

বুড়ী। এক সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীর বাঁদীর কাছে।

আমি। যার তস্‌বীর তার নাম বলিয়া দাও—তোমাকে দশ আসর্‌ফি ইনাম্ দিতেছি।

বুড়ী বলিল—"নাম বলিলে, ঐ পাঁচ পয়্‌জার আমার পিঠে পড়িবে। আমি গরীব লোক। তবে আসরফি পাইলে বোধ হয় পয়্‌জারের পাল্লাও সহিতে পারিব। জনাব! চিত্রে প্রস্ফুটিত এই অতুলনীয়া সুন্দরীর নাম "গুল্‌সানা।" তবে ইনি যে কে—তা জানি না।"

"তবে নাম জানিলে কেমন করিয়া?"

"সেই বাঁদী বলিয়াছিল।"

"সেই বাঁদী তোমার কাছে এই তস্‌বীরের মূল্য লইয়াছিল?"

"না। আর পাঁচখানা ছবি লইয়াছিলাম বলিয়া, এখানা আমাকে ফাউ দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—"খুব সাহসী, খুব প্রেমিক না হইলে, জুতির মূল্যে এ তস্‌বীর কেহ কিনিবে না। এখানি বেচিয়া তুমি অর্থ পাইবে না বটে, কিন্তু যে লইবে সে আক্কেলসেলামী স্বরূপ, তোমার কথা চিরদিন মনে রাখিবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আগে আমার আক্কেল হউক, তারপর না হয় সেলামী দিব। তোমার ঠিকানাটা বলিয়া দাও। কখনও যদি মুলাকাতের প্রয়োজন হয়!

বুড়ী বলিল—"আমাকে রোজ এই স্থানেই দেখিতে পাইবেন। এখানে না পান, আলির মা তসবীর-ওয়ালীর নাম করিলেই, লোকে আমার আবাসস্থান দেখাইয়া দিবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বহুৎ খুব! তাহাই হইবে। এই নাও, দুইটি আস্‌রফি। এই তসবীরের চিত্রিত-মূর্ত্তির নাম বলিয়া দিবার জন্য তোমায় এই এনাম দিলাম।" আমি ছবিগুলি আঙ্গরাখার মধ্যে রাখিয়া, ঘোড়ার রাশ টানিলাম। বলিষ্ঠ অশ্ব, নক্ষত্রগতিতে ছুটিয়া আমাকে গৃহে পৌছাইয়া দিল।

ধিক্ আমায়! ধিক্ আমার সৌন্দর্য্যালোলুপতায়! আমি আলি ইস্কান্দার খাঁ,—পঞ্চশতী মোগল মন্সবদার। আকবর বাদসার জানিত রাজকর্ম্মচারী। আমার এ দুর্ম্মতি হইল কেন? পাঁচ জুতির আশায়, এ তসবীর কিনিলাম কেন?

বাড়ীতে পৌছিয়া দেখিলাম, আমার প্রিয়তম বন্ধু গুরগণ আলি খান্, আমার খাসকামরায় বসিয়া কাফি খাইতেছে। গুরগণ আমায় দেখিয়া বলিল "কি—হে, মন্সবদার? আজ অত হাসিমুখ কেন?"

আমি সহাস্যমুখে বলিলাম—"আজ এক কাণ্ড করিয়াছি—দোস্ত! পাঁচ জুতির মূল্যে এই তস্‌বীরখানা কিনিয়াছি।"

"দেখিতেছি, তোমার মগজ খারাপ হইয়াছে।"

"হইবারই কথা। কিন্তু সত্য বল দেখি দোস্ত! এমন অসামান্য রূপসী রমণী কখনও চক্ষে দেখিয়াছ কি-?"

গুরগণ সহাস্য মুখে বলিল—"ছায়া দেখিয়াই মাথা খারাপ হইল! না জানি, কায়া দেখিলে কি হইবে!"

আমি দম্ভভরে বলিলাম—"খোদা করুন, আমি যেন একবার ইহাকে দেখিতে পাই! ইহাকে না পাইলে পাঁচ জুতির মজা পরখ্ হইবে না।"

গুরগণ ছবিখানা উঠাইয়া লইয়া, নির্নিমেষ নেত্রে দেখিতে লাগিল। তাহার মুখ্ ক্রমশঃ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সে বিমর্ষভাবে বলিল— "তুমি বাদসাহের মন্সব্‌দার, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। এ রমণীর ছবি ঘরে রাখিলে তোমার প্রাণ যাইবে।"

"কেন?"

"যদি আমার ভ্রম না হইয়া থাকে, তাহাহইলেই বলিতে পারি, এ ছবি গুলসানা ফরখ্‌উন্নিসার। ওর স্বামীর নামটা আমি ভুলিয়া যাইতেছি। সে একজন রাজবিদ্রোহী!"

"তুমি একে চিনিলে কিরূপে?"

গুরগণ্ হাসিয়া বলিল—"ব্যবসাদার লোক আমরা। দিনরাত কত লোকের সঙ্গে মেশামেশি করি। এর জীবন্ত মূর্ত্তি আমি যেন আর কোথাও দেখিয়াছি।"

"বটে! তা এ যেই হউক, একে আমি চাই!"

"তুমি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল!"

"তা না হয় হইলাম। কিন্তু এ উন্মত্ততার শেষ পর্য্যন্ত আমি দেখিতে চাই। গুরগণ! যোদ্ধার কাছে বিপদ অতি তুচ্ছ! নিশ্চয় জানিও তুমি দোস্ত! যে কোন উপায়েই হউক, ইহাকে আমি দেখিবই দেখিব!"

গুরগণ কাতরভাবে বলিল—"ভাই! তোমায় বিপদের মুখে কখনও আমি যাইতে দিব না। এই আমি তোমার ছবি ছিঁড়িলাম—"

সত্যই আলিজা তাহা ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি ঔৎসুক্যে

অতি আগ্রহে, বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলাম—"আমার কসম! দোস্ত! ও ছবি ছিঁড়িও না।"

গুরগণ ছবিখানি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া, কস্তুরী-বাসিত অম্বুরীর ধূমপানে নিযুক্ত হইল। এমন সময়ে একজন বাদসাহী পদাতিক আসিয়া আমায় কুর্ণীস্ করিল। আর একখানি পত্র আমার সম্মুখে ধরিল।

আলি বলিল—"ব্যাপার কি ইস্কান্দার?"

আমি পত্রপাঠান্তে চিন্তিতভাবে বলিলাম—"বাদসা আমাকে এখনি তলব করিয়াছেন। যতক্ষণ না আমি ফিরি, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর।" এই কথা বলিয়া আমি তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলসলিলা যমুনার, স্নিগ্ধ সীকর-সম্পৃক্ত সুশীতল বায়ু এক শ্বেতমর্ম্মর মণ্ডিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার অভ্যন্তরের উষ্মা দূর করিতেছিল। স্তম্ভগাত্রাবলম্বি মল্লিকা, মালতী, চামেলি, নাগকেশর ও গন্ধরাজের শুভ্র মালিকারাশি, কক্ষমধ্যস্থ অসংখ্য দীপাবলীর প্রোজ্জ্বল আভাসন্তপ্ত হইয়া, সেই গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট শীতল বহির্বায়ুতে আবার স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সেই মদগন্ধাকুলিত দীপাবলীর উজ্জ্বল শিখা সেই কক্ষের দর্পণসমূহের উপর, সুবৃহৎ হীরকখণ্ডের মত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল। আর লাল, নীল, সবুজ, জরদা প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের স্বর্ণখচিত ঝালরমণ্ডিত, গবাক্ষরাজি, এই অসংখ্য দীপাবলীর উজ্জ্বল রশ্মি বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া, তাহা পার্শ্বপ্রবাহিতা যমুনার বক্ষে প্রতিফলিত করিতেছিল। কক্ষতলে স্বর্ণখচিত, মখমল-

মণ্ডিত দীবান্, সোফা, প্রভৃতি সুখাসনের অভাব নাই। হীরকমণ্ডিত গুলাব-পাশ্ এবং আতরদানেরও অপ্রাচুর্য্য নাই। ইন্তাম্বলের চিত্তোন্মাদক সুগন্ধেরও অভাব নাই। সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকের মনোমদ সুগন্ধের সহিত, লোবানের তীব্র-মধুর গন্ধের মিশ্রণে, সে কক্ষ যেন এক চিত্তমোহকর সৌরভে আকুল হইতেছিল।

সেই কক্ষমধ্যে সুকোমল দীবানের উপর বসিয়া আছেন, এক সৌমমূর্ত্তি, সুগঠিতকায়, গৌরকান্তি বীরপুরুষ। ইনি দিল্লীশ্বর আকবর শাহ। সম্রাটের কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ক্লান্ত, পথশ্রান্তিজনিত বিষাদকালিমামণ্ডিত এক বিশালকায় সৈনিক। বাদশাহের গম্ভীর মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি চিন্তামগ্ন।

সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া আকবর শাহ বলিলেন—"তাহা হইলে এখনও সেই নরাধম ইদল্-মহলেই বাস করিতেছে। কি স্পর্দ্ধা! আমাকে যে এরূপ কথা বলিতে সাহস করে, তার কি জীবনের মায়াও নাই?"

দণ্ডায়মান সৈনিক, সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"জাঁহাপনা! প্রাণের মায়া দূরে থাক, ভয় কাহাকে বলে, সে তাহা জানে না। আমি প্রত্যাগমন সময়ে, পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার ঔদ্ধত্য ও গর্ব্বময় উত্তর এখনও ভুলিতে পারি নাই। জাঁহাপনার সম্মুখে সে কথা বলিতে আমার জিহ্বা স্তম্ভিত হইতেছে।"

আকবরশাহ প্রসন্নভাবে বলিলেন—"কোন সংকোচ নাই তোমার। তুমি প্রণিধি মাত্র।"

সৈনিক পুরুষ বলিল—"জাঁহাপনার প্রদত্ত শৃঙ্খল ও তরবারি, দুই-ই আমি তাহাকে দিলাম। সে শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিয়া, তরবারি উঠাইয়া লইল। তারপর সে পরুষকণ্ঠে বলিল—"তোমার সম্রাটকে বলিও, হিন্দুস্থানে তাঁহার যে স্বত্ব, মালবেও আমার তাই। তিনিও মুসলমান,

আমিও মুসলমান। তিনিও দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না, আমার অসির প্রচণ্ড শক্তিও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। মালবের সকল সামন্তই কুক্কুরের ন্যায়, তাঁহার পদলেহন করিয়াছে; কিন্তু আমার এ উন্নত মস্তক চিরদিনই সমভাবে গর্ব্ব-মণ্ডিত থাকিবে। চিতোরে রাজপুত তাঁহার যে দুর্দ্দশা করিয়াছে, মালবে আমিও ঠিক্ সেইরূপ করিব। এই মান্দু-উপত্যকা, একদিন দ্বিতীয় হল্‌দীঘাটে পরিণত হইবে।"

ক্রোধে আকবর শাহের মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। সৈনিক পুরুষ ভয় পাইয়া বলিল—"জঁাহাপনা! এ বান্দার অপরাধ কি?"

ক্রোধ সংবরণ করিয়া আকবর শাহ বলিলেন—"তোমার অপরাধ কিছুই নাই। কিন্তু এখনই শুনিবে—রাজবিদ্রোহীর কি ভীষণ পরিণাম হয়। আমাকে যে এতটা অপমান করিতে সাহস করে, তাহাকে কুক্কুর দিয়া না খাওয়াইলে আমার ক্ষোভ যাইবে না। ইস্কান্দার খাঁ—আসিয়াছে?"

উন্মুক্ত দ্বারের পার্শ্বে, প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, আমি সবই শুনিতেছিলাম, তখনই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বাদসাহকে কুর্ণীস্ করিলাম।

আমায় দেখিবামাত্রই, সেই আগন্তুক সৈনিকপুরুষ যেন বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্রাট আকবরশাহ, সেই সৈনিকের এই ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি—নিজামত আলি?"

নিজামত আলি বলিল—"জঁাহাপনা! দুজন মানুষের মুখের যে এতদূর সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে, তাহা আজ দেখিলাম। এই যুবককে দেখিবামাত্রই নজফ্ আলি সোহানী বলিয়াই আমার ভ্রম হইয়াছিল!"

বাদসাহ মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"সত্যই কি সেই নরাধম সোহানী, ঠিক এরই মত দেখিতে?"

সৈনিক বলিল—"জাঁহাপনা! বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, আকৃতির এতদূর সৌসাদৃশ্য, জীবনে আমি আর কখনও দেখি নাই।"

বাদসাহ উত্তেজিত স্বরে হাঁকিলেন—"সরবৎ! সরবৎ!" সাকি তখনই স্বর্ণপাত্র ভরিয়া মিঠা সরবৎ আনিয়া দিল। সম্রাট্ তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া, সুবাসিত শূন্যপাত্র বাঁদীকে ফিরাইয়া দিয়া, আমার দিকে চাহিলেন। আমি আবার একটী কুর্ণীস্ করিয়া, তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় অবনত মস্তকে দাঁড়াইলাম।

আকবর শাহ বলিলেন—"ইস্কান্দার খাঁ! তোমার সামরিক প্রতিভাও শৌর্য্যবীর্য্য সম্বন্ধে আমার অজানিত কিছুই নাই। আমার জরুর আদেশ, কালই প্রয়োজনীয় সৈন্য লইয়া, বিনা গোলযোগে, বিনা রক্তপাতে আমার প্রধান শত্রু রাজবিদ্রোহী সোহানীকে কৌশলে ধরিয়া আনিতে চাও। কিন্তু শুনিয়াছি,—তাহার স্ত্রী বড়ই সাহসী, বড়ই বুদ্ধিমতী! তাহাকে প্রথমে আয়ত্ত না করিলে, তুমি কখনই তাহার স্বামীকে ধরিতে পারিবে না। সর্ব্বাগ্রে, সেই চতুরা রমণীকে কৌশলে ধৃত করিবে। কিন্তু সাবধান! তাহার ইজ্জতের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিও না।"

সম্রাটের এই আদেশ শুনিয়া, আমি একটু থতমত খাইলাম। ভয়ে নহে, বিস্ময়ে নহে—এ ব্যাপারে আমার অক্ষমতার সন্দেহেও নহে। কিন্তু ইহা ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ নয়! এ ব্যাপারের মধ্যে যে এক সুন্দরী রমণী রহিয়াছে! নূতন জীবনে, যশের আলো লইয়া, সবে মাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি, এ সময়ে তাহা যদি নিবিয়া যায়—তাহা হইলে আমার মানসম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা সবই যে ভাসিয়া যাইবে।

তৎপরক্ষণেই মনে ভাবিলাম—"আমার ন্যায় সাহসী যোদ্ধার কাছে, এক ছার রমণীর শক্তি অতি তুচ্ছ। হায়! যদি আমার প্রজ্ঞাচক্ষু থাকিত, যদি সেই সময়ে আমি ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়ামাত্র দেখিয়া,

কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতাম, তাহাহইলে উত্তরকালে আমাকে অত লাঞ্ছনা ও মর্ম্মযাতনা সহিতে হইত না।

আমায় চিন্তিত দেখিয়া, দিল্লীশ্বর বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"ইস্কান্দার খাঁ! আমার আদেশপালনে ভয় পাইতেছ! তুমিই না হল্‌দীঘাটের ভীষণ সমরে, সাহাজাদা সেলিমের বামপার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিলে? আমি তোমার অসির শক্তি, সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর বিশ্বাস করি বলিয়াই, তোমার এ গুরুভার দিতেছি! প্রকাশ্য যুদ্ধে, আমি সোহানীকে জীবন্ত ধরিতে পারিব না। লড়ায়ে সে হারিতে পারে, কিন্তু কখনই আমার বন্দী হইবে না! নিশ্চয়ই জহর খাইয়া মরিবে। আমি চাই জীবন্ত সোহানীকে! আমি চাই - সোহানীর সুন্দরী পত্নীকে। সে দাম্ভিকা, আমার রঙ্গমহলে বাঁদীর বাঁদী হইয়া থাকিবে, ইহাই আমার অভিপ্রায়।"

পূর্ব্বাগত সৈনিক পুরুষকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিয়া, বাদসাহ কক্ষান্তরে উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"তোমার গন্তব্য স্থানে যাইবার সহজ পথ এই রাজদূতের নিকট জানিয়া লও।—কিন্তু জানিও, আমার আদেশ পালন করিতে না পারিলে, তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

বাদসাহ চলিয়া গেলেন। আমি সেই সৈনিকের নিকট সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, নিজ গৃহে ফিরিলাম। আমার প্রাণ দুশ্চিন্তায় সমাচ্ছন্ন। বাটীতে পৌছিয়া দেখিলাম, গুরগণ খাঁ চলিয়া গিয়াছে।

আমি বক্ষস্থ আচকানের মধ্যে লুক্কায়িত, সেই সুন্দরীর তসবীরখানি বাহির করিয়া তাহা দুই তিনবার দেখিলাম। চিত্তের সেই অবসাদময় অবস্থাতেই যেন একটু উৎসাহ, একটু শান্তি আসিল।

হায়! আমার প্রাণের এ অতৃপ্ত আশা কি কখনও মিটিবে না? কে এ অনিন্দ্য-সুন্দরী! ইহাকে কি এক বার চোখের দেখাও দেখিতে পাইব

না ? হায় রে ! রমণীর রূপ ! তুমি না করিতে পার, এমন কাজই নাই হায় ! হায় ! কেন আমি নিরাশা-সাগরে ঝাঁপ দিলাম ?

মনে চিন্তা, মুখে উদ্বেগ, হৃদয়ে উত্তেজনা, প্রাণে ব্যাকুলতা লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মনে মনে বলিলাম—এই সোহানীকে কি ধরিতে পারিব না ? আমি ইস্কান্দার খাঁ—পাঁচশতী মন্সবদার, নিজের বুদ্ধিতে ভাগ্যস্রোত ফিরাইয়াছি, আমার বুদ্ধির উপর পৌছিতে, সোহানীর পত্নীকে অনেক বেগ পাইতে হইবে।

ভৃত্যকে তামাকু সাজিতে আদেশ করিলাম। একপাত্র কাফি উদরস্থ করিয়া, সাময়িক উত্তেজনা দূর করিলাম। তৎপরে ধীরে ধীরে বক্ষাস্তরণ খুলিয়া, সেই তসবীর খানি বাহির করিলাম। ছিঃ ! ছিঃ ! আমি কি সত্য সত্যই উন্মত্ত !

বহুদর্শী হাকিম ! বলিতে পার কি—রূপোন্মাদ, উন্মত্ততার একটা নিকট সম্পর্কীয় ব্যাধি কি না ? কবি ! তুমি বলিতে পার কি, যাহাকে এই রূপের মোহনীয় শক্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত করে, সে জগৎকে তোমার ন্যায় কবিত্বপূর্ণ চক্ষে দেখে কি না ? বিশ্বের সকল জিনিসেই সে একটা পূর্ণ-বিকশিত প্রেম মহিমার ছায়া দেখে কি না ? কূটতার্কিক দার্শনিক বলিতে পার কি—যেখানে রূপোন্মাদ, সেখানে নিঃস্বার্থ প্রেম জন্মে কি না ?

একদৃষ্টে সেই ছবি দেখিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, কে এই বিশ্ববিমোহিনী, উন্মাদকারিণী সৌন্দয্যশোভাসম্পদময়ী, রমণী ! সত্যই কি ইহার অস্তিত্ব আছে ? সত্যই কি এ ছায়া নয় ? সত্যই কি এই ছায়ার অন্তরালে কায়া লুকাইয়া আছে ? একশত আসরফি দিলেও কি, সেই বুড়ী তস্বীরওয়ালী, আমায় এর প্রকৃত সন্ধান বলিয়া দিবে না ? এই আগরা সহরে, অনেক হিন্দু হাত গুণিয়া পয়সা উপায় করে। তাহারাও কি গণনাশক্তির সহায়তায় এ রূপসীর সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে না ?

যে দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য-ভার আমার উপর বিন্যস্ত, তাহা ভুলিলাম। যে কঠোর কর্ত্তব্য আমায় প্রাণ দিয়াও পালন করিতে হইবে, যাহা না করিতে পারিলে আমার জীবন বিপন্ন, মানসম্ভ্রম, পদগৌরব সবই বিপন্ন, তাহাও ভুলিলাম। হায়! হায়! আমার হৃদয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া যে সেই ভুবনমোহিনীর সমুজ্জ্বল রূপছবি!

কল্পনা সহায়তায়, এই ভুবনমোহিনী রূপসীর একটা জীবন্ত অস্তিত্ব সৃষ্টি করিলাম। কক্ষমধ্যে গাজিপুরী গোলাপ জলের সুবাস ছুটিতেছে। বোধ হইল, এ সুবাস যেন তাহারই দেহের সুবাস। সেই কক্ষ আলোকিত করিয়া সমুজ্জ্বল দীপমালা জ্বলিতেছে। মনে হইল, যেন সেই ধীর বায়ু-বিকম্পিত উজ্জ্বল দীপাবলী, তাহার রূপের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ চুরি করিয়াছে। আমি অশান্তচিত্তে শান্তির আশায় হাঁকিলাম,—"সাকি! সেরাজী।" এক বাঁদী, রৌপ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া, তখনই সেরাজী আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পান-পাত্র শেষ করিলাম। নিতান্ত নির্লজ্জের মত সেই ছবিখানি বাঁদীর সম্মুখ ধরিয়া বলিলাম—"বলিতে পারিস্ সাকি! এ তস্‌বীর কা'র?"

মুখে না হউক, বাঁদী হয় ত মনে মনে আমায় বিদ্রূপ করিল। সে মৃদু হাস্যের সহিত একটি সেলাম করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল!

সেরাজাপানে উত্তেজিত মস্তিষ্ক আরও চঞ্চল হইল। নিদ্রার আলস্য দেহযষ্টিকে শিথিল করিয়া দেওয়ায়, উপাধানের উপর মাথা রাখিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলাম। তারপর ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রাতেও আমার নিস্তার নাই। স্বপ্ন আসিয়া এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিল।

কি অদ্ভুত স্বপ্ন! স্বপ্নে দেখিলাম—সে আসিয়াছে। দেহে, মুখে, বক্ষে, গণ্ডে, চাহনিতে, চলনে, বেশভূষায়, উজ্জ্বল রূপের স্নিগ্ধ তরঙ্গ

তুলিয়া, সে যেন আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে। মধুর অপাঙ্গে, সরস-বিদ্রূপের এবং হাসির উৎস ফুটাইয়া, সে যেন বলিতেছে,—"ছি! তুমি না বীরপুরুষ? এত লঘু তুমি?" সে তিরস্কারেও যেন তাহার তৃপ্তি হইল না। কৃষ্ণকুন্তলবেষ্টনকারী, সুগন্ধি ফুলের রাশি হইতে, ফুল খুলিয়া সে যেন আমার বুকে ছুঁড়িয়া মারিল। জাগ্রৎ ভাষাময়ী, ভাবময়ী মূর্ত্তি লইয়া সে যেন বলিল—"এই দেখ! আমি তোমার কত কাছে দাঁড়াইয়া। উন্মত্ত যুবক! আমায় ধরিতে পারিবে কি?"

মধ্যরাত্রে সেরাজীর তীব্র মাদকতা কাটিল—স্বপ্ন টুটিল! দেখিলাম, ভৃত্য আহার রাখিয়া গিয়াছে। খাইতে ইচ্ছাও নাই, পারিলামও না। মুষ্টিখানেক পোলাও, দুই এক টুকরা মিঠা-কাবাবেই যেন পেট ভরিয়া গেল। রাত্রি ত্রিযাম অতীত। সম্রাট আদেশে প্রভাতেই সোহানীকে ধরিতে যাইতে হইবে। আমি যাত্রার উপযোগী আয়োজন করিয়া লইলাম।

তা'র পর আবার তন্দ্রা! আবার স্বপ্ন! আবার সে! আবার তার চিন্তা! তখন প্রভাত হইয়াছে। বিধাতার নাম করিয়া, শয্যা হইতে উঠিলাম। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, বাদসাহের আদেশে, পঞ্চাশজন মোগল-সওয়ার আমার বাড়ীর সম্মুখের ময়দানে দাঁড়াইয়া। আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী, আলি মহম্মদ, সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বলিল—"জনাব! আমরা প্রস্তুত হইয়া আপনার আদেশের অপেক্ষা করিতেছি।" আমি তাহাদের অগ্রগামী হইতে আদেশ করিলাম।

সেনারা চলিয়া গেল। আমি মুখ হাত ধুইয়া, প্রভাতের নামাজ সারিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম।

দ্বারের সম্মুখে, সজ্জিত যুদ্ধাশ্ব, উন্নত গ্রীবাভঙ্গির সহিত হ্রেষারব

করিতেছে। আমি খোদার নাম লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলাম। অশ্ব তীর-বেগে ছুটিতে লাগিল। এখন আমি, কঠোর কর্ত্তব্যের পথে। হায়! তবুও তার চিন্তা গেল না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিন সকলেরই যায়। মানুষের সুখের দিনে সূর্য্য-চন্দ্র যেমন আকাশ আলো করিয়া উঠে, দুঃখের দিনেও ঠিক সেইরূপ করে। সুখী, দুঃখী, রোগী, ভোগী সবারই দিন কাটে। তবে কাহার—কষ্টে ও মনো-বেদনায়। কাহারও বা সুখে ও হাসিমুখে। পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলো যেমন চিরদিন থাকে না, অমাবস্যার অন্ধকারও তেমনই। শীতের খরস্পর্শবায়ু সময় হইলেই চলিয়া যায়—আবার পুষ্পবাসিত, প্রসূন-পরাগচুম্বিত, বাসন্তীমলয়ের মধুময় স্পর্শে দেহ শিহরিয়া উঠে। আমার দুঃখের দিন, উৎকণ্ঠার মুহূর্ত্তগুলি, কাজে কাজেই চলিয়া গেল। একটি দিন নয়—তিন তিনটি।

দুই শত যোদ্ধা সমভিব্যাহারে, ক্রমাগত কত দরী, কত উপ-ত্যকা ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, এই তিনদিন পরে আমি উজ্জয়িনীর সীমায় পৌছিলাম। দুইক্রোশ দূরেই সর্দ্দারপুর। সর্দ্দারপুরের এই দীর্ঘ মাঠটি পার হইতে পারিলেই, কঠিন প্রস্তরমণ্ডিত সমুচ্চ সাতপুরা পর্ব্বত শ্রেণী। এই পর্ব্বতের উপরেই সোহানীর দুর্ভেদ্য দুর্গ ইন্দল্‌মহল।

সর্দ্দারপুরের মাঠে নামিয়াই, আমি আমার সমভিব্যাহারী সৈনিক গণকে তিন ভাগ হইয়া, তিন দিকে যাইতে আদেশ করিলাম। তাহাদের

বলিয়া দিলাম, পর্ব্বতে উঠিবার পূর্ব্বেই তাহারা সকলেই বিদেশী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধরিয়া সহরে প্রবেশ করিবে।

ইদলমহল দুর্গ, দুর্ভেদ্য সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর এক খণ্ডাংশের নাতি-বিস্তৃত উপত্যকার উপর স্থাপিত। এক সময়ে এই ভীমকায় দুর্গে মোগলের অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত, রক্তপতাকা, গর্ব্বভরে উড্ডীয়মান হইত. কিন্তু সোহানী বাহুবলে সে রক্তপতাকা স্থানচ্যুত করিয়া, সবুজবর্ণের পাঠান পতাকা সেই দুর্গ-শিখরে উড়াইয়া দিয়াছে। প্রথমে দুর্গ, পরে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ সমূহ অধিকার করিয়া, নিজে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। আর তাহার নাম রাখিয়াছে সোহানী-গঞ্জ।

আকবর-শাহের সহিত সোহানীর দুইবার প্রকাশ্যভাবে শক্তি-পরীক্ষা হইয়াছিল। সোহানী, প্রথমবার ইদলপুরের শুভ্র উপত্যকার মধ্যে, মোগল সেনাগণকে পাথর চাপা দিয়া মারিয়াছিল। দ্বিতীয়বার, রাত্রিযোগে আকবরশাহের সেনাপতি, খাঁ জাহান্দারবেগ্, সোহানীর দুর্গমধ্যে চোরের ন্যায় প্রবেশ করেন। কিন্তু সোহানীর শক্তিশালিনী পত্নী, ঘটনাটি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া, স্বামীকে ভূগর্ভস্থ "তয়খানায়" লুকাইয়া রাখেন। আর মহাবলী খাঁ-জাহান্দার এই বুদ্ধিমতী রমণীর কৌশলে, দুইটী দুর্গ তোরণের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। সোহানীর সেনারা তাঁহার রসদ পত্র লুণ্ঠন করে। শেষ তিনি সন্ধি-প্রার্থনা করিয়া, সে যাত্রা পরিত্রাণ পান। খাঁ জান্দাহার যখন সোহানীর পত্নীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"তোমার স্বামী প্রাণ ভয়ে ভীত মুষিকের ন্যায়, এই দুর্গ মধ্যে লুকাইয়া আছেন। যদি তিনি প্রকৃত পাঠান হ'ন, তাহা হইলে এখনই বাহির হইয়া আসিয়া, আমার সহিত অসিযুদ্ধ করুন।"

সোহানীর বীরপত্নী এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমার স্বামী তোমার মত চোরের সহিত অসিযুদ্ধ করিয়া, তাঁহার বীরত্বগৌরব কল-

ঙ্কিত করিতে চাহেন না। তুমি যদি বীরের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে আমাদের এই ইদলপুর দুর্গ অবরোধ করিতে, তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎসৌভাগ্য-লাভ করিতে। আমারই আদেশে, আমার সেনারা তোমার রসদ লুণ্ঠন করিয়াছে। তুমি এই সংকীর্ণ স্থানে এখন মূষিকের ন্যায় আবদ্ধ। ইদল দুর্গের চারিদিকে প্রস্তর প্রাচীর। প্রাচীর নিম্নস্থ দুর্গ-পরিখাকে জল-প্লাবিত করিবার একটি গুপ্ত উপায় আছে। যদি তুমি তোমার তরবারি ও শিরস্ত্রাণ এখানে রাখিয়া, এই রাত্রির মধ্যে দুর্গ ত্যাগ না কর, তাহা হইলে বন্যা-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া, আমি সমস্ত মোগল সেনাকে মূষিকের মত জলে ডুবাইয়া মারিব।"

খাঁ জাহান্দার সাহেব, প্রথমতঃ ঘৃণার সহিত সোহানীপত্নীর এ প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সোহানী-পত্নী যখন পরিখার গুপ্তপথ মুক্ত করিয়া দিলেন, যখন নর্ম্মদার প্রচণ্ড সলিল-প্রবাহ সেই ক্ষুদ্র স্থান প্লাবিত করিতে লাগিল, তখন খান্ সাহেবের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল! তিনি অগত্যা তাঁহার শিরস্ত্রাণ ও তরবারি সোহানী-পত্নীর হাতে দিয়া, দুর্গত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখনই তাঁহার পলায়নের জন্য দুর্গ দ্বার কিয়ৎক্ষণের জন্য উন্মুক্ত হইল।

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, মোগলসেনা একে একে দুর্গ মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল। সোহানী পত্নী দুর্গপ্রাকার হইতে উচ্চৈঃ-স্বরে বলিলেন—"খাঁ সাহেব! যদি যথার্থ বীর হও, তাহা হইলে পুনরায় প্রকাশ্যভাবে এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে আসিও। তোমার শিরস্ত্রাণ ও উষ্ণীষ আমার কাছে বাঁধা রহিল! যদি পার বাহুবলে এগুলি খালাস করিয়া লইও! আর তোমার প্রভু আকবরশাহকে বলিও, সোহা-নীর পত্নীর হাতে পড়িয়াই তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সেই সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তোমাকে আরও লাঞ্ছনা করিত।

খাঁ সাহেব অবশ্য রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া, বাদসাহকে প্রকৃত ঘটনা বলেন নাই। কিন্তু মনে মনে বহুবার ভাবিয়াছিলেন—"এমন শক্তি-শালিনী আওরৎ, হিন্দুস্থানের আর দুইচারি প্রদেশে থাকিলে, মোগলরাজ্য দুই দিনেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।"

কিন্তু জাহান্দার খাঁ, তাঁহার এই লাঞ্ছনার কথাটা বাদশাহের নিকট গোপন করিলেও, তাহা গোপন রহিল না। আকবর শাহ, এই অসাফল্যের জন্য, জান্দাহার খাঁকে সপ্তশতী মন্সবদারী হইতে পঞ্চশতার পদবীতে নামাইয়া দিয়া, দাক্ষিণাত্যে বদলী করিয়া দিলেন। যাহাতে খাঁ সাহেবের মত আমার এইরূপ কোন দুর্দ্দশা না হয়, এইজন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই, সাবধান হইলাম। এই জন্যই আমার সঙ্গীদের ব্যবসায়ী বণিকবেশে নানাদিক দিয়া, সেই পাহাড়ের বক্ষমধ্যস্থ সহরে উঠিবার পরামর্শ দিলাম। ইদলদুর্গের, ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পথঘাটের একটা নক্সা, আমার কাছে ছিল। তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। সৈন্যদের কাহাকেও সঙ্গে রাখিলাম না, কারণ সোহানীর গুপ্তচর চারিদিকে। তবে এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, যেন প্রয়োজন হইলেই মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের সহায়তা পাইতে পারি। আমিও সার্থবাহের ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিলাম। বেশ পরিবর্ত্তনের ফলে, আমাকে যেন একজন ইরাণী-বণিকের মত দেখাইতেছিল। নগরের পথঘাট আমার অপরিচিত। কাজেকাজেই অতি সন্তর্পণে আমি পথ চলিতেছিলাম।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পথিমধ্যে এক দোকানের সম্মুখে যেন একটু বেশী জনতা হইয়াছে। এই জনতার কারণ আর কিছু নয়, এক পার্ব্বতীয় ভীলবালিকা গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছিল। সকলেই তন্ময়চিত্তে তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরমাখা সঙ্গীত শুনিতেছে। তাহারা সকলেই অন্যমনস্ক। অবসর বুঝিয়া সমবেত জনতার অজ্ঞাতসারে,

আমি সেই দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই দোকানটী একটি কাফি-খানা।

আমায় বিদেশী দেখিয়া, সরাইয়ের ভৃত্য উপরে তাহার প্রভুকে খবর দিতে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া চির-পরিচিতের মত লম্বা সেলাম বাজাইয়া, হাস্যমুখে বলিল—"মেজাজ সরীফ সাহেব! মেরে গরীব-খানা মবারক্ হুয়ে।"

এই বৃদ্ধ একেবারে শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত ছিল না। তাহার মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ সবই হেনার মজ্‌গুল রঙ্গে রঞ্জিত। চোখে সুরমা, হাতে আংটী, আঙ্গরাখা পায়জামা প্রভৃতিতে ঝুটা-সাঁচ্চার কাজ করা। অনুভবে বুঝিলাম, এই সৌখীন সেখ্‌জী—যিনি তখনও যমরাজের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই সরাইখানার সাক্ষাৎ মালিক। আমি বলিলাম—"সেখ্‌জী! সেলাম্ পৌছে। আপনার এ সরাইখানায় আমি দিন কতক বাস করিতে চাই। এদেশে আমি অপরিচিত। সুদূর ইরাণ হইতে ব্যবসার জন্য ও পেটের দায়ে, আপনাদের এই হিন্দুস্থানে আসিয়াছি। তন্‌খা যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। কিন্তু আমার খানা-পিনা ও থাকিবার স্থান একটু ভাল হওয়া চাই।" এই কথা বলিয়াই আমি থলিয়া হইতে পাঁচটী চক্‌চকে আস্‌রফি বৃদ্ধের হাতে তখনই গণিয়া দিলাম। আর আমায় খুস্-মেজাজি আদমি দেখিয়া, খাঁ সাহেব দশনপংক্তি বিকশিত করিয়া, সেই আসরফি কয়েকটী হাতে লইল। চাকরদের ইঙ্গিত করিবামাত্র, তাহারা আমাকে উপরের একটী নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গেল।

সেই বাটীর মধ্যে যেটি সুসজ্জিত ও শ্রেষ্ঠ কক্ষ—বুঝিলাম, তাহাই আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। খাঁ সাহেবের আতিথ্য-পরায়ণতার গুণেই হউক বা আমার আস্‌রফিগুলির জোরেই হউক, পোলাও, কাবাব,

কোপ্তা, কোর্ম্মা, সরবৎ, সেরাজী প্রভৃতি কিছুরই অভাব হইল না। খানা পিনা শেষ করিয়া শয্যা আশ্রয় করিলাম।

নির্জ্জনতা, দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রকে বড়ই প্রসারিত করে। আমার মনে নানা ভাবনা আসিল। মনে ভাবিলাম, জনরবের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সোহানী ত এ সরাই-খানায় প্রায়ই আসে। অর্থের প্রলোভন ও উচ্চপদের আশায় প্রলুব্ধ করিয়াও কি এই সেখ্‌জীকে কিনিতে পারিব না? এই সেখ্‌জীর সহায়তায় সোহানী কি সহজে ধরা পড়িবে না?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমার শয়নকক্ষটী ক্ষুদ্র হইলেও, যথাসম্ভব রুচিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ভাবে সুসজ্জিত। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, একজন নফর আমার জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে। অন্য একজন আমার গোসল করিবার জন্য, তাম্র-ভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া, শীতল জল আনিতেছে। আর একজন কোথা হইতে এক পেয়ালা সমুষ্ণ কাফি ও কিছু বাদামের পিষ্টক যথাস্থানে রাখিয়া গেল। আমি মুখ হাত ধুইয়া গোসল করিলাম। স্নানান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, কাফি পাত্রও শেষ করিলাম। এমন সময় দেখি, যে বৃদ্ধ সেখ্‌জী প্রফুল্লমুখে আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত।

ভৃত্যদের নিকট খাঁ সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া, আমি জানিয়াছিলাম—তাঁহার নাম আলি ইব্রাহিম। আরও কিছু বেশী জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু খাঁ সাহেবের ভৃত্যগুলি বড়ই স্বল্প-ভাষী ও কেতা-দুরস্ত থাকায়, আমার সে আশা সিদ্ধ হয় নাই।

খাঁ সাহেব হাসিমুখে বলিল—"সাহেব! এ গরীবের গোস্তাখি মার্জ্জনা

হয়। এই বৃদ্ধ বয়সে আমি এক নবযুবতী বিবি লইয়া ঘর করি·· বাড়ী, ঘর, হুকুম, সবই তাঁর। আমি কেবল মাত্র তাঁর হুকুমের তামিলদার।”

খাঁ সাহেবের এ বেয়াদবীটা আমার অসহ্য হইলেও, আমি নিজের অবস্থা বুঝিয়া মনোভাব গোপন করিলাম। হাসি মুখে বলিলাম—“আমার এখানে থাকার সম্বন্ধে বিবির মত হইয়াছে ত ?”

খাঁ সাহেব—বলিলেন—“হাঁ তা হইয়াছে। আর আপনার প্রদত্ত সেই আস্‌রফিগুলি, এতক্ষণ তাঁহার স্ত্রী-ধনের সামিল হইয়া বাক্‌সের মধ্যেও পড়িয়াছে। আর বিবির আদেশেই আমাদের জাঁহাপনার খাস-কামরাটী আপনার ব্যবহার জন্য দিয়াছি। জনাব! এটা গরীবখানা হইলেও, এ দেশের মহাপরাক্রান্ত বাদ্‌সাও এখানে মেহেরবাণী করিয়া আসিয়া থাকেন।”

আমি মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিলাম—জাঁহাপনা ? বাদসাহ ? আকবর বাদ্‌সা না কি ?”

খাঁ সাহেব হাসিয়া বলিল—“আপনি বিদেশী। দেখিতেছি খালি আকবর বাদ্‌সার নামই শুনিয়াছেন। আমাদের এ ক্ষুদ্র রাজ্য, কিন্তু অন্য এক স্বাধীন বাদ্‌সার অধীন।”

“তবে কি এ মোগলের রাজ্য নয় ?”

“না। সাহ মহাব্বতদ্দৌলা নসরতজঙ্গ খাঁ আলি সোহানী, এই পাহাড়ী মুলুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এ বান্দার বিবির হাতের তৈয়ারি মিঠা কাফি ও পিষ্টক খাইতে তিনি প্রায়ই এই সরাই খানায় আসেন।”

আমার শিরায় শিরায় তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিল। উত্তেজনায় মুখচোখ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। শিকারের সন্ধান পাইলে, সিংহ যেরূপ আশা লুব্ধ হইয়া চঞ্চলমতি হয়, আমিও সেইরূপ হইলাম। আর মনোভাব চাপিয়া রাখিয়া সেখজীকে বলিলাম—“বটে! সাহেব আপনি ত বড় সৌভাগ্যবান্।”

খাঁ সাহেব ইহাতে আপ্যায়িত হইয়া বলিল,“জনাব! বুঝিতেছি আপনি

বিদেশী ব্যবসায়ী। তা একদিন আমাদের বাদ্‌সার সঙ্গে আপনার মুলাকাৎ করাইয়া দিব। আলাপটা আপনার উপকারে লাগিতে পারে। তাজ্জবের কথা এই যে আপনার চেহারাটা ইরাণীর মত হইলেও, আপনার মুখ ও চোখের অবস্থার সহিত আমাদের জাঁহাপনার অনেক সাদৃশ্য আছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বটে! দেখিবেন যেন ভ্রম না হয়। তিনি কোন সময়ে এখানে আসেন?"

খাঁ সাহেব বলিল—"আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আজই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। সর্দ্দারপুরের মাঠে মোগল বাদসার ফৌজ গুপ্তভাবে আসিতেছে, এ সংবাদ পাইয়াই তিনি দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা এ সহরের কোন সরাই খানায় আশ্রয় লইল।"

আমি সোহানীর অদ্ভুত ক্ষমতাসম্বন্ধে, অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, আমার প্রভু আকবরশাহের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি লইয়াই সে রাজত্ব করে। সর্দ্দারপুরের মাঠ, ইদলগড় দুর্গ হইতে আট ক্রোশ। যাহার গোয়েন্দা আট ক্রোশ ব্যাপিয়া চৌকী দিতেছে, তাহার দূরদর্শিতা বড় কম নয়! এইরূপ সতর্কচক্ষু ভীষণ শত্রুকে আমি কি না কৌশলে ধরিতে আসিয়াছি!

কোনরূপ ঔৎসুক্য দেখাইলে, কিংবা অনর্থক প্রশ্ন করিলে খাঁ সাহেবের মনে সন্দেহ হইতে পারে এই ভাবিয়া আমি বলিলাম—"সাহেব! নসীবে থাকে, আপনাদের বাদসার দর্শন পাইব ও কিছু ইরাণী জহরত তাঁহাকে বেচিব। কিছু লভ্য লইয়াই আমার কথা। তা দিল্লীর বাদসাই হউন, আর আপনাদের বাদসাই হউন!"

খাঁ সাহেব সহাস্যমুখে বলিলেন—"তাতো বটেই! একটা কথা বলিতেছিলাম কি—যে পাচটী আসরফি আমায় দিয়াছেন, তাহা ত এক মাসের ঘড় ভাড়াতেই যাইবে। বিবি বলিয়াছেন—খোরাকী বাবদ কিছু চাই।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ দশটী আসরফি গুণিয়া দিলাম। আস্‌রফি লইয়াই মামলা—কাজেই তাহা অতি সহজে মিটিল। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "মিয়া! অর্থের জন্য ভাবিও না। আমি ক্লান্ত, শ্রান্ত, আশ্রয়হীন মুসাফের। আমায় খুসী করিলেই আমি তোমায় খুসী করিব।" মনের মত কথাটি শুনিতে পাইয়া, সেখজী হাসিমুখে আমার খানা-পিনার জোগাড়ে গেল।

আমি গুলসানার কথাই ভাবিতেছি। যাহার রূপ দেখিয়া আমি উন্মত্ত, কোথায় সে তা'ত জানি না। হায়! তবে কেন বৃথা নিরাশা ও দুরাশার ছলনায় ঘুরিতেছি! খোদা! খোদা! আমার আশার ধন, গুলসানাকে মিলাইয়া দাও। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে সাহস হইল না। যদি কেহ কোথা হইতে শুনিয়া ফেলে।

গুলসানার চিন্তা ছাড়িয়া, তখন নিজের দায়িত্বের কথা ভাবিতে লাগিলাম। যদি সোহানীকে ধরিতে না পারি, তাহা হইলে লজ্জা, কলঙ্ক, লাঞ্ছনা, নিগ্রহ, সবই এ অদৃষ্টে ঘটিবে। সোহানীর ধ্বংস সাধনে প্রতিবার বিফলমনোরথ হইয়া, আকবরসাহ যেরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন, এবার নিরাশ হইলে তাঁহার ক্রোধের মুখে আমাকে হস্তীপদতলে মরিতে হইবে।

সেই সযত্নেরচিত শুভ্রশয্যা যেন এই সব চিন্তায়, প্রখর জ্বালাময় বলিয়া বোধ হইল। বাহিরের স্নিগ্ধ বায়ুর আশায়, বাতায়নগুলি খুলিয়া দিলাম। দেখিলাম, সুনির্ম্মল কলঙ্কশূন্য জ্যোৎস্নায়, পর্ব্বতের উপত্যকার, লতাগুল্মবিটপীগুলি যেন রজত-ধারায় স্নাত হইতেছে। নিসর্গশোভার এই গৌরবময় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিয়াও আমার চঞ্চলচিত্ত স্থির হইল না।

কক্ষে সুগন্ধি বর্ত্তিকা জ্বলিতেছিল। তাহা হইতে যে আফ্‌সান বাহির হইতেছিল, তাহা যেন পরী-রাজ্যের। সে আলো কত স্নিগ্ধ—তবু যেন

তাহা আমার চক্ষে মহাজ্বালাময়। আমি আলো নিভাইয়া দিয়া, নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

তবু চিন্তা! সেই শোণিত-শোষিণী, মস্তিষ্কবিপ্লবকারী, অগ্নি-জ্বালাময়ী উৎকট ভাবনা! যে উপায়ে হউক—সোহানীকে আয়ত্ত করা চাই। মনের আবেগে, আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায়, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"ইয়ে মেরে মেহেরবান্—খোদা! আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কে যেন আমার মুখ হইতে এই কথাগুলি লুফিয়া লইয়া বলিল, "মুসাফের! সাবধান! মনের কথা স্থান বিচার করিয়া কহিতে হয়।"

মহাসাহসী সেনানী হইয়াও, আমি এ মন্তব্যে চমকিয়া উঠিলাম। ভয়ে নহে—বিস্ময়ে! এ নির্জ্জন অন্ধকারময় কক্ষে, রমণীকণ্ঠস্বরে কথা কহিল কে? আমি ত কক্ষদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া শুইয়াছিলাম। শুইবার আগে কক্ষের চারিদিক তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছি। তবে এ কক্ষে লোক আসিলই বা কিরূপে? আর যে কথা কহিল—তাহার কণ্ঠস্বর যে অতি সুমিষ্ট! ঝঙ্কার শুনিয়া বোধ হইল, যেন পুষ্প-সৌরভময় বাসন্তী-কুঞ্জে, পাপিয়া এবং কোকিল, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সুর বাঁধিয়াছে।

আমি উদ্বেগভরে প্রশ্ন করিলাম—"কে তুমি রমণী! কেন গুপ্তভাবে এ কক্ষে আসিয়াছ?"

এক ছায়ামূর্ত্তি, ধীরে ধীরে আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরের জ্যোৎস্নায় কক্ষটী একেবারে অন্ধকারময় নহে। সেই বিরলা-লোকে মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ভাল চিনিতে পারা যায় না।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম—"কে তুমি ?"

সেই রমণী বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—"মুসাফের! তুমি কি ভয় পাইয়াছ ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"যুদ্ধ আমার জীবনের ব্রত। নরশোণিত ও শবক্ষেত্র আমার ক্রীড়া স্থল। শত শত মৃতদেহের উপর দিয়া আমরা নির্ভয়ে হাসিমুখে চলিয়া যাই। ভয় আমাদের ? বল রমণী! কে তুমি ?"

সেই ছায়ামূর্ত্তি বলিল—"আমার পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন সাহেব ? তবে বলিতে পার, এত রাত্রে কেন গুপ্তভাবে তোমার কক্ষে আসিয়াছি ? আসিয়াছি—কেন, শুনিবে মুসাফের ? আমার নিরাশ রমণী জীবনের অনেক সাধ এ পর্য্যন্ত মিটে নাই। কেন তুমি অত রূপসম্পদ লইয়া, এখানে আসিলে মুসাফের ?"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! আমি এক অপরিচিত অতিথি। আর আমারই সম্মুখে এক অপূর্ব্বদৃষ্টা, অপরিচিতা যুবতী আসিয়া, স্বচ্ছন্দে নিঃসঙ্কোচে বলিতেছে—"কেন অত রূপসম্পদ লইয়া আসিলে!"

সোহানীকে বন্দী করার সমস্যা অপেক্ষা, এই নূতন সমস্যাটা যেন আমার চক্ষে খুবই বেশী হইয়া পড়িল। আমি আবেগভরে, উত্তেজিতস্বরে, সেই অন্ধকারবেষ্টিতা রমণীকে বলিলাম—"কে তুমি! শীঘ্র পরিচয় দাও! নচেৎ তোমার এ ধৃষ্টতার পুরস্কার এখনই দিব।"

বিদ্রূপের স্বরে সে রমণী উত্তর করিল—"এখন বুঝিলাম তুমি একজন বীরপুরুষ বটে! অসিব্রতধারী হইলে কি অত পাষাণ হয় ? অত রূঢ় হয় ? অত নির্ম্মম হয়!"

আমি বড়ই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম। রুষ্টস্বরে বলিলাম—"সাবধান!

আর আমার ধৈর্য্যপরীক্ষা করিও না! আর আমায় বৃথা উত্যক্ত করিও না। সত্যই তোমার বিপদ ঘটিবে।"

রমণী হাসিয়া বলিল—"অভিসারিকার পক্ষে বিপদ অতি তুচ্ছ!"

"তুমি অভিসারিকা? কার আশায় অভিসারে আসিয়াছ সুন্দরী?"

"তোমারই আশায়!"

"আমারই আশায়?"

"হাঁ তোমারই জন্য! নিষ্ঠুর পুরুষ! অত সৌন্দর্য্যসম্পদ লইয়া, এ নিরাশার দুঃখভরা দুনিয়ায় কি আসিতে আছে?"

"তোমায় মিনতি করিতেছি—বল তুমি কে!"

"আমি বৃদ্ধ সেখ্‌জীর তরুণী পত্নী—আমার নাম কুলসম্।"

"একজনের ধর্ম্ম পত্নী হইয়া, তুমি এ রাত্রে পর পুরুষের রূপ দেখিতে আসিয়াছ? ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইতে আসিয়াছ? তুমি রমণীকুলের কলঙ্ক!"

সেই রমণী বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—"আর আমিও দেখিতেছি, তুমি খালি অসিব্যবসায়ী নও। কাজির বিচারও করিতে পার! রমণী হইয়া অভিসারে আসাই দোষ হইল! আর তোমার মত সুপুরুষ হইয়া, আমাদের মজাইতে আসা, বুঝি দোষ নয় পাপ নয়?"

আমি মনে মনে বুঝিলাম, সহজ স্ত্রীলোকের পাল্লায় আমি পড়ি নাই। একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম, "যাও সুন্দরি! নিজের কক্ষে ফিরিয়া যাও। এ মহাপাপ করিও না।"

সেই রমণী দর্পিতভাবে বলিল—"মোগল! তুমি অতি অপদার্থ! পাপ আমি কোথায় করিতেছি! জগতে যাহা স্বভাবসুন্দর, তাহা দেখায় যদি পাপ হয়, তাহাহইলে খোদা অত সুন্দর গুলাবের সৃষ্টি করিতেন না। স্নিগ্ধ কিরণকণাপূর্ণ চাঁদ সৃষ্টি করিতেন না। পাপ—স্পর্শে। মন—মুক্ত

ক্ষেত্র। পাপচিন্তায় চিত্ত কলুষিত হয় বটে; কিন্তু যতক্ষণ না সে চিন্তা পাপ কার্য্যের দিকে প্রসারিত হয়। এক রূপরসবিহীন বৃদ্ধের হাতে পড়িয়াছি বলিয়া নিরাশায় মরিতেছি। তাই তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। দেখাতেও কি পাপ হয় মোসাফের?"

আমি এ অদ্ভুত যুক্তিমুখে হঠিয়া গেলাম। সমরক্ষেত্রে শত্রুমুণ্ড দ্বিধা বিভিন্ন করা, আর খোদার দুনিয়ায় সেরাসৃষ্টি—সুন্দরী রমণীর যুক্তিময় তর্কের প্রতিবাদ করা, দুটো যে আলাদা কথা তা' তখনই বুঝিলাম।

সেই রমণী কঠোর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল -- 'যুবক! পাপী তুমি না আমি? পাঠানকন্যা বড় জোর পাপ কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু সে সহসা প্রত্যক্ষ পাপে লিপ্ত হয় না। কিন্তু দেখিতেছি, তুমি অতি অপদার্থ! মহাপাপী!"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত চিত্তে বলিলাম—"কেন?"

আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেই পাঠানরমণী, অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল—"এক ছার রমণীর চিন্তায় আত্মহারা হইয়া, যে নিজের গভীর কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, সে যে অপদার্থ নয়, একথা কি বলিতে পার তুমি যুবক? এ তস্‌বীর কা'র?"

উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া তখন প্রচুর জ্যোৎস্না সেই কক্ষমধ্যে আসিতেছিল। আমি সেই বিমল জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, গুলসানার যে ছবিখানি আমি বুকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, এখানি—সেই ছবি!

আমি রুষ্টস্বরে বলিলাম—"দেখিতেছি, তুমি অতি ঘৃণিতা। পরপুরুষের রূপ দেখিতে এতরাত্রে যে স্বামীর স্নেহময় অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারে, অপরের বক্ষমধ্যে লুক্কায়িত, এই তসবীর যে অপহরণ করিতে পারে, তাহার প্রবৃত্তি অতি হীন!"

রমণী গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল, "সাবধান মোসাফের! আর কেহ

না বুঝিতে পারিলেও আমি বুঝিয়াছি, তুমি ইরাণী নও—মোগল। যে সে মোগল নও—আকবর বাদ্‌সার সেনাপতি।"

আমি চমকিয়া উঠিয়া, ক্ষিপ্রগতিতে বক্ষবসন মধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলাম। সেই বক্র ছুরিকার উজ্জ্বল শাণিত ফলক—বাতায়ন-পথপ্রবিষ্ট জ্যোৎস্নালোকে ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল।

সেই পাঠান রমণী দৃঢ়স্বরে বলিল - "যে রূপের উপাসনায় এত উন্মত্ত, যে কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া রমণী চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত, সে কখনও রমণী হত্যা করিতে পারে না। আমি বুক পাতিয়া দিতেছি, পার—তোমার ঐ শাণিত ছুরিকা আমার এই বুকে আমূল বসাইয়া দাও।"

আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বলিলাম—"কুলসম! কুলসম! জানি না তুমি কি অদ্ভূত কুহকময়ী! বল—এ ছবি কোথায় পাইলে?"

কুলসম বলিল—"তোমার এই কক্ষমধ্যেই কুড়াইয়া পাইয়াছি। আজ সন্ধার পরে, তুমি যখন এই ছবিখানি উজ্জ্বল আলোকে, সতৃষ্ণনয়নে বহুবার দেখিয়া বক্ষমধ্যে লুকাইয়া রাখিলে, তখন এখানি স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে। এই কক্ষের পার্শ্বেই আমার বিশ্রাম-কক্ষ। আমি আড়াল হইতে জানালার রন্ধ্রপথ দিয়া তোমার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলাম। ছবিখানি তোমার বক্ষচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল, তাহা তুমি আদৌ লক্ষ্য করিলে না। তারপর খানার জন্য, অন্য কক্ষে চলিয়া গেলে। আমার পরিচারিকাকে প্রলুব্ধ করিয়া, আমি তোমার বক্ষবসনবিচ্যুত এই তস্‌বীরখানি সংগ্রহ করিলাম। চাও—এখানি তোমায় ফিরাইয়া দিতে পারি।"

আমার এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য, অসাবধানতার জন্য, আমি মনে মনে বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। যাহা করিয়াছি, তাহা ত আর ফিরিবে না। কুলসম যখন ছবিখানি আমায় ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছে, তখন তাহার মনে কোনরূপ কু-উদ্দেশ্য থাকিতেই পারে না।

আমি ছবিখানি পুনরায়ত্ত করিবার ও কুলসমকে তাড়াইবার মতলবে ভয় দেখাইয়া বলিলাম—"বিবি! তোমার স্বামী নিদ্রিত হইলেও সহসা জাগিয়া উঠিতে পারেন! তিনি এখানে আসিয়া পড়িলে তোমার ও আমার দুজনেরই সর্ব্বনাশ ঘটিবে! হয়ত জীবন পর্য্যন্ত যাইতে পারে।"

কুলসম্ এ কথায় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। কুলসম কি পিশাচ-সিদ্ধা মায়াবিনী! এই গভীর নিশায়, বিনা সঙ্কোচে, এক অপরিচিত পুরুষের কক্ষে আসিয়াছে। তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে বাক্যালাপ করিতেছে, স্বামীর ভয় রাখে না,—কলঙ্কের ভয়ও করে না। দেখিতেছি, লাঞ্ছনার ভয়ও নাই!

আমায় চিন্তিত দেখিয়া কুলসম্ বলিল——"ভাবিতেছ, আমার স্বামী এখানে আসিলে, আমায়, ব্যভিচারিণী ভাবিবেন? সে ভয় করিও না। আমি এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ধর্ম্মতঃ অপরাধিনী হই নাই। তিনি আমায় বড়ই বিশ্বাস করেন। এ স্বাধীনতা আমি তাঁহার কাছেই পাইয়াছি। বাল্যকাল হইতে আমি সুন্দর ফুল বড় ভালবাসি—সুনীল আকাশ বড় ভাল বাসি, গান বড় ভালবাসি—নদীর বুকে মধুর লহরলীলা দেখিতে বড় ভালবাসি। এ সব প্রবৃত্তি এখনও লোপ করিতে পারি নাই! সেই জন্যই তোমাকে আজ আমি লুকাইয়া দেখিতে আসিয়াছি! সত্যই বলিতেছি—তুমি অতি সুন্দর।"

আমি এই অদ্ভুত স্ত্রীলোকের ধৃষ্টতা আর সহ্য করিতে পারিলাম না। কাতরবচনে বলিলাম—"কুলসম! কুলসম! আমি মুসাফের বিদেশী ব্যবসায়ী। আমার মান-সম্ভ্রম যদি কলঙ্কিত হয়, তাহা হইলে আমার ব্যবসা ও ইজ্জৎ মাটী হইবে। আমি যে জহরৎ আনিয়াছি—তাহার একখানিও বেচিতে পারিব না!"

কুলসম্ বলিল—"হজরৎ যেন তোমার জহরৎ গুলাকে মাটীতে পরিণত

করিয়া দেন! তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী। সাহেব! কখনই তুমি জহরত ব্যবসায়ী নও।"

আমি ক্রোধভরে বলিলাম—"তুমি দুষ্টা, ঘোর পাপিষ্ঠা ও অতি মুখরা! এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও! নহিলে আমিই তোমার নিদ্রিত স্বামীকে চীৎকার করিয়া জাগাইব।"

কুলসম্, তাহার ফুল্লাধরে হাসির লহর তুলিয়া বলিল—'স্বচ্ছন্দে আমার স্বামীকে তুমি ডাকিতে পার। যতক্ষণ আমি পাপ না করিব, পুণ্যের পথে থাকিব, ততক্ষণ এই স্বামীকে তিলমাত্র ভয় করি না। পাঠান কন্যা, সামান্য লোভের বশে ঝুটা হইতে পারে না। তবে রাজ্যলোলুপ মোগল, আর তার নফর, পেটের দায়ে সহজেই ঝুটা সাজে! এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি। মোসাফের! তোমার নাম ইস্কান্দার খাঁ। তুমি আকবর শাহের সেনাপতি! মুসাফের বেশে তুমি আমাদের বাদ্‌সা সোহানীকে ধরিতে আসিয়াছ। জহরব্যবসায়ী বলিয়া ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রতারণা করিতেছ! পাগল তুমি, তাই এতক্ষণ আমাকে চিনিতে পার নাই। আমি তোমার রূপ দেখিতে আসি নাই। নিজের কাজে আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিবামাত্রই আমার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিতপ্রবাহ ছুটিল। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। তবুও হৃদয়ের দৃঢ়তা হারাইলাম না। রুষ্টস্বরে বলিলাম—"পাপিষ্ঠা! তোর কোন প্রলোভনেই আমি ভুলিতে চাহি না! এখনই এখান হইতে চলিয়া যা।"

কুলসম্ এ অপমানে রাগ করিল না—কিন্তু হাসিল। সে হাসি যেন মর্ম্মভেদী বিদ্রূপপূর্ণ! আমি পঞ্চশতী মন্সবদার—দিল্লীর বাদসার সেনাপতি! আমার সহিত একটা চতুরা রমণী, যা ইচ্ছা তাই করিতেছে! আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—"কুলসম্! তোমার উদ্দেশ্য কি?"

দর্পিতা কুলসম্ তেজ-দৃপ্ত মুখে বলিল—"মূর্খ! ব্যভিচার আমার উদ্দেশ্য

নহে! পাপ আমার কামনা নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আজ আমি এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরী হইতে পারিতাম। আমি তোমায় পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। কারণ, আমার একটা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমি একজনের সহায়তা চাই। অতি শক্তিহীনা নারী আমি—আর আমার সেই সহায় তুমি!”

আমি বিরক্তির সহিত বলিলাম—“আমি তোমার কোন কাজেই সহায়তা করিতে ইচ্ছুক নই।”

কুলসম দৃঢ়স্বরে বলিল—“তাহা হইলে আমি তোমার অতি শোচনীয় মৃত্যু ঘটাইব। পাঠান যে মোগলের অপেক্ষা কত ভয়ানক জাত, তাহা তোমায় কাল প্রভাতেই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। বলিতে পার—এ কাগজখানি কি?”

তাহার সলুকার মধ্য হইতে, কুলসম একখানি লোহিতবর্ণের কাগজ বাহির করিল। এই কাগজখানি পূর্ব্বোক্ত বাদসাহী-পরোয়ানা। ঘটনাবশে, তাহা গুল্‌সানার ছবির সহিত আমার বক্ষচ্যুত লইয়া কুলসমের হস্তগত হইয়াছে! কি সর্ব্বনাশই আমি করিয়াছি!

আমি উদ্বেগপূর্ণ স্বরে বলিলাম “কুলসম! কুলসম! এ কাগজখানি তুমি কোথায় পাইলে?”

কুলসম্ হাসিয়া বলিল—“ছবিখানি যেখানে পাইয়াছি, এই কাগজ খানিও সেই খানেই পাইয়াছি। তুমি পেটিকার মধ্যে রাখিবার জন্য, আঙ্গরাখার জেব্ হইতে যখন টাকার থলিয়া বাহির করিলে, সে সঙ্গে সঙ্গে এ পরোয়ানা খানিও তোমার বক্ষচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। সুতরাং ইহা সংগ্রহ করিতে আমার বিশেষ কষ্ট হইল না।”

আমি বলিলাম—“স্বীকার করিতেছি, আমারই না হয় অসাবধানতা ঘটিয়াছে। কিন্তু এ পরোয়ানাখানা লইয়া তুমি কি করিবে?”

কুলসম বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—"এ পরোয়ানাখানি বেচিয়া কিছু পয়সা করিব।"

"কাহাকে এখানি বেচিবে কুলসম্? এ বিক্রয়ের পণ কি?"

"পণ—তোমার জীবন! পণ তোমার শোণিতাক্ত ছিন্ন-মুণ্ড! তোমার বাদ্‌সা আকবর শাহকে এখানা বেচিবার সময়ে বলিব—আপনার বিশ্বাসী সেনাপতিরা অতি সাবধানতার সহিত আপনার আদেশ পালন করে। আকবরশাহ না নেন্—এখানি সোহানীকে বেচিলেও আমি কিছু পাইতে পারি।"

"আমি হাজার আস্‌রফি দিব—আমায় এখানি ফিরাইয়া দাও।"

"একটীও আস্‌রফি তোমার কাছে চাই না। এখানি অমনিই ফিরাইয়া দিতেছি। আমার অনুরোধ, সোজা পথে চল—আমার সহায়তা কর।"

"বল—কি করিতে হইবে?"

"শপথ করিতেছ?"

"কথাটা না শুনিলে শপথ করিতে পারিতেছি না।"

"যখন তোমার সহায়তা চাই, তখন তোমাকে সবই খুলিয়া বলিব। যে সোহানীকে তুমি ধরিতে আসিয়াছ, সে আমার মহাশত্রু। আমি দরিদ্র-কন্যা। সে ঐশ্বর্য্যদর্পিত—রাজ্যেশ্বর! সে আমার রূপ দেখিয়া, একদিন বেগম করিবার লোভ দেখাইয়াছিল। আমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া সেরাজীর ঝোঁকে আমার ওড়না ধরিতে আসিয়াছিল। আমি সে অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাই। মোসাফের! আমি অবিশ্বাসিনী নই। এই বৃদ্ধ স্বামী সেখজী আমার একমাত্র ইষ্ট। মনে স্থির জানিও, তোমার পরিচয় না পাইয়া এ রাত্রে তোমার কাছে আসি নাই।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! কে এ অদ্ভুত রমণী! আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"কুলসম! কুলসম! কে তুমি? আমার প্রহেলিকা ভাঙ্গিয়া দাও।"

কুলসম, আমাকে পরাজিত দেখিয়া মিষ্টস্বরে বলিল—'ইস্কান্দার! আমি তোমায় ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেছি। আমি তোমার ভগিনী! খালি উপেক্ষা ও অপমানের জন্য, আমি সোহানীর দর্পচূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করি নাই, শুনিবে কি? তাহার পত্নীও বড় দর্পিতা! সে সর্ব্বদাই বলে,"কুলসম্! তোর মত একটা চতুরা বাঁদী পাইলে, আমার বেগমগিরির আশা পূর্ণ হয়। আমি বাঁদী? আর তিনি রাজরাজেশ্বরী! ইস্কান্দার! বাল্যকাল হইতে আমি বড়ই দর্পিতা! বড়ই অভিমানিনী। স্বামীর কাছে এ অপমানও মর্ম্মবেদনার কথা মুখ ফুটিয়া বলি নাই। তোমায় ভাই বলিয়াছি, তাই বলিলাম। ভাই হইয়া ভগ্নীর মান বাঁচাও।"

কুলসমের কথায় আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া গেলাম। আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি সাহস সবই যেন লোপ পাইল। আমি আবেগভরে—দৃঢ়স্বরে তাহাকে বলিলাম, "ভগিনী! কুলসম্! যা বলিতেছ, তাহাই করিব। আমিই তোমার সহায় হইব।"

কুলসম বলিল—"এই নাও! তোমার পরোয়ানা। এই তসবীর যাহার তাহাকে আমি চিনি। যে দিন তুমি সোহানীর এই বেগমকে বাঁদীর বাঁদী করিবে, সেই দিন আমি তোমায় হাজার সেলাম দিব।"

আমি ঘোর চিন্তামগ্ন। কুলসম্ আমার চক্ষে এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। যার চিত্র আমি দেবী জ্ঞানে দিনরাত বুকে ধরিয়া রাখিয়াছি, দিনরাত যার রূপ চিন্তা করিয়া আমি বিভোর, উন্মত্ত, আত্মহারা, কুলসম তাহার পরিচয় জানে। আমি আবেগভরে কুলসমকে বলিলাম—"ইহাকে আমি যে কোন উপায়ে আয়ত্ত করিতে চাই! তুমি আমার সহায় হও কুলসম্।"

হায়! সে মায়াবিনী কুলসম কোথায়? সে যেন কুহকবলে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া কোন স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যেন মন্ত্রবলে সহসা সেই কক্ষমধ্যবর্ত্তী এক গুপ্ত দ্বার-পথ খুলিয়া গেল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কুলসমের স্বামী—বৃদ্ধ সেখজী।

সেখজী হাসিয়া বলিল—"মুসাফের! এখনও পর্য্যন্ত ঘুমাও নাই? রাত যে অনেক হইয়াছে। এ রাত্রে কুলসমকে ডাকিতেছিলে কেন? সে তো আমার বিবি! আমি আজ তোমাকে আশ্রয় দিয়া যে উপকার করিয়াছি, ইহাই কি তাহার যোগ্য প্রতিদান সাহেব?"

আমি মহালজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিলাম—"ছি! ছি! সত্যই আমি অন্যায় করিয়াছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি ত তিলমাত্র দোষী নই। এই কুলসমই'ত উপযাচিকা হইয়া, আমার কাছে আসিয়াছিল। অতি নির্লজ্জার মত, প্রগল্‌ভার মত, ব্যবহার করিতেছিল। দেখিতেছি—এই সেখজী, তাহার চেয়েও নির্লজ্জ। কারণ সে আপনার প্রগল্‌ভা পত্নীকে শাসন করিতে না পারিয়া, আমাকে শাসাইতে আসিয়াছে।"

সেখজী আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল—"সাহেব! আপনি হয়তো মনে ভাবিতেছেন, আমি কুলসমকে শাস্তি না দিয়া আপনাকে তিরস্কার করিতে আসিলাম কেন? কিন্তু দোহাই আল্লার! আমি এ কথা নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। কুলসম আমার তৃতীয় পক্ষের ধর্ম্ম-পরিণীতা পত্নী! সে বিলাসভোগদৃপ্তা, সৌন্দর্য্যদর্পিতা! যতদূর বুঝিয়াছি, তাহার চরিত্র অতি দুরভিগম্য। আমি এক এক সময়ে তাহার নির্লজ্জ ব্যবহার দেখিয়া বিরুদ্ধ সন্দেহ করি, কিন্তু সন্দেহের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না। এক এক সময়, তার অনুচিত স্বাধীন ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়—সে বুঝি চরিত্রবল হারাইয়াছে! আবার যখন ভাবি—যে অর্থের, ঐশ্বর্য্যের, সিংহাসনের

প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া, সে এই দরিদ্র বৃদ্ধ সেখের উপর অনুরক্ত, আর তার এই অনুরাগ মুখের নয় প্রাণের, তখন ভাবি—কে এ? কেন আমায় এ ভাবে ছলনা করিতে আসিয়াছে! একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তার প্রাণে একটুও কপটতা নাই। সে যখন যা করে, আমায় সব ভাঙ্গিয়া বলে। দোষ করিলে পায়ে ধরিয়া মাফ্ চায়—আবার নিজেকে নির্দ্দোষী বুঝিলে, তাহার সুরমামাখা সুন্দর চোখ্ দুটি ঘুরাইয়া, আমায় দশকথা শুনাইয়া দেয়।"

দেখিলাম—বুঝিলাম, সেখজী কুলসমের স্বামী হইয়াও তাহার বিচিত্র চরিত্র বুঝিতে অক্ষম। শুনিলাম, সে কুলসমকে সন্দেহও করে—আবার বিশ্বাসও করে! এমন সমস্যায় কেহ পড়িয়াছ কি?

সেখজী বলিল—"মানুষ প্রবৃত্তির মোহে মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থায়, সব ভুলিয়া থাকে। এই কুলসমের ভুবনমোহন রূপ, আর অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া, আমিও সব ভুলিয়াছি। আমার নসীব আমাকে বড়ই জ্বালাইতেছে সাহেব! আমি সেই নসীবকে এইবার জব্দ করিতে চাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"নসীবকে জব্দ করিতে ত এ পর্য্যন্ত কেহই পারে নাই সেখজী? সম্রাটে যাহা পারে নাই, মহাজ্ঞানী সাধুতেও যাহা পারে নাই, তুমি আমি সামান্য মানুষ হইয়া তাহা পারিব কি?"

সেখজী বলিল—"আমি তাহা করিব। বুঝিতেছি, আমার নসীব সুখের আকাজ্ক্ষা করে। এ বৃদ্ধ বয়সে রূপবতী স্ত্রী লইয়া সুখী হইতে চায়। আমি তাহাকে সেই সুখ ভোগ করিতে দিব না।"

মনে ভাবিলাম, এই সেখজীও কুলসমের মত এক অদ্ভুত সমস্যা! এ নিজেকে, নিজেই জব্দ করিতে চায়। কুলসমের উপযুক্ত স্বামীই বটে! প্রকাশ্যে বলিলাম—"কি করিয়া তুমি তোমার নসীবকে জব্দ করিতে চাও, সেখজী?"

সেখজী উত্তেজিত স্বরে বলিল—"কুলসমের হৃদয়ের শোণিতে!"

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম—"সে কি! স্ত্রীহত্যা করিতে চাও নাকি তুমি?"

সেখজী নিরাশার বিকট হাসি হাসিয়া বলিল—"খোদার মরজি সাহেব! আমি তাহাই করিব। তবে নারী-শোণিতে নিজের এ দুর্ব্বল-হস্ত রঞ্জিত করিতে পারিব না। পারিলে—এতদিনে তাহা করিতাম। সৈনিক! তোমার ঐ কোষবদ্ধ অসি, কিংবা অই কটি-সংলগ্ন ছোরা, আমার এ উন্মাদ কল্পনার সহায়তা করিবে। আমি বৃদ্ধ—অস্ত্র ধরিলে হাত কাঁপে! অত ক্ষুদ্র ছোরাও বোধ হয়, দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে পারিব না। পারিলেও তাহা স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যময়ী কুলসমের বুকে বসাইতে পারিব না। তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিলে সব ভুলিয়া যাইব। মুসাফের! আমার সহায় হও। আমি তোমার গোলাম!"

ঘটনাচক্রপ্রেরিত, দুইটী অদ্ভুত সমস্যার গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া, আমি বড়ই অধীর হইয়া উঠিলাম। এ কর্ম্মময় জীবনে, এত গোলযোগের মধ্যে আর কখনও পড়ি নাই। এমন পৈশাচিক প্রস্তাবও ইহজীবনে আর কখনও শুনি নাই! যে ফুল্ল কুসুম, ধরাবক্ষে অনন্ত শোভার সৃষ্টি করিয়া, সুখের পবনে প্রফুল্লমনে দুলিতেছে, সেখজী কিনা তাহাকে অকালে বৃন্তচ্যুত করিতে চায়! আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম—"কেন সেখজী! কুলসম তোমার কাছে এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যে তুমি তাহার কোমল বুকে ছোরা বসাইবে?"

সেখজী উত্তেজিত স্বরে বলিল—"কি করিয়াছে! কি যে করিয়াছে, তাহা ঐ খোদা জানেন। ইয়ে মেরে খোদা! মেরে আসক্ বি টুট্ গিয়া! মহব্বৎ বি টুটা। স্থির জানিও—মোসাফের! এই মায়াবিনী কুলসম জীবিত থাকিতে, আমি কখনই সুখী হইব না।"

"না—সেখজী তুমি ভ্রান্ত! বৃথা সন্দিগ্ধ! আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কুলসম কখনই ব্যাভিচারিণী নয়।"

সেখজী বলিল—"আমিও তাই মনে ভাবি সাহেব! কিন্তু তাহাকে এই সময়ে নষ্ট না করিলে, সে একদিন নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে ডুবিবে। ঐ কমনীয় রূপের প্রবল আগুনে, সব ছারখার করিবে!"

"কেন?"

"স্বয়ং দুর্গাধিপতি—তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী!"

"বটে! কেমন করিয়া এ কথা জানিলে?"

"এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আমি পাইয়াছি। সাহেব! বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে। এখন আপনাকে কাজের কথা বলি শুনুন। আপনি আমার এ সামান্য প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমি আপনার সহায়তা করিব।"

"যদি আমি এ ঘৃণিত হত্যাব্যাপারে তোমার সহায়তা না করি?"

"তাহা হইলে এখনিই সাহ সোহানীকে সংবাদ দিয়া, আপনাকে বন্দী করাইব। আমিও জানি—আপনি কে। আপনি জহরৎ ব্যবসায়ী ইরাণী বণিক নন্। আপনি আকবরশার ছদ্মবেশী সেনাপতি, ইস্কান্দার খাঁ। আপনি এই দুর্গাধিপতি সোহানীর সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছেন!"

আমি কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া বলিলাম—"এই কক্ষে আর কেহই নাই। সেখজী! যদি তোমায় এখনি বধ করি, তাহা হইলে আমিও বোধ হয় নিরাপদ হইব—কুলসমও বাঁচিবে।"

সেখজী বিকট হাস্য করিয়া বলিল—"তা তুমি পারিবে না। অনেক কারণে নয়। এই শক্তিহীন, অস্ত্রহীন, অসহায় বৃদ্ধকে, তোমার মত বীর-পুরুষে, কাপুরুষের মত কখনই বধ করিতে পারিবে না। আমি বুক পাতিয়া দিলাম। পার—আমার এ জীর্ণ বুকে তোমার ঐ ছোরার আঘাত কর।"

আমি সেখজীর এ কথায় একটু অপ্রতিভ হইয়া, অসি কোষনিবদ্ধ

করিলাম। বিরক্তভাবে বলিলাম—"সেখজী! তোমার ঘৃণিত সংকল্প হইতে বিরত হও। আর কখনও এ কথা মুখেও আনিও না।"

সেখজী বলিল—"খালি যদি কুলসমের জন্য হইত, তাহাহইলে না হয় আমি নিবৃত্ত হইতাম। কিন্তু সাহেব! আমি যে—সোহানীর সর্ব্বনাশ করিতে চাই। এই নিষ্ঠুর অত্যাচারী সংসারের, এক বিজনপ্রান্তে কুটীর বাঁধিয়া, কুলসমের মত একটী দুর্ল্লভ সুন্দরীরত্ন সংগ্রহ করিয়া, একটু মনের সুখে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতেছিলাম! কিন্তু মদগর্ব্বিত সোহানী, আমার সে সুখে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।"

আমি বলিলাম—"তাই যদি হয়, তাহাহইলে সমস্ত দোষই সোহানীর!"

সেখজী বলিল—"কিন্তু দরিদ্রপত্নী ঐ কুলসম কেন অত কমনীয় রূপরাশি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে সাহেব? ইহাই আমার বিচারে, তাহার প্রধান অপরাধ! তার পর একদিন সে আমারই সমক্ষে, সোহানীর ওষ্ঠাধর-চুম্বিত প্রসাদী-সেরাজী খাইয়াছে। এই জন্যই আমি দেখিতে চাই, যে একদিন তাহার শবাধারের শ্বেত আবরণবস্ত্র—তাহার বক্ষঃনিঃসৃত শোণিতধারার সেই উচ্ছিষ্ট সেরাজীর ন্যায় রক্তরাগ ধারণ করিবে। কুলসম যদি প্রশ্রয় না দিত, তাহাহইলে কি দর্পিত সোহানী এই দরিদ্র সরাই-রক্ষকের স্ত্রীকে অতটা আত্মীয়তা দেখাইতে সাহস করিত?"

আমি কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—"সেখজী! দেখিতেছি, দুর্গাধিপতি সোহানীর সর্ব্বনাশ, এখন আমাদের উভয়েরই লক্ষ্য। আর বুঝিতেছি, তোমার সহায়তা ভিন্ন, আমি সোহানীকে এ ক্ষেত্রে ধরিতে পারিব না। আমার অনুরোধে কুলসমের অই সামান্য অপরাধটা মার্জ্জনা কর। একটা ভিত্তিহীন কারণে, পরিণীতা পত্নীর উপর সন্দেহ করিতে নাই। কুলসম যে কি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

সেখজী নিরাশভাবে বলিল—"খাঁ সাহেব! সত্যই তাহাকে চেনা বড় শক্ত! আমার বোধ হয়, গুলসানার নিকট সে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে। তোমায় ধরাইয়া দিবার জন্য, এই কৌশল-জাল পাতিতেছিল। ভাল কথা, কুলসমের শোণিতে তোমাকে হস্ত রঞ্জিত করিতে হইবে না। একটা কাজ কর তুমি, যাহাতে সকল দিক রক্ষা পাইবে!"

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলাম—"কি কাজ?"

সেখজী বলিল—"আমি সোহানীকে ধরাইয়া দিব, তোমার সহায়তা করিব। কিন্তু একটী মাত্র করারে।"

"কি করার সেখজী?"

"সোহানী বন্দী হইলে নিশ্চয়ই আগরাতে চালান হইবে। আমিও তোমার সহিত আগরায় যাইব। আমি সেখানে গিয়া বাদশাহের নিকট নালিশ করিব—"এই কুলসম, গুলসানার অর্থে ক্রীতা হইয়া, দিল্লীশ্বরের সেনাপতিকে, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বাদসাহ এ অভিযোগে, নিশ্চয়ই কুলসমের প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। তুমি এ কথা সমর্থন করিলেই, সব হাঙ্গাম সহজে মিটিয়া যাইবে। তোমার অসিও রমণী-রক্তে অযথা রঞ্জিত হইবে না। কুলসমের হত্যার কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করিবে না।"

আমি মনে ভাবিলাম—দুনিয়ার এ দুইটী অদ্ভুত জীবের সহিত চতুরতা করা ভিন্ন, উপায়ান্তর নাই। যদি সোহানীকে বন্দী করিয়া আগরায় লইয়া যাইতে পারি, তাহাহইলে কুলসমের জীবন রক্ষা করা, আমার পক্ষে তখন বেশী দুরূহ কার্য্য হইবে না। কাজেই আমি বলিলাম,—"এ প্রস্তাব মন্দ নয়। ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

সেখজী বলিল—"তোমার অই অসি স্পর্শ করিয়া শপথ কর।"

আমি বলিলাম—"শপথ যে মহাপাপ সেখজি! কোরাণ-শরীফের নিষেধ! আমি জীবনে মিথ্যা বলি নাই। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতেই

স্বীকৃত হইলাম। বলিতে পার, কুলসম এখন কোথায়? তার সঙ্গে আমি দু'টো কথা কহিতে চাই। তাহাকে যে আমি ভগ্নি সম্বোধন করিয়াছি।"

সেখজী বলিল—"সে তয়খানার ঠাণ্ডা ঘরে বসিয়া, মেজাজটা ঠিক করিবার জন্য, হয়ত সেরাজী খাইতেছে, না হয় গান গাহিতেছে। আর আমিও তার কামরার দরোজায় কুলুপ দিয়া আসিয়াছি। যদি সোহানীকে ধরিতে চাও সাহেব—ত এখনি তার বন্দোবস্ত কর।"

আমি বলিলাম—"আমার সঙ্গে পঞ্চাশৎ জন মোগলসেনা আছে। তাহারা আমারই আদেশে, ছদ্মবেশে এই সহরের সরাই সমূহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সংবাদ না দিলে ত কিছুই করিতে পারিব না।"

"পত্র লিখিয়া দাও—আমিই তাহাদের সংবাদ দিতেছি।"

"একটা কথা আগে জানিতে চাই। কোন্ পথে দুর্গে যাইবে সেখজি?"

"এক গুপ্তপথে! মাত্র চারিজন সে পথ জানে। আমি, গুলসানা, কুলসম, আর সোহানী!"

"বটে! আজ হইতে তুমি আমার দোস্ত। এই কাজ ফতে হইলে, শিরোপা, জাইগীর, আসরফি যাহা ইচ্ছা কর, সবই সরকার হইতে দেওয়াইব।"

সেখজী, এ কথায় অনেকটা প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। আমার এ মতলবটা তাহার মনের মত হইয়াছে। সে হাস্যমুখে বলিল—"সে কথা এখন থাক, সেনাদের প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ-পত্র লিখিয়া দাও?"

আমি সেনাধ্যক্ষের নামে একখানি পত্র লিখিয়া, সেখজীর হাতে দিলাম। সেখজী তখনই চলিয়া গেল। আমি ঘটনাচক্রচালিত হইয়া, চারিটী দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মধ্যে পড়িলাম। প্রথম সোহানী, দ্বিতীয়—তার পত্নী, তৃতীয় কুলসম—আর সর্ব্ব শেষ এই বৃদ্ধ সেখজী!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেখজীর কথা শুনিয়া ও মুখের ভাব দেখিয়া, আমার ধারণা হইয়াছিল সে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে, সেখজী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আমার সরাইখানার পশ্চাতের বাগানে, সেনাদের জমায়েৎ করিয়াছি। আপনি শীঘ্র আসুন।"

আমি প্রস্তুতই ছিলাম। কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে, তাহার অনুসরণ করিলাম। সেখজীর প্রদর্শিত গুপ্তপথ দিয়া—ইদলদুর্গ নিম্নবর্ত্তী উপত্যকার মধ্যে নিঃশব্দে উঠিতে লাগিলাম। কাহারও মুখে কথাটী মাত্র নাই। আজ রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে, সোহানী আমার বন্দী হইবে! আকবরসাহের সুখ-স্বপ্ন সফল হইবে। আর আমার ভবিষ্যৎ আরও সমুজ্জ্বল হইবে। হায়! মুগ্ধ আত্মম্ভরি মানব! আশার ছলনায় তুমি যতটা প্রতারিত হও, এমন ত আর কেহ নয়।"

একটী বাঁক ফিরিবার পরই, সোহানীর দুর্গ দেখা গেল। প্রস্তরময়-দুর্গচূড়া উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মিময়। কিন্তু দ্বিতলের একটী কক্ষের গবাক্ষগুলি তখনও উন্মুক্ত। সেই গবাক্ষ দিয়া, সমুজ্জ্বল আলোকরেখা, নিম্নস্থ নৈশ-কুসুমশোভিত পুষ্পোদ্যানে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

সেখজী সকলের আগে আগে যাইতেছিল। সহসা একস্থানে চমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ হইল সাহেব!"

আমি ভাবিলাম—হয় ত সোহানীর কোন সতর্ক প্রহরী, আমাদের দেখিতে পাইয়াছে। কাজেই আমিও অতি সন্ত্রস্তভাবে বলিলাম, "কিসের সর্ব্বনাশ সেখজী? ব্যাপার কি—শীঘ্র বল!"

সেখজী বলিল—"আমি আর আপনার সঙ্গে যাইব না। যে কক্ষে আলো জ্বলিতেছে, তাহা এই মুলুকের বাদ্‌শা সোহানীর খাসকামরা।

সোহানী আজ নিশ্চয়ই কোন উৎসব-আমোদে উন্মত্ত। সে যে এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস আমার আগে ছিল না। এখন আপনার চেষ্টা ও কৌশলের উপর ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ভর করিতেছে। দুর্গের পশ্চাতের গুপ্ত-দ্বারই আপনার প্রবেশপথ। কিন্তু সতর্ক সোহানী নিশ্চয়ই সেখানে পাহারা রাখিয়াছে। পারেন—নিজে গিয়া প্রহরীদের বিনা গোলযোগে নিহত করুন। না পারেন, সোহানীর ভীমকায় পাঠান সেনারা এখনই সেই গুপ্তদ্বারের প্রহরীর সঙ্কেত-ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া, আপনাকে শশকের ন্যায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবে। এই চন্দ্রালোকিত জ্যোৎস্নাময়ী উপত্যকা ভূমি, রজনী প্রভাতের পূর্ব্বে মোগল-শোণিত প্লাবিত হইয়া, এক ভীষণ দৃশ্য বিকাশ করিবে। দোহাই আল্লার! দোহাই হজরতের! আমি যে আপনাকে এ গুপ্তপথ দেখাইয়া দিয়াছি, তাহা ভ্রমেও প্রকাশ করিবেন না। আপনার উপকার করিতে আসিয়াই, আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইল। সোহানীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি অতি নিষ্ঠুর! অতি ভয়ানক।”

আমি বলিলাম—“শেখজী! এ ক্ষেত্রে যদি তুমি না হইয়া আর কেহ এ কথা গুলি বলিত, তাহাহইলে আমি এখনই তাহার বুকে ছুরী বসাইয়া দিতাম। কিন্তু সুন্দরী কুলসমকে আমি বিধবা করিতে চাই না! ভাই হইয়া ভগ্নির সর্ব্বনাশ করিতে চাই না। মনে রাখিও—শেখজী! বিশ্বাস-ঘাতককে মোগল যে ভীষণ শাস্তি দেয়, পাঠান তাহা কল্পনায় আনিতে পারে না। ভীত কুক্কুর! স্বচ্ছন্দে তুমি ঐ ঘৃণিত ভয়-কম্পিত প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইতে পার। আর আমি তোমার সহায়তা চাহি না।”

ভয়কম্পিত শেখজী, দুই হাত তুলিয়া আমায় সেলাম করিয়া, তখনই ঊর্দ্ধশ্বাসে সে স্থান ত্যাগ করিল।

সেখজী ত পলাইল। কিন্তু আমি এক ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়িলাম।

দুর্গের এই গুপ্তদ্বার লৌহময় এবং অতি মজবুত। দ্বারের উপর প্রকাণ্ড প্রস্তর প্রাচীর। দ্বার পরীক্ষায় বুঝিলাম, তাহা ভিতর হইতে আবদ্ধ। বাহিরের দিকে সে দ্বারে কোন চাবিই লাগানো ছিল না।

মনে ভাবিলাম, তবে কি আবার বিনা গোলযোগে সরাইখানায় ফিরিয়া যাইব? না—যখন এতটা আসিয়াছি, তখন যে উপায়েই হউক, দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতেই হইবে।

চন্দ্র তখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী। জ্যোৎস্নাও মলিনভাতি। সেই মলিন জ্যোৎস্নায়, অদূরে সহসা এক ছায়ামূর্ত্তি দেখা দিল। আমি ভাবিলাম, সেখজী হয় ত অনুতপ্ত হইয়া, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে মূর্ত্তি যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, আমার বোধ হইল, তাহা যেন পুরুষের নয়—কোনও স্ত্রীলোকের!

স্ত্রীলোক! এত রাত্রে! এই নিভৃত উপত্যকায়! সে যে দিক হইতে আসিতেছিল, আমি সেই দিকে একটু অগ্রসর হইলাম।

সোহানীর সেই বীর্য্যবতী পত্নীর কথা, বিদ্যুৎস্ফূরণবৎ তখনই আমার মনোমধ্যে উদয় হইল। যদি তাই হয়, তাহাহইলে আমাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত! খাঁ-জাহান্দার আমা অপেক্ষা অভিজ্ঞ ও বয়োবৃদ্ধ সেনানী। তাঁহাকে যখন অতটা লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, তখন, আমি কোন ছার?"

আমি উৎকণ্ঠায়, আগ্রহে, কঠোরস্বরে বলিলাম—"কে তুমি? সত্য পরিচয় দাও—নচেৎ এখনি বিপদ ঘটিবে!"

সেই অপরিচিতা স্ত্রীলোক, আমাকে উন্মুক্ত অসিহস্তে, সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিয়া বলিল—"ইস্কান্দার! ভাই! আমি কুলসম। স্থির হও। ধৈর্য্য হারাইও না।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"কুলসম্! বহিন্! তুমি এখানে আসিলে কিরূপে?"

কুলসম বলিল—"আস্তে কথা কও! আমি নিঃশব্দপদসঞ্চারে তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম। আমার স্বামী—অতি কাপুরুষ! তাহার প্রকৃতি আমি খুব ভালই জানি। বুঝিয়াছিলাম সে ভয় পাইলেই, তোমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া পলাইবে। তাহা ছাড়া দুর্গের এই গুপ্তদ্বারের একটী চাবি আমার কাছেই থাকে। শেখজী তাড়াতাড়িতে ও আমার ধ্বংসসাধনের অতিরিক্ত আগ্রহে উৎফুল্লচিত্ত হইয়া, সেই চাবি ভুলিয়া আসিয়াছে। সে তোমার সঙ্গে থাকিলেও, এ সঙ্কট সময়ে তোমাদের কোন সাহায্যই করিতে পারিত না।"

ধীরভাবে মনোমধ্যে বিচার করিয়া বুঝিলাম, এই কুলসম দেখিতেছি খোদার দুনিয়ায় অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ প্রকার বুদ্ধিমতী বনিতা পাইয়াও সেখজী সুখী হইল না কেন?

কুলসম আমাকে নির্ব্বাক্ থাকিতে দেখিয়া বলিল—"ভাই! আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। আমি আড়ালে থাকিয়া তোমার ও শেখজীর সব কথাই শুনিয়াছি। সে কাপুরুষ! অতি লঘু! সোহানী যে তার ধর্ম্ম-পরিণীতা পত্নীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তাহাও সে জানে। সোহানীর শোণিত দর্শন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তবু সে তাহা করে না—করিবার শক্তিও নাই। অথচ আমার প্রাণনাশ করিতে চায়। আমি অবিশ্বাসিনী নই—খোদার নামে কিরা করিয়া বলিতে পারি, এখন পর্য্যন্তও আমি সতীধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন পাপই করি নাই। তোমার সহিত যে ওরূপভাবে কথোপকথন করিয়াছিলাম, সেটা কেবল তোমার চরিত্র-বল পরীক্ষার জন্য।"

সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, আমি বলিলাম—"ভগিনী! সবই আমি বুঝিয়াছি। আর যতদিন আমি এখানে থাকিব, সেখজী তোমার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না। অই দেখ—কুলসম! সোহানীর দ্বিতলকক্ষের দীপাবলী নির্ব্বাপিত প্রায়। বোধ হয়, সে এখন শয়ন করিতে গেল।

আমাকে গুপ্তদ্বারের চাবি খুলিয়া দাও—আমি এই অবসরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করি।”

কুলসম সাগ্রহে বলিল—“ঠিক সময়েই আমরা এই দুর্গদ্বারে পৌঁছিয়াছি! দেখিতেছি, সোহানী আজ প্রাণ ভরিয়া সেরাজী খাইয়াছে! পুরীর বাহিরে থাকিয়াও, আমি যেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। আর বৃথা সময় নষ্ট করা কেন?”

কুলসম তৎক্ষণাৎ ওড়নার অঞ্চল হইতে একটী ক্ষুদ্র চাবি বাহির করিল। সেই দ্বারের একাংশে একটী গুপ্ত ছিদ্র ছিল। তাহাতে সেই কুঞ্জিকা প্রবেশ করাইবা মাত্রই, নিঃশব্দে সেই গুপ্তদ্বার খুলিয়া গেল। কুলসম চাবিটী খুলিয়া বলিল, “ভাই! খুব সাবধানে কাজ করিও! সোহানী তোমায় দেখিলেই শিকারলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায়, অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধরিবে। আর তাহার পত্নী গুলসানা—তাহার ভয় আরও বেশী। এই নাও—রজ্জু-সোপান। যদি সোহানীকে বন্দী করিতে পার, তবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা করিব, নতুবা এই শেষ!” এই বলিয়া কুলসম সেই বিরল-জ্যোৎস্নাস্নাত, এক শ্যামল বিটপীর নিবীড় অন্ধকারময় ক্রোড়ে সহসা অদৃশ্য হইল।

এখন এক কঠোর কর্ত্তব্য আমার সম্মুখে। হয়ত একটু ভ্রমে, একটু ত্রুটিতে, এই সোহানী আমার হাতছাড়া হইতে পারে। কিংবা তাহার শরীররক্ষী সেনারা কোন উপায়ে জানিতে পারিলেই, দুর্গপ্রাঙ্গণ এখনি মোগল-শোণিতে সুরঞ্জিত হইবে। অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক ভাবিয়া, আমি সংকেত বংশীনিনাদ করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই সংকেত-ধ্বনি শুনিবামাত্রই, দশজন বলিষ্ঠ মোগলযোদ্ধা, উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে, আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাদের মধ্যে একজনকে মৃদুস্বরে বলিলাম—"মহম্মদ আলি! অতি সন্তর্পণে, দৃঢ়পদে, ঐ ক্ষীণালোকিত কক্ষের দিকে চলিয়া যাও। যদি কোন লোক বাধা দেয় বা সম্মুখে পড়ে, তাহাকে তখনই চাপিয়া মারিবে।"

আবার সেইরূপ মৃদু সংকেত-শব্দ করিলাম। আরও পনর জন মোগল সেনা নিঃশব্দে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাদের মধ্য হইতে দশজনকে বাছিয়া লইয়া, দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সেই ঘাটিতে একজন প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত ছিল। সে আমার সুগঠিত মূর্ত্তি ও সমুজ্জ্বল মোগলাই শিরস্ত্রাণ দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দুষমন্! শয়তান! ভাইলোক সব জমায়েতবন্দ হও!"

আমার সঙ্গী, বেন্‌কাশিম নামক একজন সাহসী সেনানী, মুহূর্ত্ত মধ্যে তরবারি খুলিয়া—তখনই সেই প্রহরীর মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিল।

আমি খোদাকে ধন্যবাদ দিয়া, সোহানীর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এই বেন্‌কাশিমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"তোমরা পাঁচজন আমার সঙ্গে আইস, ও অবশিষ্ট সেনা এই স্থানে পথ রক্ষা করুক।" আমাদের সম্মুখেই সোহানীর সুসজ্জিত দরবার কক্ষ।

কক্ষের সম্মুখ হইতে একটী মর্ম্মরময় সোপান, বরাবর দ্বিতলে চলিয়া গিয়াছে। এই জন্য, সোপান মুখে পাঁচজন প্রহরীকে রাখিয়া, আমি অতি সন্তর্পণে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সোপানশ্রেণী শেষ হইলে, একটী রাজোচিত সজ্জাপূর্ণ, মর্ম্মরময় দালানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

দালানটীর বিচিত্র খিলানের নীচে—রঞ্জিত স্ফটিক-পাত্রে, সন্তচন্দ্রিত

সুবাসপূর্ণ, সরস পুষ্পসমূহ অতি সযত্নে সুরক্ষিত। গন্ধরাজ, বেলা, মল্লিকা, চম্পা, চামেলি প্রভৃতি সুগন্ধভরা ফুল্ল কুসুমবাসে, দালানের বারান্দাটী, মনোমদ সুগন্ধে আকুলিত। এই বারান্দার মধ্যস্থলে একটী রৌপ্যময় বেষ্টনীর মধ্যে, শ্বেতমর্ম্মরময় আধারের উপর এক রজতনির্ম্মিত গোলাপ-জলের ফোয়ারা। তাহাহইতে অনবরত গোলাপজল উৎসারিত হইয়া, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত নৈশ-কুসুমবাসের সহিত মিশিয়া, সেই স্থানকে বেহেস্তের সুগন্ধে পূর্ণ করিয়াছে।

আমি দুইজন প্রহরীকে গুপ্তভাবে এই প্রসূনসুবাসবাসিত বারান্দায় রাখিয়া, অতি সতর্কভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রাসাদের উপর তল—চক-মিলান। উপরের কক্ষগুলির সম্মুখদিক ব্যাপিয়া, একই রূপ মর্ম্মরমণ্ডিত দালান। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেরই সজ্জা বিভিন্ন রূপ। সকল বারান্দাতেই লাল, নীল, পীত, শ্বেতবর্ণের স্ফাটিক-দীপাবলী জ্বলিতেছে। কিন্তু সেখানে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই!

মনে ভাবিলাম, উপযুক্ত সময়েই আসিয়াছি। কিন্তু সোহানী কোন্ কক্ষে আছে—তাহা ত ঠিক জানি না। কুলসম বলিয়া দিয়াছিল, দ্বিতলের কক্ষেই সে থাকে। উৎসবামোদ-ক্লান্ত, মদির-বিহ্বল, শক্তিহীন, সোহানীকে ধরিবার এত সুযোগ—বুঝি এ জীবনে আর পাইব না।

ভাবিতে ভাবিতে, আরও একটু অগ্রসর হইলাম। আমার দক্ষিণ পার্শ্বেই একটী কক্ষ। সহসা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। পদদ্বয় যেন আর অগ্রসর হইতে চাহিল না।

এক রূপসী রমণী, সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। তাহার বামহস্তে, মৃদু-বায়ু-বিকম্পিত, ধীরে প্রজ্জ্বলিত, সুগন্ধ-মধুখদীপ। দক্ষিণহস্তে, স্বর্ণভৃঙ্গার। ললাট-পার্শ্বে-বিস্তারিত সংসর্পিত, সুকৃষ্ণ, কুঞ্চিত, অলকদাম

সমুজ্জ্বল দীপরশ্মিতে চক্‌মক্‌ করিতেছে। তাহার বরবপুবেষ্টিত মণিখচিত ওড়নার সাঁচ্চাকাজের উপর, সেই উজ্জ্বল আলোক-রেখা পড়িয়া—বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। আর—সেই স্বাভাবিক রক্ত-রাগময় গণ্ডে, যেন লোহিত প্রভাময় বস্‌রাই গুলাবের পূর্ণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুহূর্ত্তমাত্র, আমি সেই অপ্সরোপম মূর্ত্তি দেখিলাম। তাহাকে দেখিবা-মাত্রই বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলাম! নয়নে নয়নে মিলন হইবামাত্রই, সেই সুন্দর গণ্ড যেন আরও আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টি লজ্জা-সংকোচপূর্ণ ও অতি সচকিত। আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আশা যেন মৃদুস্বরে আমার কর্ণকুহরে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া গেল—"এই—সেই! এই—সেই! যার জন্যে তুমি উন্মাদ, এই—সেই! খুব সাবধানে কাজ করিও।"

সত্যই—সে! যার চিত্রখানি আমি দিনরাত বুকে করিয়া ফিরিতেছি, স্বপ্নে, জাগরণে, যাহার উজ্জ্বলপ্রভাময় মূর্ত্তি লইয়া—কল্পনা-সহায়তায় এক বিচিত্র স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছি, সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আজ আমার সম্মুখে!

সেই রূপশালিনী রমণী, স্থির, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। তাহার মুখে একটা ঔৎসুক্য ভাব থাকিলেও—তাহাতে যেন কোন চঞ্চলতা নাই। এত রাত্রে একজন সুগঠিতকায়, সশস্ত্র মোগল-সেনাপতিকে সম্মুখে দেখিয়াও, সে যেন তিলমাত্রও ভয় পাইল না—বা রমণী-স্বভাবসুলভ ভয়ে একটুও চীৎকার পর্য্যন্ত করিল না।

করধৃত স্বর্ণ-ভৃঙ্গার, ধীরে ধীরে মর্ম্মর-মণ্ডিত হর্ম্ম্যতলে নামাইয়া, সেই বরাঙ্গিনী, রত্নখচিত ফিরোজা ওড়না খানি দিয়া, সলজ্জভাবে তাহার সুন্দর মুখখানি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত করিল। আর সেই ফিরোজা রঙ্গের ওড়নার ভিতর দিয়া, তাহার হেমকান্তি, বিজলীকণার মত ফুটিয়া বাহির হইতে

লাগিল। কি ভুবনমোহিনী রূপ! যার জন্য আমি উন্মত্ত, এ যে তারই সজীব প্রতিমা!

রমণী দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল—"কে আপনি? এ নিশীথে, সম্ভ্রান্ত দেশাধিপতির অন্তঃপুরে, চোরের মত আসিয়াছেন কেন?"

এই শ্লেষ-বিজড়িত প্রশ্নে, আমি যেন একটু অপ্রতিভ হইলাম। সুন্দরীর কণ্ঠোচ্চারিত, জ্বালাময় শ্লেষও কি এত সুন্দর? আমি চমকিত নেত্রে দেখিলাম, সেই কৃষ্ণতারকাময় উজ্জ্বল চক্ষু দুটি ক্রোধে জ্বলিতেছে। তাহার সেই রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর যেন ক্ষোভে, মৃদু-বিকম্পিত হইতেছে। গুলাবরাগময় গণ্ডস্থল, আরও আরক্তিম হইয়াছে।

আমি সুমিষ্ট স্বরে বলিলাম—"আপনি কে?"

উত্তর হইল—"আমি গুলসানা! এই দুর্গাধিপতির পত্নী! এই গৃহের স্বামিনী, আর এই ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের দর্পময়ী অধিশ্বরী। আমি আপনাকে রাজ্যেশ্বরীরূপে আদেশ করিতেছি, এখনি এ স্থান হইতে চলিয়া যান। নচেৎ আপনার হৃদয়শোণিতে এই মর্ম্মর-মণ্ডিত কক্ষতল এখনই আর্দ্র হইবে।"

আমি একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম—"আপনার সেনাদের উপরে উঠিবার পথ বন্ধ করিয়াই, আমি এখানে আসিয়াছি। আমি সম্রাট্ আকবর বাদ্‌শাহের সেনাপতি। পঞ্চ সহস্রাধিক সেনা আমার সঙ্গে। জানি না, আপনার স্বামী সোহানি শাহ কত সেনা লইয়া রাজত্ব করেন!"

সেই শৌর্য্য-বীর্য্যময়ী রমণী, আমার এই কথায় যেন বড়ই কুপিতা হইল। সে উন্নত গ্রীবাভঙ্গি করিয়া, বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে বলিল—"আপনি দেখিতেছি সেই খাঁ-জান্দাহারের দলের লোক। সেও চোরের মত, এইরূপে একদিন আমাদের দুর্গে আসিয়াছিল—আর আপনিও আজ আসিয়াছেন। মোগল-সেনাপতিরা, এই ভাবেই শত্রু জয় করে বটে! আপনার আকৃতি দেখিয়া

বোধ হইতেছে, আপনি উচ্চকুল-জাত। মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে, সৈনিকোচিত মহত্বও আপনাতে আছে। সেই মহত্বের দোহাই—সাহেব! আপনি আমার মহল হইতে এখনই বাহির হইয়া যান্। সাহস থাকে, বাহির হইতে প্রভাতকালে দুর্গ আক্রমণ করিয়া, পাঠান-সেনার শক্তি পরীক্ষা করুন ও মোগল বীরত্বের পরিচয় দিন।"

আমি এই ভয়-বর্জ্জিতা, দর্পিতা, দৃঢ়চেতা রমণীর তীব্র শ্লেষময় কথায় একটু দমিয়া গেলাম। এই ত সে—যার জন্য আমি উন্মাদ! এই ত সে যাহার চিন্তায় আমার সুখ, ধ্যানে আমার আনন্দ। এত দিন তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরিয়াছি, আজ যে শান্তি-সরোবর আমার সম্মুখে! লহরমালা-পূর্ণ তটিনীকূলে দাঁড়াইয়া ত তৃষ্ণায় মরিতে পারি না। মান-সম্ভ্রম, যশ উচ্চপদ, সকলই অতল জলে নিমগ্ন হৌক। ইহাকে আমি চাই। যাহাই ঘটুক না—তাহাতে ভীত হইব না। কর্ত্তব্যহীনতার জন্য যদি আকবর-সার আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, হস্তীপদতলে বিমর্দ্দিত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার—তবু ইহাকে ছাড়িব না।

খোদা! তোমার সৃষ্টিতে রমণীকে এত রূপসম্পদ দিয়া সৃষ্টি করিলে কেন প্রভু! যে রূপ দেখিলে, মনে পাপকামনা আসে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি শিথিল হয়, সৎপ্রবৃত্তি শক্তিহীন হয়, কর্ত্তব্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, সেই সর্ব্বদাহী বিদ্যুজ্জ্বালা, তোমার শান্তিময় সংসারে, কি মহাপরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছ প্রভু?

সহসা সেই কোমল কণ্ঠনিঃসৃত মধুর কথায়, আমার চমক ভাঙ্গিল। গুলসানা বলিল—"মোগল সেনাপতি! বোধ হয়, আমার কথায় তোমার মনে হয়তো একটু অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। অনুশোচনা—খোদার তিরস্কার। হয়ত তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তুমি কতদূর নীচ প্রবৃত্তি চালিত হইয়া প্রভুর মনস্তুষ্টি বাসনায়, বীরপুরুষ হইয়া, আর এক শ্রেষ্ঠ বীরকে

হীনজনোচিত উপায়ে ধরিতে আসিয়াছ! এ সোণার হিন্দুস্থান ত আকবর বাদসার চাঘ্‌টাই-বংশের উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তি নহে। ইহাতে তোমার প্রভুরও যে স্বত্ব—আমার স্বামীরও তাই। যার বাহুবল অধিক হইবে, সেই হিন্দুস্থানে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিবে। যাও, চলিয়া যাও—প্রকৃত বীরের মত কার্য্য কর। আমি এখন বুঝিতেছি, কে তোমাকে আমার এই দুর্গের গুপ্তপথ দেখাইয়া দিয়াছে। খোদা যদি কাল প্রভাতে আমার আধিপত্য লোপ না করেন—তাহা হইলে সেই বাঁদীর বাঁদী কুলসম—আর কুকুরের অধম তার সেই বৃদ্ধ শয়তান স্বামী ইব্রাহিম খাঁর শোণিতে, ইদলগড়ের বধ্যভূমি লোহিত-রাগ রঞ্জিত হইবে।"

গুলসানা—রোষভরে যাহা বলিল, তাহার অনেক কথাই আমার কাণে গেল না। আমার বুদ্ধি, বিবেক, শক্তি, সাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সবই গুলসানার সেই অতুলনীয়, অবর্ণনীয়, রূপ-স্রোতে ভাসিয়া গেল।

কি আকর্ণ-বিশ্রান্ত, উজ্জ্বল কৃষ্ণতারকাময় সুন্দর চক্ষু! তাহাতে কত তেজ—কত ভাষা—কত মোহিনীশক্তি! মৃদুবিকম্পিত, রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর, কি সুন্দর—কি মধুর ভাবময়! অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশির কি অফুরন্ত সৌন্দর্য্য! মৃদুপবনবেগসঞ্চালিত, কপোল-বিলম্বী, চূর্ণ অলকার কি বিচিত্র মাধুরী। মণি-মুক্তা-খচিত, সূক্ষ্ম ফিরোজা বর্ণের ওড়না সহায়তায় সেই সুন্দর মুখখানি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। তাহা দেখিয়া বোধ হইল, নীল মেঘে—যেন চাঁদের মুখ ঢাকিয়াছে!

গুলসানা অধীরতাপূর্ণ বিরক্তির সহিত বলিল—"আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। স্বামী আমার আশাপথ চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহারই জন্য এই স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া সরবৎ লইতে আসিয়াছিলাম! মোগল! তুমি কি নির্লজ্জ? এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

আমি আবেগভরে, উন্মত্তের মত, গুলসানার সমীপবর্ত্তী হইলাম। প্রেমাবেশময় কম্পিতস্বরে, জড়িতকণ্ঠে বলিলাম, "গুলসানা! গুলসানা! খোদার দুনিয়ায় তুমি কি সুন্দর!"

গুলসানা, একটু হাসিয়া বলিল—"দয়া করিয়া খোদা আমায় সুন্দরী করিয়াছেন বটে, আবার অন্যপক্ষে তোমায় সাহসী যোদ্ধা করিয়াছেন। মোগল সেনাপতি! বৃথা সময়ক্ষেপ করিও না, রূপ দেখিবার সময় এ নয়! আমি এ রাজ্যের রাণী। আমার আদেশ—এখনি এখান হইতে চলিয়া যাও। নচেৎ মহা বিপদে পড়িবে। ইচ্ছা হয়, সাহস থাকে, আর একদিন আমার স্বামীর মিত্ররূপে আসিয়া, আমার স্বহস্তপ্রদত্ত, বস্‌রাই সেরাজী খাইয়া তৃপ্ত হইয়া যাইও।"

কি কঠোর বিদ্রূপ! শিরীষকুসুমকোমলা রমণীর প্রাণ, পাষাণের মত এত কঠিন কেন? আমি সত্যই উন্মত্ত, সত্যই নির্লজ্জ, সত্যই আত্মসম্মান বিরহিত অপদার্থ জীব!

আমি আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলাম—"গুলসানা! অত সুন্দরী হইয়া তুমি নিষ্ঠুর হইও না। তুমি আমার প্রাণের নিভৃতকন্দরে অপ্সরীরূপে বিরাজিতা। এই দেখ! তোমার তস্বীরখানি আমি বুকে লইয়া দিনরাত ফিরিতেছি। খোদা কৃপা করিয়া আজ তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। দু'দণ্ড নয়ন ভরিয়া তোমার ও সুন্দর কান্তি আমাকে দেখিতে দাও।"

গুলসানা, বিস্মিতভাবে বলিল—"কি বলিতেছ তুমি? আমার তসবীর তুমি কোথায় পাইলে?"

আমি তস্বীর খানি মুহূর্ত্তমধ্যে আঙ্গরাখার মধ্য হইতে বাহির করিয়া বলিলাম—"এই নাও, যাহা বলিয়াছি সত্য কিনা দেখ।"

গুলসানা, দূরে রক্ষিত—প্রোজ্জ্বল বর্ত্তিকাটি হাতে তুলিয়া লইয়া, ছবি খানি দেখিয়া বলিল—"সত্যই ত তাই! এ তস্বীর যে আমি বুড়া-

বাঁদিকে পাঁচজুতির মূল্যে বেচিতে দিয়াছিলাম। মনে ভাবিয়াছিলাম হয়তো ইহার খরিদ্দার জুটিবে না। তা দেখিতেছি তুমিই ধরা দিয়াছ। তুমি এখন চাও কি মোগল সেনাপতি?"

আমি বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় জড়িতস্বরে বলিলাম—"গুলসানা! গুলসানা! তোমার অই হেনা-রাগলাঞ্ছিত কুসুমকোমল হস্তখানি একবার আমাকে চুম্বন করিতে দাও।"

গুলসানা, এ কথায় ঘৃণাভরে মুখভঙ্গী করিয়া, দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। পদাহতা-ফণিনীর ন্যায়, উন্নত গ্রীবা-ভঙ্গি করিয়া বলিল—"ইস্কান্দার খাঁ! বড়ই অশিষ্ট তুমি! আমার স্বামী ভিন্ন আর কেহই আমার হস্ত-চুম্বন করিতে অধিকারী নহেন! তোমার এ ধৃষ্টতা সত্যই অমার্জ্জনীয়। সুযোগ থাকিলে, আমি এখনই খোজাদের ডাকিয়া, তোমার ছিন্নমুণ্ড দর্শন করিতাম।"

আমি নতজানুতে ভূমে বসিয়া, কাতর স্বরে বলিলাম,—"গুলসানা! সুন্দরী! অত রূপ তোমার, আর এত নিষ্ঠুর তুমি? তোমার রূপমোহে পড়িয়া আমি আমার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভুলিতেছি। আমায় কৃপা কর—"

গুলসানা মুহূর্ত্ত মধ্যে সরিয়া দাঁড়াইয়া, বক্ষঃস্থল হইতে এক শাণিত কাস্‌গারী ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল—"আমি পাঠান—মোগল নই। তোমার মতিভ্রম হইয়াছে। তুমি তোমার প্রভু আকবরসার ন্যস্তকর্ত্তব্য ভুলিয়াছ! কিন্তু আমার স্বামী, সোহানীর প্রতি আমার দায়িত্বময় কর্ত্তব্য, আমি ভুলি নাই। আবার অইরূপ কোন্ অসঙ্গত প্রস্তাব করিলে, তোমার অই বিশালায়ত বক্ষে, আমার এই তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা আমূল প্রোথিত হইবে।"

এত ঘৃণা! এত উপেক্ষা! এ বিদ্রূপময় উপেক্ষায়, রূপের মোহটা কমিয়া খুবই গেল। আত্ম-সম্মান ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আবার আমার প্রাণে প্রবল

হইল। ভাবিলাম, যার পতি-প্রেম এত গভীর, যে এত দর্পিতা, সে কখনও সহজে আমার অধীন হইতে পারে না। কিন্তু যদি আজ রাত্রে সোহানীকে বন্দী করিতে পারি, তাহা হইলে কাল প্রাতে এই গুলসানা সম্পূর্ণরূপে আমার ক্ষমতাধীন হইয়া পড়িবে।”

আমি তখনই সঙ্কেত-ধ্বনি করিলাম। বারান্দার সেনাগণ, উন্মুক্ত অসিহস্তে আমার কাছে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে দশ বারজন মোগল-সেনাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, গুলসানা অত্যন্ত দমিয়া গেল। কিন্তু এ সঙ্কট অবস্থাতেও, সে সাহস হারাইল না। শ্লেষ-জড়িত স্বরে বলিল,—“তুমি কি মনে ভাবিয়াছ, যে আমার স্বামী মদিরা-পানে উন্মত্ত ও বিহ্বল বলিয়া, তাহাকে এই সেনা সহায়তায় সহজে বন্দী করিতে পারিবে? না—না—তা কখনই পারিবে না। এ দেহে প্রাণ থাকিতে কখনই তাহা সম্ভব হইতে দিব না।”

আমি এবার সুযোগ পাইয়া বলিলাম—“সুন্দরী! পাঁচ শত মোগলসেনা এই দুর্গ বেষ্টন করিয়া আছে। পর্ব্বতের নিম্নে আরও পাঁচ শত যোদ্ধা অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কি ভীষণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বোধ হয় এইবার তাহা বুঝিতে পারিতেছ।”

এ কথা শুনিয়া, গুলসানার মুখখানি শবের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। তবুও সে উপস্থিত বুদ্ধি হারাইল না। সাহস সঞ্চয় করিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিল—“ইস্কান্দার খাঁ! যদি তাহাই হয়, আমার বৈধব্য যদি খোদার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে সাধ্য কি তাহাতে আমি বাধা দিতে পারি! কিন্তু তুমি সাহসী বীর। বাদসার সেনাপতি। যাহা ন্যায়নীতিসঙ্গত, তাহাই এ ক্ষেত্রে করিতে পার। এ ছার রমণী-জীবনের মূল্যই বা কি ইস্কান্দার সাহেব? কিন্তু মনে একবার ভাবিয়াছ কি, এ কাপুরুষোচিত বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যে তুমিই আজীবন কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ইস্কান্দার সাহেব! এই

মাত্র না তুমি আমার ছবি দেখিয়া বলিলে, যে আমার তস্‌বীর তুমি দিন-রাত বুকে লইয়া ফিরিতেছ! যদি একথা সত্য হয়, যদি আমার এ ছার রূপ দেখিয়া তুমি প্রকৃতই মোহিত হইয়া থাক, যদি আমি তোমার এতটা আরাধনার জিনিসই হই—তবে আজ রাত্রের মত, আমার একটি সামান্য অনুরোধ রাখ। আমার স্বামী এখন মদিরা পানে সংজ্ঞাহীন, বিহ্বল ও শক্তিশূন্য। আজ তুমি তাঁহাকে বন্দী করিও না। যখন তোমার সেনাগণ এ প্রাসাদের মধ্যে আসিয়াছে, আর আমার সেনারা এ অতর্কিত নৈশাক্রমণ সম্বন্ধে, কোন সংবাদই পায় নাই, তখন এ যাত্রা তোমারই বাজিজিৎ হইয়াছে। কাল প্রভাতে আমার স্বামীকে প্রকাশ্যযুদ্ধে পরাভূত করিয়া বন্দী করিও। ইহাতে তোমার বীরত্ব ও যশোগৌরব শতগুণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।"

আমি বলিলাম—"সুন্দরী! আমায় মার্জ্জনা কর। বাদসাহের নিমক খাইয়া, আমি এতটা বিশ্বাসঘাতক হইতে পারিব না। যাহা করিতে আসিয়াছি, আজ তাহা এই রাত্রেই সম্পন্ন করিব।"

গুলসানা এ কথায় বড়ই ভয় পাইল। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। আবার দেখিতে দেখিতে সেই রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরের, ভীতি-জনিত মৃদু কম্পন-ভাব বিদূরিত হইয়া, তাহাতে মধুর হাসির লহর উঠিল! সহসা কালো মেঘের বুকে দীপ্তিময়ী বিদ্যুৎ চমকিল।

গুলসানা গম্ভীরমুখে বলিল—"যে নিমকহারামী করিতে চায় না, পাঠান তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করে। আমি এতক্ষণ তোমার চিত্ত পরীক্ষা করিতেছিলাম। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি—আমার স্বামীর সুখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাল প্রভাতেই, এই দুর্গ-প্রাকারে পাঠানের জাতীয়-গৌরব সবুজ পতাকার পরিবর্ত্তে, আবার মোগলের রক্ত-পতাকা উড়িবে। ইস্কান্দার! তোমার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছি, তুমি একান্ত প্রভু-

ভক্ত ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ। আমি এখনও এই ক্ষুদ্র দুর্গের অধীশ্বরী, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাণী। বীর ইস্কান্দার! এ শক্তিহীনা অবলার একটী সামান্য অনুরোধ রক্ষা করাও কি তোমার পক্ষে অসম্ভব?"

এই কথা বলিয়াই সেই তেজদৃপ্তা, অতর্কিত অমঙ্গল ভীতিকাতরা পরম সৌন্দর্য্যময়ী গুলসানা, অতি দীননয়নে, আমার বস্ত্র-প্রান্ত চুম্বন করিয়া, কম্পিতস্বরে বলিল—"দাও ইস্কান্দার! একটি ভিক্ষা আমায় দাও। স্বামীকে রক্ষার জন্য, সতীরমণী সব করিতে পারে। আমি দর্প অভিমান, তেজ ভুলিয়া যোড় হস্তে তোমার নিকট একটী ভিক্ষা চাহিতেছি। এ দুর্গ তোমায় ছাড়িয়া দিব। রাজকোষে মণিমুক্তা, আসরফি, যাহা কিছু আছে—তাহাও তোমার হইবে। আমার একটী সেনাও তোমায় বাধা দিবে না, এক বিন্দু নর-শোণিত এ দুর্গভূমিতে পড়িবে না। আমি আমার সর্ব্বস্বধন স্বামীকে লইয়া—গোপনে এ দুর্গ হইতে ভিখারিণীর মত চলিয়া যাইব। ইস্কান্দার খাঁ! সম্রাট-সেনাপতি। বীরোচিত মহত্ব দেখাও। দুর্গ তোমায় দিলাম—আমায় স্বামী ফিরাইয়া দাও।"

আমি হর্ম্যতলোপবিষ্টা, সজলনেত্রা, স্পন্দিতহৃদয়া, গুলসানার হাত ধরিয়া তুলিতে গেলাম। সে যেন অঙ্গ-স্পর্শ-ভয়ে ভীতা, সচকিতা হইয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল! সেই গর্ব্ব-তেজঃ, প্রতিভা-মণ্ডিত, রক্তোৎপললাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য, আবার আমায় পাগল করিয়া তুলিল। আমি প্রবুদ্ধস্বরে বলিলাম,—"সুন্দরী! তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে গেলে, আমাকে নিজের জীবন আহুতি দিতে হইবে। বাদসাহ—সোহানীকে চান, তাঁর রাজ্য চান, আর তোমাকে চান। বল—এ ক্ষেত্রে আমি কিরূপে তোমার সহায়তা করিতে পারি? গুলসানা! তোমার এ প্রস্তাবে. সম্মতিদান সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

গুলসানা, তখনি ক্রুদ্ধ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল,—"স্থির জানিও

ইস্কান্দার! তোমার সম্রাট আকবর আমার মৃতদেহই পাইবেন। গুলসানা জীবিত অবস্থায়, তাঁহার রঙ্গমহলে কখনই প্রবেশ করিবে না। তীব্রবিষ, আমার সকল জ্বালার অবসান করিবে। ইস্কান্দার খাঁ! পাঠানকন্যা আত্ম-মর্য্যাদার মূল্য খুব জানে! যদি স্বামীর ও আমার জীবনের পণে, এ আত্ম-মর্য্যাদা কিনিতে হয়, তাহাও করিব। হাসিতে হাসিতে স্বামীর মুখে বিষ-পাত্র তুলিয়া দিব।"

মনে মনে আমি গুলসানাকে অনেক প্রশংসা করিলাম; বুঝিলাম, মোগল ও পাঠান এক উপাদানে নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু বৃথা সময় নষ্ট করায় আমার উদ্দেশ্য হানি হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি গম্ভীরমুখে বলিলাম,—"আমার কাজ আমি করিয়া যাইব, তাহার ফল যাহা হয় হোক্! দেখাইয়া দাও গুলসানা! তোমার স্বামী কোন কক্ষে?"

এ প্রশ্নে, গুলসানার রূপতরঙ্গায়িত দেহবল্লরী, থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই আয়ত ইন্দীবরনেত্র, অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। ক্রোধে নিরাশায় —সেই রক্তোৎফুল্ল কোমল ওষ্ঠাধর যেন মৃদু কাঁপিতে লাগিল। কি নিষ্ঠুর আমি! কেন আমি আমার জীবনের আরাধ্যদেবী, কামনারাজ্যের স্বপ্নময়ী অপ্সরাকে, নির্ম্মম দৈত্যের ন্যায় পীড়ন করিতেছি! মনে ভাবিলাম আকবর সাহের ক্রোধ-বহ্নিতে পড়িয়া জীবনাহুতি দিতে হয় হউক মান সম্ভ্রম রসাতলে যাউক—তবু গুলসানার মনে কোন কষ্ট দিব না।

জগতে নিজের সুখ কে না চায়! তসবীর দেখিয়া মনে মনে রূপের পূজা করিয়া যে গুলসানাকে আমি ভালবাসিয়াছি, তাহার অনুরোধে, একটা রাত্রি অপেক্ষা করিলে—ক্ষতিই বা কি? দুর্গ যখন আমার হাতে, আমার সেনারা যখন দুর্গমধ্যে—সোহানীরও যখন এই দুর্গমধ্য হইতে বাহির হইয়া সেনাসংগ্রহের বা পলায়নের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন কয়েক ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করায় ক্ষতিই বা কি? এই

উপকারের জন্য, গুলসানা কি একটুও কৃতজ্ঞ হইবে না? বন্দীরূপে আগরায় পৌছিলে, সোহানীর হয় প্রাণদণ্ড হইবে, না হয়, গোয়ালিয়রের প্রস্তরদুর্গে রাজ-বন্দীদের চিরান্ধকারময় কারা-কক্ষ তাহার চিরনিবাস হইবে। তখন—এই স্বর্গের সুন্দরী গুলসানা আমার! সম্রাটের নিকট পুরস্কার-রূপে, তখন এই গুলসানা-রত্ন প্রার্থনা করিব।

ভবিষ্যৎ দুরাশায় উৎফুল্ল হইয়া, আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। ঘটনাচক্রে পড়িয়া গুলসানা আমারই হইবে, আশার এ অপূর্ব্ব ছলনা, আমি অতিক্রম করিতে পারিলাম না। উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বলিলাম—"তাহা হইলে তুমি, এখন কি চাও—গুলসানা?"

গুলসানা তখন পূর্ণরূপে অবগুণ্ঠনবিমুক্তা। সে ছলছল নেত্রে কম্পিত-স্বরে বলিল—"একটী সামান্য ভিক্ষা! আমার স্বামীর দেহে পাঠানের উষ্ণ শোণিত-স্রোত প্রবাহিত। যে বীর, বাহুবলে আকবরসার ন্যায় প্রতাপশালী বাদসাহের হস্ত হইতে ইদলদুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে,—নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে যে মদিরাবিহ্বল অবস্থায়, ঘৃণিতভাবে বাদসাহের বন্দী হইবে, ইহা তাহার পত্নীর ইচ্ছা নহে। আকবর সাহ ভাবিবেন, লোকে ভাবিবে, সোহানী বীর নহে, বিলাসের ক্রীতদাস। ইস্কান্দার সাহেব! এ অবস্থায় যদি আমার স্বামীকে বন্দী কর, এ কলঙ্ক তাঁহার জীবনে-মরণেও মুছিবে না। আমার কাতর প্রার্থনা, সবিনয় অনুরোধ, রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত তুমি এ স্থানে অপেক্ষা কর।"

আমার মনে তখন—দারুণ দুরাশা। এই দুরাশা আমার কাণে কাণে মিষ্ট ভাষায় বলিতেছিল—"ভয় কি! ইস্কান্দার! গুলসানার কথা শোন। এ অনিন্দ্য রূপজ্যোতিঃমণ্ডিতা, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা গুলসানা, তোমারই হইবে। যখন দুর্গজয় করিয়াছ, সোহানীকে জীবিতাবস্থায় হস্তগত করিয়াছ, তখন মানসম্ভ্রম, যশপ্রতিষ্ঠা, সবই তোমার। শুনিয়াছ ত, সুন্দরী

বীরভোগ্যা তুমি বীর এজন্য এ সুন্দরী গুলসানা, তোমার। আশার ছলনায়, যে সুখচিত্র মনে মনে আঁকিয়াছ, তাহা যদি প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করিতে চাও, তোমার জীবনের, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে চাও, তাহা হইলে গুলসানার কথায় এখনিই সম্মত হও।

আমি অনন্যোপায় হইয়া বলিলাম—"গুলসানা! গুলসানা! আর তোমার এ কাতরভাব দেখিতে পারি না। যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।"

গুলসানা হৃষ্টচিত্তে বলিল—"ইস্কান্দার সাহেব! খোদা তোমার মঙ্গল করুন। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে গুলসানাও তোমার জন্য এইরূপ উদার আত্মত্যাগে কুণ্ঠিত হইবে না।"

আমি এ কথায় যথেষ্ট আশান্বিত হইলাম। কৃতোপকারের জন্য উপকৃত ব্যক্তির মনে একটা শ্রদ্ধা আসে, ভালবাসা আসে, স্নেহ আসে, ভক্তি আসে। গুলসানা যদি পাষাণী না হয়, অকৃতজ্ঞ না হয়—তাহা হইলে একদিন আমি নিশ্চয়ই এর প্রতিদান পাইব। যে উপায়েই হউক, গুলসানাকে আমি চাই।

অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, ভাবী সুখাশায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া, আকস্মিক আগ্রহ ও ব্যাকুলতাবশে আমি বলিলাম—"তাহাই হইবে। গুলসানা আজ রাত্রে আমি তোমার স্বামীকে কোনরূপে ত্যক্ত করিব না। কিন্তু রজনী প্রভাতে, বিনা গোলযোগে, তোমাদের উভয়কেই আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পদোচিত সম্ভ্রমের সহিত আমি তোমাদের দুইজনকেই আগ্রায় লইয়া যাইব। বাদসাহকে বলিয়া, সাধ্যমতে তোমাদের মুক্তির চেষ্টা করিব। সোহানী সাহেব, সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলে, হয়ত এ দুর্গও আবার ফিরিয়া পাইতে পারেন।"

গুলসানা, তাহার সেই চম্পকরাগলাঞ্ছিত, মৃণালগঞ্জিত, বাহুযুগ ঊর্দ্ধে

তুলিয়া প্রফুল্লমুখে বলিল—"আল্লা তোমার মহত্বের পুরস্কার করিবেন। শত্রুরূপে আসিলেও, আজ তুমি আমাদের অতিথি। নানা কথায় আমার অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত সোহানী সাহেব তাঁহার শেষ সেরাজী পাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহার জন্য সেরাজি লইতেই এখানে আসিয়াছিলাম। আমি এখনি আসিতেছি—তুমি এই স্থানে একটু অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া গুলসানা, ত্বরিত-গতিতে সম্মুখস্থ একটী সুন্দর কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিল। কক্ষমধ্যস্থ বর্ত্তিকাগুলি জালিয়া দিল। দেখিলাম—কক্ষটী বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত। গৃহভিত্তির চারিদিকে দর্পণ। দর্পণের আশেপাশে স্ফাটিকাধারে অসংখ্য চক্ষুলোজ্জ্বল আলোক-রাশি। লোবান ও গুলাবের মিশ্রগন্ধে, সে কক্ষটী সুগন্ধিত ও আকুলিত। হস্তেঙ্গিতে একখানি সোফা দেখাইয়া দিয়া, গুলসানা বলিল—"সেনাপতি সাহেব! এই কক্ষে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি ফিরিয়া আসিতেছি।"

গুলসানা চলিয়া গেল। মৃদুপবনদোলায়িত বাসন্তী লতিকার ন্যায়, ক্ষীণ দেহখানি দোলাইয়া, চারিদিকে রূপের তরঙ্গ ছড়াইয়া, মদগর্ব্বিতা মরালীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া, সে চলিয়া গেল। রাখিয়া গেল— কেবল রূপের মোহ আর দীপ্তি। সুর চলিয়া গেল, রহিল কেবল ঝঙ্কার। প্রেম চলিয়া গেল, রহিল কেবল স্মৃতি।

সমুজ্জ্বল রূপ-প্রভা, যাহার চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার হিতাহিত বিচারজ্ঞান বড় একটা থাকে না। একবার মনে ভাবিলাম, "কি আশ্চর্য্য! আমি ত ইহাদের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছি। আমারই চেষ্টায় কাল ইহারা পথের ভিখারী হইবে। তবু এত যত্ন, এত উদার ব্যবহার! সত্যই কি গুলসানার প্রাণ এত উন্নত? সত্যই কি সে সর্ব্বনাশকারী শত্রুকেও, মিত্রজ্ঞানে এত সমাদর করে? তাহা হইতেই

পারে না। আমার বোধ হয়—এ আতিথ্য-প্রবৃত্তি, এ সৌজন্যতা, হয়ত ছলনাময়! অতি কূটচক্রপূর্ণ। উপযুক্ত অবসরে, সোহানীর সহিত পরামর্শ করিয়া, সে হয়ত আমাকে খাঁ জাহান্দারের মত বিপদে ফেলিতে পারে!”

সহসা আমার কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। গুলসানা, মনমোহিনী মূর্ত্তিতে পুনরায় দেখা দিল। তাহার মুখ উদ্বেগ-শূন্য, ও হাস্যরেখাঙ্কিত। সে সহাস্যমুখে বলিল—“আমার স্বামীকে তোমার আগমন সংবাদ দিয়াছি। তুমি আমাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাতে তাঁহার সামান্য অমত থাকিলেও, আশা করি, কাল প্রভাতে তাঁহাকে এ বিষয়ে সম্মত করিতে পারিব। আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিলেই, অগত্যা তিনি সম্মত হইবেন। তার পর ভবিষ্যতে যাহা ঘটে ঘটুক। তাঁহারই আদেশে আমি অতিথি-সৎকার করিতে আসিয়াছি।”

গুলসানা এতটা সরলভাবে এ কথাগুলি বলিল—যে আমি তাহাতে কোনরূপ সন্দেহের গন্ধমাত্র পাইলাম না। তবুও আমি রহস্য-ছলে বলিলাম—“গুলাসানা! যে তোমার শত্রু, যে তোমার স্বামীর শত্রু, যে তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে, তাহয়ে প্রতি এতটা করুণা—এত সমাদর কেন গুলসানা?”

গুলসানা, সেই সুরমা-রেখাঙ্কিত, নলিননেত্রপ্রান্তে, একটী উজ্জ্বল কটাক্ষ হানিয়া, সেই স্ফুরিতাধর, মৃদুহাস্যে আলোকিত করিয়া বলিল,—“মনে ভাবিও না—খাঁ সাহেব! আমি স্বার্থ-গন্ধবিরহিত হইয়া, তোমার প্রতি এতটা সম্মান দেখাইতেছি! আকবর-সাহ যখন শুনিবেন, তাঁহার উপযুক্ত সেনাপতিকে, দুর্গাধিপের পত্নী গুলসানা মিত্রভাবে সেবা করিয়াছে, তখন হয়ত তিনি আমার স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুনরায় এ রাজ্যের অধিকার ফিরিয়া দিতে পারেন।”

ধরিতে গেলে, গুলসানার এ যুক্তি একাবারে ভিত্তিশূন্য নহে। তাহার কথায় বুঝিলাম, বিনা স্বার্থে সে প্রাণের উদারতা ও হৃদয়ের মহত্ব দেখাইতে আসে নাই। আমায় একান্তে চিন্তামগ্ন দেখিয়া গুলসানা বলিল,—"কি ভাবিতেছ খাঁ সাহেব? তুমি বোধ হয় ভাবিতেছ—হয়ত আমি কোন কু-উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, তোমার ন্যায় শত্রুকে আদর যত্ন করিতেছি। তা নয়, সাহেব! তা নয়। আমার মনে কোন কু-মতলবই নাই। পাঁচশত সেনা লইয়া তুমি এই দুর্গ বেষ্টন করিয়াছ—আর আমাদের হইয়া একটীও সিপাহি, সঙ্গীন ধরিবার জন্য এ স্থানে নাই। সবই দুর্গের বাহিরের ছাউনীতে। তাহার উপর—সোহানী সাহেবও মদিরাপানে উপস্থিত কর্ত্তব্য-বিহীন। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার কল্পনা, একেবারে ভিত্তিহীন। আজ যদি স্বামীর জন্মদিনের উৎসব উপলক্ষে, আমার সেনাগণকে দুর্গত্যাগ করিতে অনুমতি না দিতাম, যদি পঞ্চাশৎ পাঠান-যোদ্ধাও এই দুর্গে বা আসে পাশে থাকিত, তাহা হইলে তোমামোদের পরিবর্ত্তে, এই গুলসানা, তোমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া, দুর্গের বাহির করিয়া দিত। আমরা এখন নিতান্ত শক্তিহীন অবস্থায় পড়িয়াছি। এ অবস্থায়, তোমায় সন্তুষ্ট রাখা ভিন্ন, আর কোন উপায় নাই।"

আমাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া গুলসানা সহাস্যমুখে বলিল—"একটু অপেক্ষা করুন সাহেব! আমি আপনার জন্য খানা ও সিরাজী লইয়া এখনিই আসিতেছি।"

যাদুকর-সৃজিত, এক মোহময়ী মায়া-প্রতিমার ন্যায়, যেন কোন মন্ত্র-বলে, গুলসানা সে স্থান হইতে চকিতে অদৃশ্য হইল। ইত্যবসরে আমি সেই কক্ষটীর চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। কৌচ-সোফা, কেদারা প্রভৃতি আরাম আসনে, সেই প্রস্তরময় কক্ষ সুসজ্জিত। কোন স্থানে—সুর-বাঁধা সেতার, এসরার, বীণ্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র, সুরে ভরা

হইয়া, যন্ত্রীর অপেক্ষায় ভিত্তি-গাত্রে বিলম্বিত। কোথাও বা রাশি রাশি শুভ্র সুগন্ধি পুষ্পস্তবক, স্বর্ণ ও রৌপ্যাধারে নানাস্থানে সযত্নে রক্ষিত। প্রসূন-রাশির মনোমদ সুবাসে, সেই কক্ষ যেন নন্দনের সুরভিপূর্ণ। কক্ষটীর ঠিক মধ্যস্থলে, একটী ক্ষুদ্র রৌপ্যময় ফোয়ারা হইতে গোলাপ-জলের মধুগন্ধময় স্রোত উৎসারিত হইয়া, নিম্নস্থ একটী বিস্তৃত মর্ম্মরাধারে পড়িয়া, সেই কক্ষমধ্যে সদ্যপ্রস্ফুটিত গুলাবের সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে।

গুলসানা আবার রূপের প্রখর দীপ্তি লইয়া সেই সজ্জাপূর্ণ কক্ষে ফিরিয়া আসিল। এবার সে একা নহে। আবার সঙ্গে দুই জন বাঁদি। একজন বিচিত্র স্বর্ণপাত্রে উপাদেয় আহারাদি আনিয়াছে। আর একজন, রৌপ্য-ভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া, শীতল বারি ও পরিচ্ছদ লইয়া আসিয়াছে।

গুলসানা রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরে, মৃদু হাস্যের লহর তুলিয়া বলিল—"সাহেব আমাদের পাঠান-জাতির নিয়মই এই, আমরা অতিথিকে সম্মানের চিহ্ন-স্বরূপ পরিচ্ছদ, আহার্য্য ও সুবাসিত পেয় দিয়া থাকি। আশা করি, আপনি আমাদের এ নিয়মপালনে সহায়তা করিবেন।"

গুলসানা দূরে ছিল, এবার একটু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অতিশয় আত্মীয়তা দেখাইয়া, সে স্বহস্তে আমার শিরস্ত্রাণ নামাইয়া লইল। তাহার চম্পকলাঞ্ছিত কোমলাঙ্গুলি সহায়তায়, আমার কুর্ত্তির বোদামগুলি খুলিতে লাগিল। সে বিদ্যুৎময় স্পর্শে, আমার শিরায় শিরায় অনলপ্রবাহ ছুটিল। তাহার বাঁদীদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া, আমার তরবারি ও বক্ষ-নিহিত বক্রমুখ ছোরাখানি পর্য্যন্ত খুলিয়া লইয়া, আমার পার্শ্ববর্ত্তী এক মখমলমণ্ডিত সোফার উপর রাখিল। ইহাতে আমি বাধা দিতে পারিলাম না। কেন না, আমি সেই পুষ্পকোমলস্পর্শে কম্পিত, অধীর ও আত্মহারা! এতটা অনুগ্রহ, এতটা করুণা, যাহার নিকট পাইলাম, তাহার কাজে কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেও আমার সাহস হইল না।

বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া, গুলসানা হাস্যমুখে এক বারি-পূর্ণ রৌপ্যভৃঙ্গার আমার হস্তে দিয়া বলিল—"অই পাথর-বাঁধান ফোয়ারার নিকট মুখাদি প্রক্ষালন করুন।" মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি তাহার আদেশপালন করিলাম।

নিকটস্থ একটী সুখময় আসনে উপবিষ্ট হইলাম। গুলসানা রৌপ্য ও স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত, নানাবিধ পোলাও, কাবাব, রুটী, কোর্ম্মা ও পিষ্টকাদি আমার সম্মুখে ধরিয়া দিল। আনার, কমলা এবং আঙ্গুরের মিঠা ও গুলাব বাসিত সরবতেরও কোন অভাব রহিল না। গুলসানা, যখন যে দ্রব্যের আদেশ করিতে লাগিল, বাঁদিরা তখনি তাহা আমার সম্মুখে ধরিয়া দিতে লাগিল। আমি গুলসানার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সকল জিনিষেরই কিছু কিছু খাইলাম। স্বর্ণপাত্রে মদিরা ভরিয়া গুলসানা আমায় বলিল—"আঙ্গুরক্ষেত্র লইয়াই আমাদের আফ্‌গানিস্থান। আমাদের দেশে অতিথিকে আঙ্গুরের সুমিষ্ট রস পান করিতে দিয়া, আমরা প্রথম অভ্যর্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু হিন্দুস্থান, আফ্‌গানিস্থান নহে বলিয়া, আপনার জন্য উৎকৃষ্ট বসোরাই সেরাজি আনিয়াছি। আপনি যে আমাদের শত্রু নহেন, ইহা বুঝাইবার জন্য, মৎপ্রদত্ত এই সেরাজি পান করুন।"

আমার মনে এক একবার সন্দেহ হইতে লাগিল, সেরাজীর মধ্যে কোন বিষ মিশ্রিত নাই ত? কেননা আমায় পরলোকের পথিক করিতে পারিলে, গুলসানার কোন ভয়ই থাকিবে না। তাহার স্বামী নিরাপদ, রাজ্য বিপন্মুক্ত, সেও বিনা রুধিরপাতে জয়গর্ব্বে গরীয়সী হইবে!

গুলসানা, আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিল—"খাঁ সাহেব! মনে ভাবিও না—আমি তোমার সেরাজীর সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়াছি। এতটা নীচকাজ, পাঠান-কন্যা কখনই করিতে পারে না। নিজের জীবন

বিপন্ন করিয়া, পাঠান অতিথিকে রক্ষা করিয়াছে, এ উদাহরণও ইতিহাসে দুর্লভ নহে!"

আমি গুলসানার এ তীব্রতিরস্কারে, বড়ই অপ্রতিভ হইলাম। তাহার মত চতুরা স্ত্রীলোকের নিকট এরূপ একটা চিত্ত-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করা ঠিক যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া আমি, বলিলাম "গুলসানা!—সেরাজী দাও।"

গুলাব-বাসিত, সুগন্ধি, সুমিষ্ট, রক্তবর্ণ সেরাজীতে স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করিয়া, গুলসানা বলিল—'খাঁ সাহেব! আমার স্বামীর আদেশ, আজ আমি পূর্ণ এক ঘণ্টার জন্য আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকি। আমি সুন্দররূপে বীণা বাদন করিতে পারি! যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে যথাসাধ্য চেষ্টায় আপনার চিত্তবিনোদন করি।"

আমি হৃষ্টচিত্তে সেরাজী পাত্র শেষ করিলাম। গুলসানার মত সুন্দরীর সুচারুকরস্পর্শে সেই সুবাসিত বসোরাই সেরাজী, যেন অতি মাত্রায় সুগন্ধপূর্ণ। আমার প্রাণের চারিধার ঘিরিয়া, যেন বসন্তের সুবাস বহিতে লাগিল। আমার নিঃশ্বাসে সুগন্ধ, অন্তরে সুগন্ধ, বাহিরে সুগন্ধ। আমি সাগ্রহে, গুলসানার হাতদুখানি ধরিয়া, কাতরভাবে বলিলাম—"গুলসানা! একটী গান গাও। তোমার বীণানিন্দিত স্বরে, সহস্র বীণার সুমিষ্ট ঝঙ্কার জাগিয়া উঠিবে।"

গুলসানা আমার চিত্তরঞ্জনের জন্য একটা গান ধরিল। সুর-রাগ, মূর্চ্ছনা কম্পন, যেন প্রীতিভরা সুপ্ত-মাধুরী কণ্ঠলগ্ন হইয়া, সেই ক্ষুদ্র কক্ষে, এক অপ্সর-কাননের সৃষ্টি করিল। আমার প্রাণ যেন দুঃখ-জ্বালাময়ী মেদিনীর কলুষিত রাজ্য ছাড়িয়া, বেহেস্তে উপনীত হইল। আমি মনে মনে বলিলাম—"অয়ি! শোভাসম্পদময়ি মেদিনি! আজ তোমাতে এত সৌন্দর্য্য বিকাশ কেন মা? রজতধারাময়ী জ্যোৎস্না! আজ

তোমাতে এত মধুরতা মাখা কেন? পুষ্পবাসবাসিত মৃদুপ্রবাহিত মলয়, আজ তোমার স্পর্শ, এত শীতল কেন?"

ইতিপূর্ব্বেই, আমি গুলসানার অনুরোধে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। আমার সৈনিকের-পোষাক-পরিচ্ছদ, তরবারি, আঙ্গরাখা, উষ্ণীষ সবই পার্শ্ববর্ত্তী এক সোফার উপর রক্ষা করিয়াছি। গুলসানা তাহার স্বামীর ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত একটী নূতন পরিচ্ছদ আমায় পরিতে দিয়াছিল। আমি তখন সেইটিই পরিয়াছি।

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা গুলসানা, স্বর্ণ-ভৃঙ্গার হইতে সেরাজী ঢালিয়া, সহাস্যমুখে আবার আমার সম্মুখে ধরিল। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে, সেই পাত্র শেষ করিলাম। আমার চিত্ত এক অজানিত সুখে পুলকিত হইল। প্রাণে একটা অধীরতার মদিরামাখা উল্লাসময় আকাঙ্খা ও তৎসঙ্গে সুপ্ত-প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। সেই স্বপ্নাতীত সৌন্দর্য্যশালিনী, স্বর্ণপ্রতিমা গুলসানা, যেন আমার নেত্রসম্মুখে আরও সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াছে। তাহা দেখিয়া জাগ্রতাবস্থাতেই আমি এক মোহময় স্বপ্নাবেশে অধীর হইয়া পড়িলাম। আমার চেতনা আছে, কিন্তু তাহার ক্রিয়া নাই। আমার প্রাণ আছে, কিন্তু সে প্রাণে কিসে যেন একটা জড়তা আনিয়া দিয়াছে। আমার মন যেন নিজের বশে নাই।

গুলসানা আমার বিমুগ্ধভাব দেখিয়া বোধ হয় বুঝিল, কর্ত্তব্য-পরায়ণ পবিত্র অসিব্রতধারী বীরপুরুষ—সুন্দরী ও সেরাজীতে মজিয়া, কতটা অপদার্থ হইতে পারে! সে দেখিল, মানুষের মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভু-ভক্তি, চরিত্রবল, রূপবহ্নির প্রচণ্ড অনলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। গুলসানা সহাস্যমুখে বলিল—"আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছ ইস্কান্দার সাহেব?"

আমি আবেগময় কণ্ঠে বলিলাম—"কি দেখিতেছি! কি দেখিতেছি!

দেখিতেছি, তোমার ঐ বিচিত্র সৌন্দর্য্যমাখা রূপরাশি! যে রূপের তুলনা নাই, দ্বিতীয় নাই, প্রতিদ্বন্দীমাত্র নাই। দেখিতেছি,—বিধাতা রমণী সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা, তোমাতে দেখাইয়াছেন। কত সুন্দর শিল্পী যে সেই চিরসুন্দর বিধাতা, তাহার পরিচয় তিনি যেন তোমার প্রত্যেক অঙ্গেই দিয়াছেন।

গুলসানা ফুল্লাধরে হাসির লহর তুলিয়া বলিল—"সত্যই কি আমি এত সুন্দরী সাহেব? যে কলঙ্কহীন উজ্জ্বল দর্পণে আমি নিত্য মুখ দেখি, সে দর্পণ ত আমাকে একথা বলে না। যে স্বামী, নির্ণিমেষনয়নে, নিত্য আমার দিকে চাহিয়া থাকেন, তিনিও ত একথা বলেন না। ছার এ রূপ! এর শক্তিতে তুমি এত অধীর! বল—ইস্কান্দার! কি করিলে, তোমার চিত্তের তৃপ্তি হয়! আবার একটা গান গাহিব—শুনিবে?"

গুলসানা এবার তাহার সুর-বাঁধা এস্‌রারটী তুলিয়া লইয়া, চম্পকাঙ্গুলিস্পর্শে তাহাতে এক মোহময় ঝঙ্কার তুলিল। রাগ-মূর্চ্ছনা ও আলাপের অন্তরঙ্গতায়, সেই সুবাসিত কক্ষ, যেন কোন স্বর্গবাসিনী অপ্সরার সুর-মাধুরীতে পূর্ণ হইল! মলয়-বাহনে, সেই প্রাণময়ী সুর, নৈশপ্রকৃতির নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা সজীবতা সৃষ্টি করিল।

সহসা সেই সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইল। আমি পথহারা হইয়া এক অবাস্তব, অপার্থিব, অদৃশ্য স্বপ্নরাজ্যে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ঘুরিতে লাগিলাম। সেরাজির নেশা তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। প্রাণে সুখ, নয়নে সুখ, হৃদয়ে সুখ, শ্রবণে সুখ। বাহ্যে, অন্তরে, ঊর্দ্ধে, অধে, সর্ব্বত্রই যেন তৃপ্তির লহর লীলা। মনে ভাবিলাম—কর্ত্তব্য উচ্ছন্ন যা'ক্, প্রভুভক্তি দূরে যা'ক, মান-সম্ভ্রম, জাহান্নমে যা'ক, এই স্বর্গের হুরী গুলসানার কাছে কিছুই কিছু নয়।"

গুলসানা আমার এই আবেগময় ভাব দেখিয়া বলিল—"ইস্কান্দার!

আমায় কিয়ৎক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দেও, আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইব।”

গুলসানা বিদ্যুৎগতিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহার পায়ে ধরিয়া বলি, “যাইও না—গুলসানা! সপ্তম স্বর্গের সর্ব্বোচ্চস্তরে তুলিয়া, পাষাণীর মত পদাঘাতে আমায় বিদূরিত করিও না।” কিন্তু তত্টা সাহস হইল না। আমি এক মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

ঠিক নিদ্রা নয়—তন্দ্রা। কারণ, তখনও আমার পূর্ণ চেতনা বিলুপ্ত হয় নাই। স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, যেন বেহেস্তের এক উজ্জলিত কক্ষে, আমি হুরীদের মধ্যে সুখাসনে উপবিষ্ট। সেই কক্ষটী দীপ্তিময় লোহিতা-লোকে প্রতিভাসিত। গন্ধভরা নানাবর্ণের বিচিত্র পুষ্পস্তবক, আমার চারিদিকে—থরে থরে সাজান। বীণার সঙ্গে—মূরজ্, সপ্তস্বরা, এস্‌রার, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার তুলিয়া, হুরীরা গান করিতেছে। তাহা-দের মধ্যে যে প্রধানা, যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, সে যেন আমাকে স্বর্ণপাত্র ভরিয়া সেরাজি দিতে আসিল। কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া দেখিলাম—সে হুরী নয়, গুলসানা। তবে কি গুলসানা পরী! তবে কি সে এ মররাজ্যের নয়! তবে কি সে নিত্যালোকিত, চিরানন্দপূর্ণ, চির সমুজ্জ্বল, সেই বেহেস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

আমি আবেগ-ভরে, সেই স্বপ্নদৃষ্টা গুলসানাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, হস্ত-প্রসারণ করিলাম। আমার এ ধৃষ্টতা দেখিয়া সে যেন অতি রুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার সদা প্রফুল্ল সরল হাস্যময় মুখে, বিরক্তি ভাব ফুটিয়া উঠিল। হাসির পরিবর্ত্তে, ভীষণ ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া গুলসানা বলিল—“নরাধম! কর্ত্তব্য ভুলিয়া, ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, পরস্ত্রীর উপর কাম-লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছ? ছি! ছি! জান এ

বেহেস্ত। নরকান্ধকার কলুষিত পৃথিবী এ নয়! যাও—এখানে তোমার স্থান হইবে না। পাঁচ জুতি—তোমার এ নীচত্বের পুরস্কার!" এই কথা বলিয়াই, সেই রোষপ্রদীপ্তা গুলসানা, পদাঘাতে আমাকে যেন নীচে ফেলিয়া দিল! আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—"গুলসানা! গুলসানা!" কেহই উত্তর দিল না। আমার অদ্ভুত স্বপ্নময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধকার! আমার চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার! সেই অন্ধকারে স্পর্শ-শক্তির দ্বারা, কক্ষের দ্বারান্বেষণ করিলাম। কিন্তু নির্গমন পথ খুঁজিয়া পাইলাম না।

কে আমাকে এ কক্ষে এরূপ ভাবে আবদ্ধ করিল! গুলসানা? না না—অসম্ভব। নিশ্চয়ই গুলসানা আমায় নিদ্রিত দেখিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গিয়াছে। আমি সভয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম "গুলসানা! গুলসানা!"

সহসা বাহির হইতে রুক্ষ-স্বরে কে যেন বলিল—"বন্দী! কেন গুলসানার জন্য ব্যস্ত হইতেছে? সে এতক্ষণে আকবর বাদসাহের কিঙ্করীরূপে আগরার রঙ্গমহলে প্রেরিত হইয়াছে। কাল সকালে তোমাকেও বন্দীভাবে আগরায় যাইতে হইবে। দর্পিত সোহানী! তোমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে।"

এ ভাবের কথা শুনিয়া আমি প্রমাদ গণিলাম। প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিল না। কি সর্ব্বনাশ! চতুরা গুলসানা, আমায় কৌশলক্রমে বন্দী করিয়া, আমারই সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। হায়! রমণীর রূপ! হায় রে! মুগ্ধ পুরুষের রূপোন্মাদ ব্যাধি। কি নির্ব্বোধ আমি, যে গুলসানার মত সুচতুরা রমণীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম! কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম—বাহির হইতে যে প্রহরী আমার সহিত কথা কহিয়াছিল, তাহার নাম জাফর আলি। সে আমারই অধীনস্থ একজন সেনানী।

আমি ধীরস্বরে বলিলাম, "জাফর আলি! কি আশ্চর্য্য! তুমি আমায়

চিনিতে পারিতেছ না! দ্বার খুলিয়া দাও! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সোহানী পলাইয়াছে! আমি এখানে বন্দী।”

কেই বা আবার আমার কথা শোনে! কত ডাকিলাম, কত চীৎকার করিলাম, কেহই দ্বার খুলিতে আসিল না। কেবলমাত্র সেই কক্ষমধ্যস্থ প্রতিধ্বনি, আমার কথাগুলি মায় সুদ ফিরাইয়া দিয়া—আমাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। আমি প্রভাতাপেক্ষায় রহিলাম।

পরদিন প্রভাতে, দ্বারের বাহির হইতে, জাফর আলি আমায় বলিল “সোহানী সাহেব! আমাদের সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁর আদেশ এখনই তোমাকে আগরা যাত্রা করিতে হইবে। প্রস্তুত হও।”

আমি প্রমাদ গণিলাম। ক্রুদ্ধভাবে বলিলাম, “জাফর! তুমি পাগল হইলে নাকি?”

জাফর আলি বলিল—“আমি নয়, তবে তুমি বটে! যে ভবিষ্যৎ জ্ঞানহীন ব্যক্তি, আকবর সাহেব মত শক্তিশালী সম্রাটের ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করে, জানিনা, তাহার ধৃষ্টতার সীমা কোথায়! আমাদের সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁ, কৌশলে তোমায় বন্দী করিয়াছেন। আমরা কেবল তাহার আদেশাপেক্ষায় এখানে আছি। তিনি আসিলেই তোমায় চালান দিব।”

ক্রোধে আমার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, “নচ্ছার জাফর! কাল কি ভাঙ্গ খাইয়াছিলি? আমিই ত ইস্কান্দার খাঁ!”

জাফর বিদ্রূপের স্বরে বলিল—“সেই জন্যই ত জনাবালি আমরা তোমাকে সম্মান করিতে আসিয়াছি! সোহানী! মনে ভাবিও না উন্মত্ততার ভাণ করিয়া তুমি পরিত্রাণ পাইবে।”

আমার আর সহ্য হইল না! জানালার নিকট আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিলাম—“জাফর আলি! আমি তোমার প্রভু ইস্কান্দার খাঁ। শত্রুর

কৌশলে এই কক্ষ মধ্যে আমি বন্দী হইয়াছি। সোহানী পালাইয়াছে। মহা বিপদ আমাদের সম্মুখে! শীঘ্র দ্বার খোল।”

একথা শুনিয়া জাফর সত্য সত্যই দ্বার খুলিয়া ফেলিল। তাহার হস্তে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা! আমাকে কক্ষ মধ্যে দেখিয়াই, সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। করযোড়ে বলিল—“একি জনাব! আপনি এখানে—এ ভাবে! এ পরিচ্ছদে! আপনি ত শেষরাত্রে দুর্গের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন।”

আমি তখন বুঝিলাম—ব্যাপারটা কি। গুলসানা আমাকে সেরাজিতে অজ্ঞান করিয়া চতুরতা প্রকাশে, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সে আগ্রহের সহিত, কেন যে আমার পরিচ্ছদগুলি কৌশলে অঙ্গচ্যুত করিয়া লইয়াছিল—তাহার কারণও এখন বুঝিলাম। আমার পরিত্যক্ত সৈনিকের পোষাক, তাহার স্বামীকে সাজাইয়া, সে সোহানীকে অতি সহজেই প্রাসাদের বাহির করিয়া দিয়াছে। আর আমার সেনারা সেই পরিচ্ছদ দেখিয়াই তাহাকে ইস্কান্দার ভাবিয়াই পথ ছাড়িয়া দিয়াছে! এইবার সেই মোগলপ্রণিধি রহমত খাঁর কথা আমার মনে পড়িল।

মদিরার সহিত নিশ্চয়ই কোন তীব্র মাদক মিশান ছিল। তাহা না হইলে আমি অতশীঘ্র অজ্ঞান হইয়া পড়িব কেন? ইস্কান্দার-বেশী সোহানী, নিশ্চয়ই কোন গুপ্তদ্বার দিয়া আসিয়া, আমাকে এইভাবে এই কক্ষে আবদ্ধ করিয়া যাইবার সময়, হয়ত সে জাফর আলিকে বলিয়া গিয়াছিল—“গৃহমধ্যে সোহানী বন্দী অবস্থায় রহিল। কাল প্রভাতে আমি সরাইখানা হইতে আসিয়া, এ সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য করিব। ইহাকে প্রভাতে সরাই থানায় হাজির করিও।”

এই জন্যই জাফর—সোহানী জ্ঞানে, আমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছিল। আমার ও সোহানীর মধ্যে আকৃতির সাদৃশ্য যে যথেষ্ট, এ কথা পাঠক প্রথমেই শুনিয়াছেন। জাফরের মত একজন সুদক্ষ সৈনিক যে আমার

পূর্ণ সাদৃশ্যময় অপরমূর্ত্তি দেখিয়া প্রতারিত হইবে, তাহা কিছু আশ্চার্য্যের কথা নহে। জাফরকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়—সে আমার অনুমান সঙ্গত সকল কথারই সমর্থন করিল।

সত্যই আমি ভ্রান্ত! ঘোর মূর্খ! ছার রমণীরূপে মুগ্ধ হইয়া, আমি নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। জানি না, কি করিয়া বাদসাহকে এ সব কথা বলিব! এই ঘোর মূর্খতার কথা শুনিলে, তিনি হয়তো আমাকে আজীবন কারাগারে রাখিতে পারেন কিম্বা প্রাণদণ্ডাদেশ দিতেও পারেন। হায় রে! সুন্দরী রমণীর রূপ! এই ছার রূপের উপাসক হইয়াই ত এখন আমার এ জীবন বিপন্ন। শোচনীয় মৃত্যুভয়ে আমি কাতর।

আমি তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলাম। একজন সৈনিক সরাইখানা হইতে আমার জন্য একটা নূতন পোষাক আনিল। আমি জাফরকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদমধ্যস্থ কক্ষগুলি বেশ তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলাম। কেহই কোন কক্ষে নাই। সোহানী নাই—গুলসানা নাই—কেহই নাই। দেহ আছে—প্রাণ নাই, পিঞ্জর আছে—পক্ষী নাই। উত্তেজনায়—নিরাশায়, দারুণ মর্ম্মবেদনায়, আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "গুলসানা! সর্ব্বনাশি! কেন তুই ছলনায় মজাইয়া, আমার এ সর্ব্বনাশ করিলি?" নির্জ্জন কক্ষ হইতে তখনি তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়া আমার যেন বিদ্রূপ করিল—"গুলসানা! সর্ব্বনাশি! কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করিলি?"

নবম পরিচ্ছেদ।

আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া নিরাশ হৃদয়ে, ম্লানমুখে, রক্ষীগণের সহিত সরাইখানায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে একখণ্ড লোহিতবর্ণের কাগজ আমার চক্ষে পড়িল। আমি সাগ্রহে কক্ষতল হইতে তাহা উঠাইয়া লইয়া পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে—

যে সামান্ত তসবীর দেখিয়া রমণীর রূপ-মোহে উন্মত্ত হয়, তাহার শোচনীয় পরিণাম তোমার মতই হইয়া-থাকে! ইস্কান্দার! তোমার এই তসবীরের কল্যাণে, আমি তোমার গ্রাস হইতে আমার প্রিয়তম স্বামীকে নিরাপদে উদ্ধার করিয়াছি। আকবর বাদসাহের সেনাপতি হইয়া তুমি পদোচিত কর্ত্তব্য ভুলিয়া, পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া হইয়াছিলে। প্রভুর নিমকের মর্য্যাদা ও বিশ্বাসের সম্মান, এক ছার রমণীর জন্য অকাতরে পদদলিত করিয়াছ। তুমি অতি ঘৃণিত—অতি হেয়! সেনানী নামের অযোগ্য। আমাকে বাঁদী করিবার আশায় আসিয়াছিলে, এখন অবস্থা বৈগুণ্যে তুমি বান্দার অধম হইয়াছ। সাবধান! আর কখনও সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলার তসবীর দেখিয়া, কাম-কলুষিত হৃদয়ে তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও না। যে তসবীর তোমার এত জ্বালা ঘটাইল, তাহার মূল্য পাঁচ জুতি। আমি এই মূল্যেই আমার বাঁদীকে ইহা প্রদান করিয়াছিলাম। তোমার প্রভু আকবরসাহ তোমার এই অদ্ভুত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইলে, তোমাকে আমার কথিত মূল্যই দিবেন। তুমি এই পত্র যখন পাইবে, তখন আমরা অনেক দূরে যাইব। মনে জানিও, সিংহ যখন একবার পিঞ্জরমুক্ত হইয়াছে, তখন তাহাকে ধরে কে?"

"—গুলসানা—"

গুলসানার হস্ত-লিখিত পত্রখানি আমি ঘৃণায়, ক্রোধভরে, তখনই পদদলিত করিলাম। আমার সঙ্গী সৈনিকগণকে বলিলাম,—"তোমরা এখনি দুর্গের বাহিরে গিয়া, যে পঞ্চাশত অশ্বারোহী আমার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের একত্রিত কর। যে উপায়ে হউক পাহাড়, জঙ্গল, নদীতীর, উপত্যকা, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আজই সে পাপিষ্ঠ সোহানী ও তৎপত্নী গুলসানাকে ধরিতেই হইবে। নচেৎ আকবর সাহের কোপ-বহ্নি হইতে আমাদের কাহারও নিস্তার নাই।"

আমি অনন্যোপায় হইয়া, সেখজীর সরাইখানাতে ফিরিলাম। দেখিলাম, সেখজী রজ্জুনির্ম্মিত একটা চারিপাইএর উপর বসিয়া, কি ভাবিতেছে।

আমি পিশাচের ন্যায় কঠোর কণ্ঠে ডাকিলাম—"সেখজি?"

সেখজী তখনিই উঠিয়া দাঁড়াইল। সেলাম করিয়া বলিল—"একি! আপনি! এরূপ ভাবে এখানে ফিরিলেন যে?"

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম সেখ্জী! আমায় তুমি এ মূর্ত্তিতে কখনও দেখিয়াছ?"

সেখজী বিস্ময়ের সহিত বলিল—"এ বান্দা আপনার রহস্যের যোগ্য নয়। মৎকৃত সামান্য উপকারের বিনিময়ে, প্রাপ্য কৃতজ্ঞতার পুরস্কার ও এ নহে! মনে জানিবেন সাহেব! আমার জন্যই আপনি সোহানীকে ধরিতে পারিতে পারিয়াছেন।"

আমি একথা শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলাম—"সব খুলিয়া বল, ব্যাপার কি সেখজী?"

সেখজী বলিল—"আপনি এই ঘটনাময় রজনীর শেষ প্রহরে আসিয়া আমার চাকরকে জাগাইয়া, কাফি খাইয়াছেন! তারপর আমায় ডাকিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রাতে চাকরের মুখে, আমি এ কথাও শুনিয়াছি যে, সে আপনাকে অতি হৃষ্টচিত্তে সরাইখানা হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে তাহার কোন ভ্রমই হয় নাই। কিন্তু সাহেব! কেন আমার সর্ব্বনাশ করিলেন?"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! বুঝিলাম—শেষ রাত্রে সোহানী আমারই পরিচ্ছদ পরিয়া, ইস্কান্দার খাঁ রূপে আসিয়া সরাইখানায় কাফি খাইয়াছে। চেহারার ও পোষাকের সাদৃশ্য দেখিয়া, সেখজীর চাকর মহাভ্রমে পড়িয়াছিল। কিন্তু সেখজীর কিসে যে সর্ব্বনাশ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া সেখজী বলিল—"এখন এ বান্দার প্রতি দয়া করুন—জনাবালি! আমার এ হতাশ প্রাণের একমাত্র আশা, আনন্দ উৎসাহ, কুলসম কোথায় বলুন! তাহাকে আমায় ফিরাইয়া দিন। সে যাহাই হউক না কেন, আমি তাহাকে বড় ভালবাসি!"

আমি শপথ করিয়া বলিলাম—"আল্লার দোহাই সেখজী! কুলসমের কোন খবরই আমি রাখি না।"

সেখজী কটাক্ষ-ভঙ্গী করিয়া বলিল—"সাহেব! আকবর বাদসাহের সেনাপতি যে এতটা সৎপ্রবৃত্তিহীন হইতে পারেন, তাহা আজ বুঝিলাম। আমার সুখের বাসায় আগুন লাগাইয়া, আমার এ জালাময় হৃদয় শতধা চূর্ণ করিয়া, আপনার যে কি লাভ হইল, তাহা ত বুঝিতেছি না! আমার চাকর বলিয়াছে, গতরাত্রে আপনি যখন সরাই খানায় কাফি খাইতে আসেন, তখন সে আপনার সঙ্গে একজন স্ত্রীলোককে পাহাড়ে উঠিতে দেখিয়াছে। সে আর কেউ নয়—নিশ্চয়ই আমার কুলসম।"

আমি ক্রোধে, ক্ষোভে, মনস্তাপে দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিলাম—"না—না সব ভ্রম! তুমি ঘোর মূর্খ, তাই আমাকে এ নীচাপবাদ দিতেছ। আমরা দুইজনেই খোদার দুনিয়ায় দুটী নিরেট বোকা। আমার পোষাক পরিয়া কাল রাত্রে এখানে যে কাফি খাইয়া গিয়াছে—সে সোহানী। আর তাহার সঙ্গে সে স্ত্রীলোক আসিয়াছিল সে কুলসম নয়—গুলসানা।" আমি ধীরে ধীরে সকল কথাই সেখজীকে খুলিয়া বলিলাম। সেখজী সে সব কথা শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

সরাইখানায় আমার জন্য যে কক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, চিন্তাকাতর হৃদয়ে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে

আমার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে সেখজী! একবার ব্যাপারটা দেখিয়া যাও!"

সেখজী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—'কিসের সর্ব্বনাশ হুজুরালি?'

আমি মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া, হাত মোচড়াইতে মোচড়াইতে বলিলাম—"দেখিতেছ না! পাপিষ্ঠ সোহানী আমার তোরঙ্গ খুলিয়া, প্রয়োজনীয় সরকারী কাগজ পত্র সবই বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই বাক্সে, বাদসাহের বিরুদ্ধে তাহার স্বহস্তলিখিত কতকগুলি প্রয়োজনীয় দরকারী কাগজ ছিল। তাহাও সে লইয়া গিয়াছে। বাদসাহকে সে কাগজগুলি ফিরাইয়া না দিতে পারিলে, আমার প্রাণদণ্ড হইতে পারে। সেখজী! সোহানী আমায় জাহান্নমে দিয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাশী গুলসানা—আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

বাক্সের জিনিষপত্রগুলি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, খোদা আমার সহায়। বুঝিলাম, দুই এক খানি সামান্য পত্র ভিন্ন, গোপনীয় আর কিছুই সোহানীর হাতে পড়ে নাই। অতি আবশ্যকীয় কয়খানি পত্র আমার অন্য তোরঙ্গে ছিল। সেগুলি নষ্ট হয় নাই—ইহাতে বড়ই আনন্দ হইল। বুঝিলাম - সে যাত্রা প্রাণ বাঁচাইতে পারি বটে, কিন্তু বাদসাহের নিকট সোহানীর পলায়ন জন্য, অপমান লাঞ্ছনা সবই আমায় সহিতে হইবে।

আমার সেনারা সকলে উপত্যকামধ্যে সমবেত। সেখজীকে বলিলাম—"তোমার চাকরকে একবার ডাকাও। তাহাকে আমি দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

সেখজী নিজে অগ্রসর হইয়া, তাহার ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া আনিল। আমায় দেখিয়া নফরটা যেন একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল। জড়িতস্বরে কেবল মাত্র বলিল—"ইনিই আসিয়াছিলেন। না—না আমার ভ্রম! ইনি ত নয়। ইয়ে খোদা! দুজন আদমী দেখিতে এতটা এক রকমের হয়!"

আমি সেই ভৃত্যকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, "তোমার ভয় পাইবার কোন কারণই নাই। আমরা সকলেই এক চতুরা রমণীর বুদ্ধির নিকট প্রতারিত হইয়াছি। কিন্তু বলিতে পার, তাহারা কোন পথে গিয়াছে ?"

ভৃত্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশে, একটী দূরবর্ত্তী উপত্যকা-পথ দেখাইয়া দিল। তখনিই আমি সেখজীর প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া, মালপত্র লইয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সেখজী বলিল, "জনাবালি! আমাকে আপনার সঙ্গে নিন্।"

আমি প্রবুদ্ধস্বরে তাহাকে বলিলাম—"কেন তুমি আমাদের সঙ্গে বৃথা পথ-কষ্ট ভোগ করিবে ?"

সেখজী বলিল—"এক সুন্দরীর রূপের জন্য, আপনি যদি এতটা লাঞ্ছনা, ও মর্ম্মযাতনা সহ্য করিতে পারেন—তাহা হইলে আমি কি কুলসমের জন্য একটু পথ-কষ্ট সহিতে পারিব না ? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই সে তাহাদের সঙ্গে গিয়াছে। কুলসমকে ছাড়িয়া, আমি এক দণ্ড ও বাঁচিতে পারিব না। আপনি এ উপত্যকার সকল পথ জানেন না। কিন্তু আমি সঙ্গে থাকিলে আপনার অনেক উপকার হইবে।"

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সেখজী ও সেনাগণ সঙ্গে আমরা সম্মুখস্থ উপত্যকায় প্রবেশ করিলাম। দূর হইতে ইদলগড় দুর্গের, সুনীল পতাকা পরিদৃষ্ট হইল। হায়! ঐখানেই ত আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমি কয়েকজন বিশ্বাসী সেনাকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইলাম।- তাহাদের বিশেষভাবে বলিয়া দিলাম, সোহানীকে দেখিতে পাইলে, তাহারা যেন তখন আমায় সংবাদ দেয়।"

মধ্যাহ্নে আমরা এক বিস্তীর্ণ উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, আমরা পশ্চাৎবর্ত্তী সেনাদের আগমন

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সহসা সেই বনভূমি বিকম্পিত করিয়া রমণীকণ্ঠস্বরে আকুল ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।

এই গভীর উপত্যকামধ্যে, রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণ ক্রন্দন শব্দ শ্রবণে, আমরা সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলাম! সেখজী বলিল—"সাহেব! আওয়াজটা যেন ঐ পার্ব্বতায় নদী-তীর হইতে আসিতেছে!"

এই কথা বলিয়া, সেখজী কোন সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সাহেব! সোহানী! সোহানী!"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যগ্রভাবে বলিলাম—"কোথায়! কোথায়?"

সেখজী বলিল—"তাহার পলাইবার আর কোন সম্ভাবনা ন্যাই। তাহার সঙ্গে সেনা মাত্র নাই। ব্যস্ত হইবেন না, আমার সঙ্গে আসুন।"

আমি সঙ্গীদের সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সেখজীর সহিত এক স্বল্প পরিসর উপত্যকাপথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম। এক সমুচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, নিম্নস্থ এক অধিত্যকা মধ্যে, ক্ষীণকায় পার্ব্বত্য তটিনী-কূলে একজন পুরুষ শুইয়া রহিয়াছে। আর তার পার্শ্বে বসিয়া দুইজন রমণী।

সেই দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া সেখজী বলিল—"কিছু বুঝিতে পারিতেছেন কি?"

আমি বলিলাম—"কে যেন এক জন নদীকূলে শুইয়া আছে না।"

"আর?"

"দুইটী স্ত্রীলোক তাহার পার্শ্বে বসিয়া। তারমধ্যে একজন মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছে।"

"আপনার অনুমান সত্য। নদীকূলে শায়িত ব্যক্তি সোহানী। আর স্ত্রীলোক দুইটী গুলসানা ও কুলসম। চলুন! আমরা ঐ অধিত্যকায় নামিয়া যাই।"

অনেক কষ্টে, বহু পরিশ্রমের পর, আমরা লক্ষ্যভূত স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেথজীর অনুমান যথার্থ। সেই রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন গুলসানা! আর সোহানী—সেই নদীতীরে, সৈকতভূমিতে নিস্পন্দভাবে শায়িত।

আমি রুষ্টস্বরে বলিলাম—"গুলসানা! সর্ব্বনাশি! এইবার তোমার প্রতারণার ফলভোগ কর।"

গুলসানা উন্মাদিনীর মত আমার কাছে দৌড়িয়া আসিয়া, কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—"ইস্কান্দার সাহেব! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তোমার জিঘাংসাবৃত্তি হইতে যাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলাম, সম্রাট আকবরসার কবল হইতে যাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, হায়! হায়! মৃত্যুর মুখ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পালিাম না।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"ব্যাপার কি গুলসানা?"

গুলসানা বলিল—"অই দেখ সেই একনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ, বিগত-প্রাণ হইয়া, নদীসৈকতে ধূলি ধূসরিত! হায় ভাগ্য! হা হতভাগিনী গুলসানা!"

আমি প্রবুদ্ধস্বরে বলিলাম—"গুলসানা! বিধিলিপি খণ্ডন করিবার সাধ্যত মানুষের নাই। এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিল কিরূপে?"

গুলসানা, বস্ত্রাঞ্চলে নেত্রমার্জ্জনা করিয়া বলিল—"পাহাড় হইতে দ্রুতবেগে নামিবার সময় পদস্খলন হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।"

গুলসানা আমার চক্ষে মহা অপরাধিনী। একটু আগে সে আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অদৃষ্টের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, আমার প্রাণ সহানুভূতি পূর্ণ হইল। প্রতিশোধ প্রবৃত্তি শক্তিহীন হইয়া গেল। কোমল-কণ্ঠে গুলসানাকে বলিলাম—"বিবিসাহেব এখন তোমার জন্য কি করিতে হইবে আদেশ কর। তোমার মত গরীয়সী রমণীর আদেশপালনে আমি তিলমাত্র কুণ্ঠিত নই।"

গুলসানা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"যে আমার সর্ব্বস্ব ছিল, যাহাকে লইয়া আমার সংসার, যাহার কৃপায় আমি এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাণী হইয়াছিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে। সে প্রেম, সে স্নেহ, সে ভালবাসা এ জগতে আর কোথাও পাইব না। ইস্কান্দার সাহেব! ঘটনাচক্রে, দৈব-বিড়ম্বনায়, রাজরাণী আজ দেওয়ানা হইল, পথের ভিখারিণী হইল! আমার স্বামীর এ পবিত্র দেহ যাহাতে বন্যপশুতে না নষ্ট করে—তাঁহার সদ্গতি হয়, এ ব্যবস্থা তোমার করিতে হইবে।"

গুলসানার সেই রোরুদ্যমান অবস্থা দেখিয়া, আমার চোখে জল আসিল। আমি প্রবুদ্ধস্বরে বলিলাম—"বল—বল—গুলসানা! ইহা ছাড়া আর কি করিলে আমি তোমার চিত্তুতুষ্টি করিতে পারি?"

গুলসানা স্থির ভাবে কি ভাবিল। তৎপরে বলিল—"তোমার প্রভু আকবর সাহ সোহানীকে চান। তোমার উপর নিশ্চয়ই এইরূপ কোন আদেশ আছে যে, সোহানীকে জীবিত না পার তাহার মৃতদেহও এখানে আনিবে। তুমি সম্রাটের আদেশ প্রতিপালন কর।"

গুলসানা চোখের জল মুছিয়া আবার বলিল—"ইস্কান্দার! তুমি কি মনে ভাবিতেছ, আকবর সার অন্তঃকরণ এত নীচ—যে তিনি এই বিগত প্রাণ শত্রুর, পবিত্র শবদেহের কোনরূপ অবমাননা করিবেন? না—তাহা কথনই সম্ভব নহে। দেখিও—নিশ্চয়ই তিনি এই দেহকে অতি পবিত্রভাবে সুন্দর স্থানে সমাহিত করিবার আদেশ করিবেন। আমার স্বামী রাজো-চিত গুণাবলীতে বিভূষিত হইয়া এ ধরায় আসিয়াছিলেন। আমার জীবনের শেষ কামনা, সেই ভাবেই তিনি সমাধিস্থ হন। ইস্কান্দার! তোমার সহিত আমি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাও। এ মহা বিপদে আমার সহায়তা কর। স্বামীর জীবনের সঙ্গে আমার সব গিয়াছে। সোহানী রাজ্যেশ্বর হইয়া জন্মিয়াছিল, তাহার আদরিণী পত্নীরূপে আমিও

রাজরাণী হইয়াছিলাম। খোদা যখন আমার সে সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন, তখন এ ছার জীবনের কোন সার্থকতাই নাই। যতদিন না স্বামীর এই নশ্বরদেহ কবরের মাটীতে মিশাইয়া যাইবে, ততদিন আমি তাঁহার সমাধিপার্শ্বে বসিয়া অশ্রুপাত করিব। তার পর, সেই কবরের উপর, এক জাগ্রত স্মৃতিময় সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, যতদিন বাঁচিব ততদিন দেওয়ানা হইয়া খোদার কাছে তাঁহার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিব।”

আমি ধীরভাবে বলিলাম—“গুলসানা! শান্ত হও। রোদনে কোন ফল নাই। সমাধি-মন্দির তুলিবার জন্য, যত অর্থের প্রয়োজন হইবে, আমি তাহা তোমায় দিব। আমি তোমায় এ শোচনীয় অকাল-বৈধব্যের কারণ। আমি মহা-পাপী। আমার কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। বিশ্বাসন্যস্ত কর্ত্তব্য ভুলিয়া, আমি আমার প্রভু দিল্লীশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। এক সতীসাধ্বী কুলললনার রূপ-মোহিত হইয়া, প্রবৃত্তি চালিত পশুর ন্যায় অধর্ম্মপথে আসিয়াছি। গুলসানা! আমার এ মহাপাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন! যাহাতে তুমি প্রাণে শান্তি পাও, তাহা করিলেই আমার সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে।”

পথে আর কালবিলম্ব করা উচিত নয় ভাবিয়া, গুলসানার আদেশে সেখজী ইদলগড়ে চলিয়া গেল। তথা হইতে নানাবিধ সুগন্ধি-দ্রব্য, অগুরু, প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিল। একটী শবাধার ও চারি জন বাহকও যোগাড় হইল। আমি সোহানীর পবিত্র দেহ, অগুরু চন্দন কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধ দ্বারা বিলেপিত করিলাম। সেই বিগতপ্রাণ বীরবপু উত্তমরূপে আবৃত করিয়া, আমাদের সঙ্গে যে বয়েলগাড়ী ছিল, তাহাতে তুলিয়া দিলাম। শববাহীরা সকলেইসোহানীর ভৃত্য। তাহারা সেই গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গুলসানার জন্য ইদলগড় হইতে আমার উপদেশ ক্রমে, সেখজী এক খানি ঝালরদার পালকীও আনিয়াছে।

কিন্তু সেই পালকীতে উঠিতে গুলসানা কোন ক্রমেই সম্মত হইল না। সে রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আর কেন এ বিলাস ভোগ ইস্কান্দার? রাণী হইয়া এক দিন যে পালকীতে চড়িয়াছি, আজ বাঁদী হইয়া কোন সুখে তাহাতে উঠিয়া বসিব? না—না পদব্রজে যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য। আমার কোন কষ্টই হইবে না!"

আমি গুলসানাকে, মিষ্ট কথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, পালকীতে উঠাইলাম। গুলসানা, বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে, অগত্যা পালকীতে উঠিল। ইহাকেই বলে—ভাগ্য পরিবর্ত্তন!

আগরায় পৌছিয়া, আমি সর্ব্বাগ্রে বাদশাহের সহিত দেখা করিলাম। সাহান-শা, সেই সময়ে দেওয়ান-খাসের মর্ম্মর-কক্ষে বসিয়া, রাজা বীরবল ও রামদাস নামক এক হিন্দু-পণ্ডিতের সহিত, হিন্দু-শাস্ত্র লইয়া তর্ক করিতেছেন। দুইজন—খোরাসানী বাঁদী, তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল।

আমি প্রথমতঃ কুর্ণীশ করিয়া বলিলাম—"সাহান-শা! খোদা আপনাকে চিরবিজয়ী ও চির সৌভাগ্যবান্‌ করুন্‌।"

এই কথাগুলি শুনিবামাত্রই, বাদশাহের মুখমণ্ডল লোহিত-রাগ-রঞ্জিত হইল। তিনি যে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখনকার মুখ ভাব দেখিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমার হৃদয়ের মধ্যে, দারুণ কম্পন উপস্থিত হইল। বুঝিলাম, আমার পৌছিবার পূর্ব্বে, সোহানী-সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে।

দিল্লীশ্বর, কঠোর বিদ্রুপের সহিত বলিলেন—"তোমার মত ন্যায়নিষ্ঠ বিশ্বাস-ভাজন, কর্ত্তব্যপরায়ণ সেনাপতি, আর দুই চারি জন থাকিলেই, আমার জয়লক্ষ্মী চিরকাল বাঁধা থাকিবেন।"

আমি এ কথায় কোন উত্তর করিতে সাহস করিলাম না। এ কঠোর বিদ্রুপে, আমার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া স্বেদ-ধারা ছুটিতে লাগিল। মস্তিষ্কের মধ্যে

প্রচণ্ড জ্বালা উপস্থিত হইল। মনে মনে ভাবিলাম—"নিশ্চয়ই বাদশাহ সোহানী-ঘটিত সমস্ত সংবাদই জানিয়াছেন। কিন্তু কে তাঁহাকে ইতি মধ্যে এ সব সংবাদ দিয়া গেল?"

বাদশাহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"ইস্কান্দার খাঁ! রাজনীতি শাস্ত্রানুযায়ী তোমার অপরাধ, মার্জ্জনাযোগ্য নহে। আর ধর্ম্মনীতির নিয়মানুসারেও উপেক্ষণীয় নহে। যদি তুমি—একটু বেশী কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে, কর্ত্তব্যের মুখে, নিজের পাশব-প্রবৃত্তিকে বলি দিতে পারিতে, তাহা হইলে বোধ হয়, সোহানীকে আজ আমি জীবিতাবস্থায় পাইতাম। আর ইহার পুরস্কার স্বরূপ, আমি তোমাকে একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিতাম। কিন্তু—"

বাদশাহ আর কিছু বলিলেন না। এই "কিন্তু" কথাটির মধ্যে সবই রহিয়া গেল। আমি বুঝিলাম, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। প্রাণটা যদিও বা কোনরূপে বাঁচিয়া যায়, তাহাহইলেও আজীবন কারারুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।

বাদশাহ সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন—"সোহানীর মৃতদেহ কোথায়?"

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম "সে দেহ আগ্রায় আনিয়াছি ও তদ্বিষয়ে সাহান্‌শার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি।"

বাদশাহ তখনিই একজন খোজাকে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"মীরমুন্সীকে এখনি ডাকিয়া আন!"

খোজা চলিয়া গেল। আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। এতদিন আমি বাদশাহের অনুগ্রহ ও আদর পাইয়াই আসিয়াছি। আজ বুঝিলাম—অদৃষ্টচক্র বিরূপ হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে।

আমি দিল্লীশ্বরের মুখভাব দেখিয়াই বুঝিলাম—তিনি আমার উপর ভয়ানক বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমার প্রাণে একটা মহা ভয় উপস্থিত হইল। আমি নতজানু হইয়া—তাঁহার সম্মুখে বসিয়া যুক্তকরে বলিলাম—"দীন্‌-দুনিয়ার মালেক! গরীব-পর্‌ওয়ার! মেহেরবান্‌! এ ব্যাপারে আমার সমস্ত গোস্তাখি মাফ্‌ হয়।"

বাদশাহ বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"জানিও ইস্কান্দার খাঁ! যে চক্ষে স্নেহশীতল অনুরাগ আসে, সেই চক্ষেই আবার বিরাগের জ্বালাময় প্রচণ্ড দাবানল জ্বলিয়া উঠে। জানি না—তোমার এ অপরাধের কি ভীষণ শাস্তি হইতে পারে?"

ঠিক এই সময়ে মীরমুন্সী আসিয়া সসম্ভ্রমে কুর্ণীশ করিল। বাদশাহ গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে আদেশ করিলেন—"বিদ্রোহী দুর্গাধিপতি শাহ সোহানীর পবিত্র মৃতদেহ, আমার আমীর-ওমরাহদিগের সমাধিক্ষেত্রে, আজই সমাহিত হইবে। সরকার হইতে কবরের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য, দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দাও। এই শয়তান ইস্কান্দার খাঁকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। এই এ সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক্‌ করিয়া দিবে। আমি যথাসময়ে সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইব।"

বাদশাহ আর কোন কথা না বলিয়া, তাঁহার সঙ্গীদের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। আমি ও মীর-মুন্সী, সসম্ভ্রমে কুর্ণীশ করিয়া, ভীতি-কম্পন সংকুচিত হৃদয়ে, দরবার কক্ষ হইতে চলিয়া আসিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

মীর-মুন্সীর ও আমার বন্দোবস্তে, সোহানীর মৃতদেহ—স্বর্ণখচিত বহুমূল্য শবাধারে রক্ষিত হইল। অগুরু, ইস্তাম্বুল, মৃগমদ প্রভৃতির মনোমদ

সুগন্ধসিক্ত কৌষেয় বাসে, সেই প্রাণহীন দেহ সুসজ্জিত হইল। তৎপরে সেই শবাধার, সমারোহের সহিত সমাধিক্ষেত্রে প্রেরিত হইল। আমি আমার সেই পঞ্চাশত সেনা সঙ্গে লইয়া, সেই শবাধারের সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রের দ্বার পর্য্যন্ত গেলাম। কাজ শেষ করিয়া নিজ গৃহে ফিরিলাম।

গুলসানা, আমার গৃহেই আশ্রয় লইয়াছিল। আমার নিজ ব্যবহার্য্য, উপরের একটী সুসজ্জিত নির্জ্জন কক্ষ, তাহার অবস্থান জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। আমার প্রাণে তখন একটা বিজাতীয় যাতনা ও নির্ব্বেদ। একবার মনে হইল, আর তাহার সহিত দেখা করিব না। আর ঘোর মূর্খের মত জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া ক্রীড়া করিব না।

আমি গুলসানার পরিচর্য্যার জন্য, দুই জন বাঁদী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। আর কুলসমও সেই সঙ্গে ছিল। আর সেখজী আমার কক্ষের পার্শ্বে আর একটী কক্ষ দখল করিয়া নিজের করিয়া লইয়াছিল।

শ্রান্তি দূর করিবার জন্য, আমি এক পেয়ালা কাফি খাইলাম। পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার জন্য নানাবিধ খাদ্যের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্নানান্তে সুস্থ হইয়া নিজের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছি—এমন সময়ে কুলসম আসিয়া দেখা দিল। আমি সাগ্রহে বলিলাম, "সংবাদ কি কুলসম্! তোমার বিবির স্নানাহার শেষ হইয়াছে ত?"

কুলসম বিষাদমাখা স্বরে বলিল—"তিনি স্নান করিয়াছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই আহার করিতে চাহিতেছেন না। আপনাকে একবার ডাকিতেছেন।"

কুলসমের মুখে এ কথা শুনিয়া, আমার মন বড়ই চঞ্চল হইল। উদকমাত্র সম্বল করিয়া, গুলসানা দুই দিন নিরন্ন অবস্থায় আছে। যে উপায়েই হউক, আজ তাহাকে কিছু খাওয়াইতেই হইবে। এই ভাবিয়া আমি কুলসমের অনুসরণ করিলাম।

দেখিলাম—শ্বেত প্রস্তর-মণ্ডিত সেই ক্ষুদ্র মেঝের উপর, অপ্সরোপম রূপশালিনী গুলসানা শুইয়া রহিয়াছে। যেন শুভ্র সরসী জলে একটী প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্ম ভাসিতেছে। এলায়িত—অবেণীসম্বদ্ধ, কৃষ্ণ কেশরাশি, পৃষ্ঠে, অংসে ও স্কন্ধের পশ্চাৎ দিকে অবতীর্ণ হইয়া, তাহার চম্পকনিন্দিত দেহ-জ্যোতির সহিত আপনাদের সুকৃষ্ণ রূপ মিশাইতেছে। যেন চির-চঞ্চলা বিদ্যুল্লতা স্থির হইয়া মেদিনীতল আশ্রয় করিয়াছে।

আমি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলাম—"গুলসানা! কিছুই খাও নাই কেন?"

গুলসানা কোন কথা কহিল না। বাম হস্তে ভর দিয়া সেই ভূ-শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। অঞ্চল-প্রান্ত দিয়া তাহার চক্ষু মুছিল।

তৎপরে সে ধীরে ধীরে, বামহস্তের চম্পকাভ অঙ্গুলী দ্বারা, গণ্ডোপরি সমাগত, সুকৃষ্ণ অলকাগুলি সরাইয়া লইয়া, আমার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল---"আমার চোখে এ বাণের-ধারা কে বহাইল ইস্কান্দার খাঁ? সুদূর মালব দেশে, নিভৃত পর্ব্বতের উপত্যকায়, সুখময় স্বাধীন স্থানে, একটী সুখের সংসার পাতিয়া, আমরা দুইজনে আনন্দে জীবন কাটাইতেছিলাম। তাহা তোমার সহিল না কেন—ইস্কান্দার? একান্ত প্রেমমুগ্ধ শ্যেন দম্পতীর মত, আমরা সুখে বাস করিতেছিলাম—তাহা তোমার অসহ্য হইল কেন—ইস্কান্দার? যে সোহানী নিজের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য মধ্যে, গতজীবন হইলে, আজ প্রজারা সকলেই কৃষ্ণ-পতাকা হস্তে, নগ্নপদে, মৌনমুখে, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে, তাঁহার শবাধারের অনুসরণ করিত, আজ কিনা এই অপরিচিত আগরা নগরীতে, তাঁহার বিয়োগ জন্য অশ্রুপাত করিতে, এই অভাগিনী ভিন্ন আর কেহই নাই! রত্নখচিত বিচিত্র কৌষেয়, বসনে যে, তাঁহার মৃতদেহ আবরিত হইয়া সম্রাটোচিত গর্ব্বের সহিত সমাধি-ক্ষেত্রে নীত হইত। কিন্তু এখানে তাহার ত কিছুই হইল না ইস্কান্দার! আমার প্রাণের ভিতর যে ভীষণ দাবাগ্নি জ্বলিতেছে, তুমি কি মনে ভাবিয়াছ,

তোমায় আতিথ্যাভিমুখী সুবাসিত অন্নরসে তাহা নির্ব্বাণ হাওয়া সম্ভব ? না—না ইস্কান্দার ! যতক্ষণ না আমি স্বামীর অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণে তিলমাত্র শান্তি নাই।”

গুলসানার এ মর্ম্মভেদী তেজ-দৃপ্ত তিরস্কারে, আমি বড়ই মর্ম্মজ্বালা-পীড়িত হইলাম। হায় ভাগ্য! যাঁহার আদেশে এ নৃশংসকার্য্যের উপলক্ষ্য আমি, আমার দুর্ভাগ্যগুণে, সেই লোকেশ্বর সম্রাট পর্য্যন্তও আমার উপর বিরক্ত।

আমি আর কোন কথা না বলিয়া, গুলসানার সমস্ত তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলাম। স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময়ে গুলসানা বলিল “ইস্কান্দার ! আমার স্বামীর মৃতদেহ কোথায় ? তাঁহার সৎকারের কি বন্দোবস্ত করিয়াছ ?”

আমি ধীরভাবে বলিলাম—“বাদশাহের আদেশে মীরমুন্সী, তাহা ওমরাহদের কবর-খানায় লইয়া গিয়াছে। আর সম্রাট, এই সমাধি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, দুই হাজার আসরফি দিয়াছেন।” গুলসানা এই কথা শুনিয়া পদাহতা ফণিনীর মত দাঁড়াইয়া, সমুন্নত গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বলিল, “না—না, সোহানীর পত্নীর দেহে জীবন থাকিতে, সে দিল্লীশ্বরের এ করুণার দান গ্রহণ করিবে না। দুই দিন পূর্ব্বে, আমি এক ক্ষুদ্র রাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিলাম। এই হস্তে, আমি এতদতিরিক্ত অর্থ দরিদ্রকে দান করিয়াছি। আমার স্বামী অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া, আমায় দুর্ভাগ্যবতী করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু অর্থসম্বলবিহীনা করিয়া যান নাই। তুমি দিল্লীশ্বরকে বলিও, সোহানীপত্নী তাঁহার এ করুণার দান চাহে না। একটু অপেক্ষা কর তুমি, আমি এখনি আসিতেছি।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে গুলসানা পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল। একটী হস্তীদন্ত নির্ম্মিত পেটিকা উন্মোচন করিয়া, তাহার মধ্য হইতে এক বিচিত্র কারু-কার্য্যময়, রজত-নির্ম্মিত বাক্স বাহির করিয়া আনিল। আমার ও কুল-

সমের সমক্ষে সেই রজতাধারের চাবি খুলিয়া ফেলিল। আমরা বিস্মিত-নেত্রে দেখিলাম, তাহার মধ্যে কয়েক ছড়া রত্ন হার, কয়েকটী উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় হীরক ও কপোত ডিম্বাকার দুইটী মুক্তা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক জহরৎ সেই ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যে ছিল। সে গুলির উজ্জ্বল জ্যোতিতে সেই কক্ষ যেন দীপালোকিতবৎ হইয়া উঠিল।

গুলসানা কঠোর বিক্রপপূর্ণ স্বরে বলিল---"তোমার প্রভু বাদশাহকে বলিও, তিনি তাঁহার বিজিত শত্রুর মৃতদেহের সমাধির জন্য যে দান-শৌণ্ডতা প্রকাশ করিয়াছেন—এ অধিনী তজ্জন্য তাঁহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ। আমি লোকান্তরগত স্বামীর মুখেই শুনিয়াছি, যে অপরের দানে সমাধিস্থ হইলে, নবীগণ মৃতের আত্মার প্রতি বড়ই নারাজ হন। তিনি আমাকে এই বহুমূল্য রত্নপূর্ণ বাক্সটী দিবার সময় বলিয়াছিলেন—"গুলসানা! ভাগ্য মানুষকে বড়ই ছলনা করে। কাল যদি আমার এ রাজ্য যায়, ঐশ্বর্য্য, যায়, ইহলোকের সর্ব্বস্ব যায়, দেখিও যেন আমার সমাধি ব্যবস্থা কোন রূপে গৌরবহীন না হয়। ইস্কান্দার! তোমার সম্রাটকে বলিও. এই রত্নগুলি বিক্রয় করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই আমার স্বামীর পদোচিত সম্ভ্রমের অনুরূপ সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। সোহানীপত্নী, এজন্য কাহারও নিকট ঋণী থাকিতে চাহে না।"

গুলসানার এ তেজোগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া, আমার প্রাণ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম—"গুলসানা! সাধ্বি! জীবনের এই সম্বলগুলি নষ্ট হইলে, যে ভিখারিণী হইবে তুমি?"

গুলসানা স্থির স্বরে বলিল—"ভাগ্যলিপি যদি তাহাই হয়, তাহাহইলে খোদার দুনিয়ায়, এই ভিখারিণী দেওয়ানাকে একটী তাম্র মুদ্রা কিম্বা এক মুষ্টি অন্ন দিতে, কেহই বোধ হয় কাতর হইবে না।"

গুলসানার এই সকল অনুশোচনাময় কথা, আমার মর্ম্মে যেন

শেলাঘাত করিল। কে যেন উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা, আমার হৃৎ-পিণ্ডকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। এই মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, আমি সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু গুলসানার সামীপ্যত্যাগ করিয়াও আমি পরিত্রাণ পাইলাম না। গুলসানার সেই অলঙ্কারের পেটিকাটি কুলসম, আমার সম্মুখে আনিয়া দিল। নির্ব্বন্ধবতী গুলসানার অভিপ্রায়ানুসারে, আমি একখানি আরজীতে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া, সেই অলঙ্কারের বাক্সটী এক পদাতিক দ্বারা, বাদ-শাহের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এক ঘণ্টার মধ্যে, পদাতিক দরবার হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে আসিয়াছে চারিজন অস্ত্রধারী খোজা। একখানি রত্নখচিত সুন্দর শিবিকাও নিম্ন প্রাঙ্গণে দেখা দিল। আর সেই সঙ্গে, একজন খোজা, বাদশাহের একখানি পত্র আমার হাতে দিল।

বাদশাহ সেই পত্রে লিখিয়াছেন—"সোহানীর গৌরবময়ী পত্নী, সাধ্বী গুলসানার প্রস্তাবে, আমি পূর্ণ সম্মতি দান করিলাম। কিন্তু আমার আন্তরিক অভিলাষ, তিনি যেন একবার আমার এ গরীবখানায় পদার্পণ করেন।"

বাদশাহের পত্রের ভঙ্গী দেখিয়া, আমি এক মহাসমস্যার মধ্যে পড়িলাম। যাঁহার হুকুম হইলে গুলসানাকে বিনা আপত্তিতে রঙ্গমহালে হাজির হইতে হইত, তাঁহার প্রতি এত অনুগ্রহ, এতটা বিনয় কেন? গুলসানা এখন সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ক্ষমতার অধীন। তবে কি বাদশাহ তাঁহার হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ উদারতাবশে এ মহত্ব দেখাইয়াছেন?

যাহাই হউক, আমি খোজাগণকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া

বাদশাহের পত্রখানি লইয়া, গুলসানার কক্ষে গেলাম। তাহার হস্তে পত্রখানি দিয়া বলিলাম—"দিল্লীশ্বর তোমাকে এই পত্রখানি দিয়াছেন।"

খরিতাখানি পাঠ করিয়া, গুলসানা আমাকে তাহা ফিরাইয়া দিল। পত্র পাঠান্তে তাহার মুখের ভাব একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না। সেই স্থানে বিমর্ষমুখে দাঁড়াইয়া, সে যেন কত কি ভাবিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"গুলসানা! তোমার জন্য বাদশাহ পালকী ও রক্ষী পাঠাইয়াছেন। অদ্য অপরাহ্ণে সোহানী সাহেবের সমাধি হইবে। বাদশাহের লোকেরা, তোমার জন্য নিম্নতলে অপেক্ষা করিতেছে।"

গুলসানা বলিল—"যাইব! আকবরশার রঙ্গমহলে নিশ্চয়ই যাইব! শুনিয়াছি, আকবরশাহ বড়ই উদার-হৃদয়। সে উদারতার পরীক্ষা আজ নিজেই করিব। শুনিয়াছি, তিনি ন্যায়বিচারক! কিরূপে তিনি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাহাও আজ দেখিতে চাই।" এই কথা বলিয়া সে নীচে নামিতে উদ্যত হইল।

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"এই দীনবেশেই কি সম্রাট্ সাক্ষাতে যাইব?"

গুলসানা বলিল—"এখন যে আমি আশ্রয়হীনা অনাথিনী দেওয়ানা। এই বেশই এখন আমার পক্ষে উপযুক্ত।" এই বলিয়া সেই দর্পিতা গুলসানা, ধীর পদে নীচে নামিয়া আসিল। আমি কুলসমকে ইঙ্গিতে বলিলাম, "তুমিও ঐ শিবিকার সঙ্গে যাও।"

প্রহরীবেষ্টিত হইয়া শিবিকা আগ্রা দুর্গাভিমুখে চলিল। সেই খোজাদলের প্রধান—কুলকফ্, যাইবার সময় আমায় কেবল মাত্র বলিয়া গেল "দিবার চতুর্থ প্রহরে সমাধি হইবে। বাদশাহ আপনাকে সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি সমাধিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইলাম। যে বিরাট দৃশ্য দেখিলাম—তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। অসংখ্য সেনা, কাতারে

কাতারে, সোহানীর শবাধারের দুই পার্শ্ব ঘিরিয়া চলিয়াছে। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজগণ সারিবন্দী হইয়া, পাশাপাশি চলিতেছে। তারপর হাওদার শ্রেণী। একটী হাওদায় স্বয়ং দিল্লীশ্বর—তার পরের হাওদায় শাহজাদা সুলতান সেলিম। অপর একটী হাওদায়, দিল্লীশ্বরের উজীরদ্বয়। স্বয়ং মহারাজ মানসিংহ, এই অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যচালনা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দামামার গুরু গম্ভীর শব্দে, দিকবলয় বিক্ষুব্ধ ও সন্ত্রাসিত হইতেছে। সৈন্যগণের কোষমুক্ত তরবারি ও হস্তধৃত বর্শার উজ্জ্বল ফলকের উপর, অস্তগামী সূর্য্যকিরণ পড়িয়া, এক অতি সুন্দর গম্ভীর ও প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের সূচনা করিয়াছে। তারপর আর কত লোকের নাম করিব? রাজসভায় যাঁহারা অগ্রণী, সমরক্ষেত্রে যাঁহারা প্রধান সেনা-পতি, রাজ্যের যাঁহারা স্তম্ভ-স্বরূপ, তাঁহাদের সকলেই এই শবযাত্রীর দলে আছেন।

যথাসময়ে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া, সংক্ষুব্ধসমুদ্রবৎ এই সেনা-প্রবাহ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই উষ্ণীষ খুলিয়া, সেই সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। দিল্লীশ্বর ও সুলতান সেলিম, শবাধারের দুইদিক ধরি-লেন। শীতল মৃত্তিকা-গর্ভে, সেই শবাধার ধীরে নিক্ষিপ্ত হইল। বাদশাহের আদেশে, সোহানীর মৃতদেহ ইতিপূর্ব্বেই গোলাপজলে স্নাত ও অগুরু চর্চ্চিত হইয়াছিল।

আকবরসাহ জনসংঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দুইজন বীর দিল্লীশ্বরের ক্ষমতার বিরুদ্ধে আজীবন-ব্যাপী চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের একজন চিতোরাধিপতি রাজপুত কুল-চূড়ামণি, মহারাণা প্রতাপ সিংহ—আর একজন এই মালবেশ্বর সোহানী। আজ যদি এই বীর প্রবর সোহানীকে জীবিত অবস্থায় পাইতাম, তাহাহইলে তাঁহাকে আততায়ী না ভাবিয়া, বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতাম। বীরত্বের সম্মান ও

গৌরব রক্ষা করা, প্রত্যেক বীরের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাই আজ এই বিরাট অনুষ্ঠান। আর আমিও শবযাত্রীরূপে এই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত।"

অবগুণ্ঠিতা গুলসানার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"গুলসানা! তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। পতিপ্রেম-সমুজ্জল সাধ্বীর, ঈপ্সিত পবিত্রকার্য্যে বাধা দিতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তুমি এই স্থানে থাকিয়া, তোমার শেষ কর্ত্তব্য কর। এই ইস্কান্দার খাঁ তোমাকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া দিবে। তোমার জন্য যান-বাহন বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।"

বাদশাহ গম্ভীরমুখে, বিষণ্ণ হৃদয়ে, সমাধিভূমি ত্যাগ করিলেন। গুলসানা ধীরে ধীরে সেই সমাধির মৃত্তিকার উপর লুণ্ঠিত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হে দয়িত! হে জীবিতেশ্বর! আজ হইতে তোমার এই নশ্বর দেহের সহিত আমার সকল সম্পর্ক লোপ হইল বটে, কিন্তু স্থির জানিও, গুলসানা তোমায় ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারিবে না।"

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সন্ধ্যার তামসী ছায়া, সেই সমাধিক্ষেত্রের প্রস্তর-স্তম্ভ ও মিনারগুলির উপর মসীধারা-বৃষ্টি করিতেছে। কি একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, প্রদোষের কৃষ্ণ-ছায়ার সহিত মিশিয়া, সেই অন্তিম ক্ষেত্রের ভীষণতা বৃদ্ধি করিতেছে। অন্ধকার গভীর হইতেছে দেখিয়া, আমি গুলসানার সমীপবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম,—"চল—গুলসানা! আমরা যথাস্থানে যাই।"

গুলসানা মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বলিল— "কোথায় যাইব ইস্কান্দার খাঁ! তুমি ত এ জগতে আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখ নাই। কেন ইস্কান্দার! তুমি বিনা অপরাধে, আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে?"

আমি কোন কিছু না বলিয়া, বাদশাহের আদেশানুযায়ী তাঁহাকে শিবিকায় তুলিয়া দিলাম। এটা খুব সত্য, আমি তাহার উপর যে অত্যাচার

করিয়াছি, সে মহাপাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই! গুলসানা সম্রাটের রঙ্গমহালে চলিয়া গেল। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলাম "হায়! কেন আমি বিনামূল্যে তসবীর কিনিয়া, চারি দিক হইতেই ভীষণ ভাগ্যবিপ্লবের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এই সমাধির পরের দিনে যে প্রভাত আসিল, তাহা আমার পক্ষে অতি কুপ্রভাত। কেন না, প্রাতঃকালে শয্যা-ত্যাগ করিয়া স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু সেবনার্থে, ছাদে আসিবামাত্রই দেখিলাম, একজন মোগল-অশ্বারোহী অতি দ্রুতবেগে আমার বাটীর দিকে আসিতেছে।

আমি প্রথমে ভাবিলাম, বাদশাহ হয়তো গুলসানাকে শান্ত করিতে না পারিয়া, আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া, আমি ত্রস্ত ভাবে নীচে নামিয়া আসিলাম। দেখিলাম, আমার পুরীর দ্বারে দুইজন মোগল প্রহরী।

তাহারা আমাকে দেখিয়া অতি তাচ্ছল্যভাবে সম্বর্দ্ধনা করিল। দুই দিন আগে, যাহারা আমার সামান্য অনুগ্রহ-দৃষ্টির জন্য লালায়িত হইত, আজ তাহাদের এ ভাববৈষম্য কেন? আমি তাঁহাদের একজনের নাম জানিতাম। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম "মবারক!—ব্যাপার কি?

মবারক বলিল—"সাহেব! আমাদের উপর জাঁহাপনার হুকুম এই, যেন আপনি বাটীর বাহিরে যাইতে না পারেন।"

এই কথায় আমার মুখমণ্ডল শবের মত মলিন হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম, এই বার আমার লীলাখেলা শেষ হইয়াছে। সত্যই তাই। পূর্ব্ব দৃষ্ট অশ্বারোহী নিকটে আসিয়াই, আমার হাতে একখানি লাল রংএর

রোবকারী দিল। তাহা পড়িবামাত্রই আমার চক্ষে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল। বাদশাহের আদেশে, আমি নজরবন্দী অবস্থায় বিচারার্থে রাজসভায় আহুত হইয়াছি।

প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায়, আমি খাস্‌-দরবারে উপস্থিত হইলাম। অবশ্য আমার হস্ত-পদ শৃঙ্খলবন্ধন মুক্ত, কিন্তু তাহা হইলেও আমি পাহারা বেষ্টিত। অবে আমার অদৃষ্টে খুব সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে, যে সেই গুপ্তদরবারে স্বয়ং সম্রাট ও তাঁহার শরীররক্ষী খোজা প্রহরীগণ ছাড়া আর কেহ নাই।

বাদশাহ গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"ইস্কান্দার খাঁ! এক অতি গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আমি তোমায় দিয়াছিলাম, কিন্তু এক স্ত্রীলোকের রূপমোহে পড়িয়া, তুমি আমার সম্মান ও গৌরব নষ্ট করিতে বসিয়াছিলে। দৈব দুর্ঘটনায় সোহানীর মৃত্যু না ঘটিলে, সে পুনরায় সেনা সংগ্রহ করিয়া, আমার বিরুদ্ধাচরণ করিত। তোমার এ জ্ঞানকৃত অপরাধ অমার্জ্জনীয়। যদি আমার পুত্র, সুলতান শাহ সেলিম এরূপ কোন কঠোর অপরাধ করিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতাম। ইতিপূর্ব্বে আমি তোমার কার্য্যদক্ষতার ও বিশ্বস্ততার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। এজন্য এ কর্ত্তব্য-হীনতার শাস্তিস্বরূপ, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তোমার আজীবন কারাবাস ব্যবস্থা করিলাম।"

ভীমভৈরব বজ্রনাদের ন্যায়, বাদশাহের এ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল। আমার মস্তিষ্কের প্রত্যেক সূক্ষ্ম তন্তু মধ্য দিয়া, প্রচণ্ড অগ্নিশিখা ছুটিতে লাগিল। সেই সূর্য্য-করোজ্জ্বলিত দিবা-লোকেও আমি যেন প্রলয়ের অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম, "মা! ধরিত্রী! বিদীর্ণা হও মা! আমি তোমার বক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল জ্বালার, সকল অপমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই।"

বাদশাহ এই সময়ে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"গুলসানা!"

গুলসানা বোধ হয় সেই দরবারগৃহের নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল। সে তখনই দ্রুতপদে আসিয়া, বাদশাহকে কুর্ণীস করিল।

বাদশাহ বলিলেন—"গুলসানা! তুমি বীরপত্নী, পতিব্রতা[স্বামীর অপমৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য, তুমি আমার কাছে বিচারপ্রার্থিনী হইয়াছিলে। যে ইস্কান্দার খাঁ আমার বিশ্বাসী সেনাপতি হইয়াও তোমার সতীধর্ম্মের উপর অত্যাচার কামনা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিল, আমি তাহার প্রতি আজীবন কারাদণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছি।"

এতক্ষণে আমি বুঝিলাম, পাঠান রমণীর প্রতিশোধ প্রবৃত্তি কত ভীষণ! যাহার রূপ দেখিয়া আমি মজিয়াছিলাম, যাহার জন্য আজ আমার এ দুর্দ্দশা—বুঝিলাম, সে নারীরূপে রাক্ষসী! মোহিনীরূপে পিশাচী! চিত্রিত কায়া বিষধরীর মত, সে অতি ক্রূর, তীব্র হলাহলময়ী। প্রসূনকোমলা হইয়াও বজ্রাগ্নির মত ধ্বংসকারী। মিষ্টভাষিণী হইলেও, সে অতি ছলনাময়ী পাষাণী।

হায়! কি কুক্ষণে, সেই বৃদ্ধা তসবীর-ওয়ালীর নিকট আমি পাষাণী গুলসানার তসবীর কিনিয়াছিলাম? কি কুক্ষণে, সেই তস্‌বীর-চিত্রিত গুলসানার মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলাম? তস্‌বীরওয়ালী আমায় বলিয়া দিয়াছিল, তসবীরের মূল্য "পাঁচ জুতি"। এখন দেখিতেছি, তাহা নয়। এ যাত্রা জীবনটা কোনরূপে বাঁচিয়া গেলেই বুঝিব, এই সাংঘাতিক তসবীরের মূল্য আমি যেন শোধ করিয়াছি।

গুলসানা, ভূমিতে বসিয়া নতজানু হইয়া, যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "ভারত-সম্রাট্‌"! অমি আপনার নিকট যে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। আমার প্রতিহিংসার সাধ মিটিয়াছে, অত্যাচারের বিচার পাইয়াছি। খোদা আপনাকে মহা মহীয়ান করুন! এখন এ দাসীর কাতর প্রার্থনা, এই বন্দী ইস্কান্দার খাঁকে মুক্তিদান করুন।"

আকবরশাহ, কঠোর বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"দিল্লীর বাদসাহের দণ্ডাজ্ঞা ফিরিবার নয়। রাজদণ্ড ও রাজাদেশ ক্রীড়ার জিনিষ নয়। বিচারগৃহ নাট্যশালা নয়। গুলসানা! তুমি আমার অন্তঃপুরে যাও। সেখানে তুমি বাদ্‌শা-বেগমের মহলে রাজরাণীর আদরে থাকিবে। এ সব বন্দোবস্ত আমি পূর্ব্বেই করিয়া দিয়াছি। যথাসময়ে আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব।"

বাদ্‌শাহের আদেশে, গুলসানা বিনা বাক্য-ব্যয়ে, মলিনমুখে, সে স্থান ত্যাগ করিল। সম্রাটের প্রহরীরা আমায় কারাগারে লইয়া গেল। আমার পরম সৌভাগ্য, যে তাহারা আমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিল না।

কারাকক্ষ মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার। সে হৃদয়স্তম্ভনকারী তামসরাশি, যেন মৃত্যু বিভীষিকা লইয়া আমার চারিধার বেষ্টন করিল।

এই অব্যাহত অন্ধকার ও নির্জ্জনতা ক্রমশঃ আমার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমাকে তোমরা হত্যা কর কিন্তু এ ভাবে যন্ত্রণা দিও না। আমি জীবন চাহি না, জীবনের এ বিজাতীয় কষ্ট চাহি না—চাই মৃত্যু! আমায় মৃত্যু দাও।"

এক কারাপ্রহরী সেই অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রূক্ষকণ্ঠে বলিল—"বন্দী! তোমার জন্য দানাপানি রাখিয়া গেলাম। ক্ষুধা পাইলে খাইও। নিকটেই এক পর্ণ-শয্যা আছে, তদুপরি রাত্রি যাপন করিও।"

আমি বলিলাম—"প্রহরী এখন রাত্রি কত?

প্রহরী বলিল—"এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। তোমার সহিত বেশী কথা কহিবার হুকুম নাই। আমি চলিলাম।"

হায়! আমার অদৃষ্টে এতও ছিল। আমি তখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম, সম্রাটের অনুরাগ ও বিরাগের মধ্যে কত প্রভেদ। আমিই না সেই রণজয়ী সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁ, যাহাকে দেখিলে লোকে আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিত। আমিই না বাদশাহের সেই সম্মানিত সেনাপতি,

যাহাকে দেখিলে, প্রহরীরা অস্ত্র নোয়াইয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইত। হায়! কি কঠোর ভাগ্য পরিবর্ত্তন! ক্ষুধার জ্বালায় আহার করিতে ইচ্ছা হইল বটে, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। যদি বাদশাহের আদেশে আমার খাদ্য মধ্যে বিষ দেওয়া হইয়া থাকে! গুপ্তভাবে বিষ প্রয়োগে রাজ বন্দীর জীবননাশ ত মোগল কারাগারের নূতন ঘটনা নয়! খাদ্য পড়িয়া রহিল। অন্ধকারে হস্ত প্রসারণ করিয়া, শয্যা খুঁজিয়া লইলাম। সে শয্যা—নামে শয্যা। কয়েক আঁটি বিচালি—আর একটী মোটা কাপড়ের ময়লা বালিস। গৃহের সেই দুগ্ধ-ফেণনিভ, ইস্তাম্বুল গন্ধ বাসিত, সুখময় কোমল শয্যা মনে পড়িল। আমি মনে মনে গুলসানাকে শত শত অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম।

শয্যা—যেন রাশিকৃত কণ্টকে সমাচ্ছন্ন। সহস্র ক্ষুধিত বৃশ্চিক, কে যেন সেই ক্ষুদ্র পর্ণ-শয্যায় ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার নিদ্রা হইল না। অনন্যোপায় হইয়া, আমি সেই প্রস্তরমণ্ডিত নগ্ন মেঝের উপর, ক্লান্ত দেহ রক্ষা করিলাম। হায়! তবুও শান্তি সহচরী নিদ্রা আমায় কৃপা করিল না।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। সহসা সেই নির্জ্জন কারা-কক্ষের নিকট, অতি সাবধানন্যস্ত পদশব্দ পাইলাম। মনে ভাবিলাম—এইবার আমার সব শেষ হইবে। নিশ্চয়ই বাদশাহের আদেশে, সেই প্রতিশোধ-পরায়ণা গুলসানার উত্তেজনায়, কোন গুপ্তঘাতক আমায় হত্যা করিতে আসিতেছে। তখনই আমি ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার দক্ষিণ হস্ত, আত্মরক্ষার্থে মুষ্টিবদ্ধ হইল। অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিলাম—"খোদা! খোদা! আমায় গুপ্ত ঘাতকের হাত হইতে রক্ষা কর।"

সেই অপরিচিত মূর্ত্তি অতি ধীরে ধীরে, কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—"বন্দী! সত্যই খোদা তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।"

আমি সাগ্রহে সোৎসুকে বলিয়া উঠিলাম—"কে তুমি? কে তুমি দয়াবান? খোদার প্রতিনিধি রূপে আজ আমায় বাঁচাইতে আসিয়াছ?"

সে বলিল—"ইস্কান্দার খাঁ! এক পতি-প্রেমাধিনী রমণীকে অকাল-বৈধব্যে ফেলিয়া তুমি যে মহাপাপ করিয়াছ,—তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় তো শেষ হইয়াছে। আমিই তোমাকে কারামুক্ত করিতে আসিয়াছি।"

এ কণ্ঠস্বর যে আমার পরিচিত! যে গুলসানা ইতিপূর্ব্বে বাদশাহের নিকট বিচারপ্রার্থিনী হইয়া, আমার এই কারাবাস ঘটাইয়াছে, সে আমায় এ ভাবে উদ্ধার করিতে আসিল কেন? তবে কি, সে মনে মনে, আমায় ভালবাসে? না—না, আমি মহা মূর্খ! ঘোর উন্মাদ!

গুলসানা যেন, কি এক অমানুষী শক্তিবলে আমার মনের কথা বুঝিতে পারিল। সে কঠোর বিদ্রুপের সহিত বলিল,—"ইস্কান্দার! তুমি একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসে ভাবিতেছ, আমি মনে মনে হয়তো তোমায় ভাল বাসিয়াছি! কিন্তু তা নয়, কোন লোকের উপর না বুঝিয়া অত্যাচার করিলে, পরে তাহার জন্য একটা সহানুভূতি যেমন স্বতঃই দেখা দেয়—সেই হিসাবে আমিও তোমার জন্য কাতর হইয়াছি। যদি এখনও তোমার মনে এরূপ কোন ধারণা থাকে, তাহা হইলে তাহা জন্মের মত ভুলিয়া যাও। আমি দারুণ মনস্তাপজনিত উত্তেজনা বশে, প্রতিশোধপরায়ণা হইয়া, বাদশাহের নিকট তোমার বিরুদ্ধে আরজী করিয়া, তোমার এই কারাবাস ঘটাইয়াছিলাম। আমার প্রতিহিংসার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছে। আমার স্বামীর মৃতদেহের প্রতি তুমি যে সম্মান দেখাইয়াছ, যেরূপ সমাদরে সেই দেহ এই রাজধানীতে আনিয়াছিলে, তোমার হৃদয়ের সেই মহত্বের জন্যই, তোমাকে একটু কৃতজ্ঞতা দেখাইতে আসিয়াছি। বৃথা বিলম্ব করিও না তুমি। প্রহরীরা আজ আমার অর্থে বশীভূত। দেরী করিলে—আমরা দুই জনেই ধরা পড়িব।"

গুলসানার কথায় আমার ভ্রম ভাঙ্গিল। এই ভীষণ কারাগার হইতে উদ্ধার পাওয়াই, তখন আমার একমাত্র কামনা। কাজেই বিনা বাক্য-ব্যয়ে, আমি গুলসানার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম।

আমি না—যুদ্ধজয়ী, বীর ধর্ম্মাশ্রয়ী সৈনিক ? এত কাপুরুষ আমি, যে রমণীর অঞ্চলাশ্রয়ে, আজ আমাকে গোপনে পলাইতে হইল! কিন্তু কি করিব ? কোন উপায়ই যে নাই!

কেহই আমাদের বাধা দিল না। এক গুপ্ত দ্বার দিয়া যমুনা তীরে আসিয়া দেখিলাম, সেখানে একখানি নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে। গুলসানা আমাকে বলিল—"অই নৌকায় উঠ গিয়া। আমি নৌকা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি। কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে গুলসানা ?

গুলসানা। আমিও আর একখানি নৌকায় অন্যত্র যাইব। তোমার নৌকা চলিয়া গেলে, সেখানি আসিবে।

আমি। আমার সঙ্গে এস না কেন গুলসানা ?

গুলসানা। না—তুমি এখনও তোমার প্রবৃত্তিকে দমন করিতে শিখ নাই! এত শাস্তিতেও তোমার মন হইতে আমার রূপের স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই।

গুলসানার ইঙ্গিতে, মাঝিরা নৌকা ছাড়িল। সহসা নৌকার মধ্যে, কি একটা গুরু দ্রব্য পতনের শব্দ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেটী তুলিয়া লইলাম।

গুলসানা, ঠিক সেই সময়ে নদীতীর হইতে বলিল—"নিরাশ্রয় অর্থহীন তুমি। কিছু পাথেয় দিয়াছি। দয়া করিয়া রাখিয়া দাও।"

অন্ধকারে—আমার নৌকা ভাসিয়া চলিল। আমি গুলসানার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ! তার পর আমার ভাগ্যে কি ঘটিল, এই পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে পাঠক দেখিতে পাইবেন।

[ঋণ-পরিশোধ]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(ইস্কান্দার খাঁর কথা)

ভাগ্যতাড়নায় গভীর নিশীথে, এক ভগ্ন মস্‌জীদের সোপানোপরি উপবিষ্ট, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হতভাগ্য—আমি।

সহসা সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, কে যেন ভীমকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"পাষণ্ড! তোর এই কাজ! বিশ্বাসঘাতক! শয়তান!"

তাহার উত্তরে আর একজন রুষ্টস্বরে গর্জ্জিয়া বলিল—"আমার পক্ষে আজ মহা সুযোগ। হয়—আত্‌মাদ খাঁর জীবনবায়ু কালতরঙ্গে বিলীন হইবে, না হয়—মালবের সিংহাসন শূন্য হইবে। সকলেই দেখিবে, কল্যকার প্রভাতে, বাজ্‌ বাবাহাদুরের নাম এই বিস্তীর্ণ মালবরাজ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে!"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার ধমনীতে আবার উষ্ণ শোণিতের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। আমার কটিতে কোষনিবদ্ধ অসি ছিল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, দুইজন লোক সেই স্বল্পান্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। একজন অপরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, তরবারি তুলিয়াছে। বিস্ময়ের কথা এই, এই আক্রমণকারীর প্রতিদ্বন্দী একেবারে অস্ত্রহীন।

অস্ত্রহীন ব্যক্তি বলিল, "আত্‌মাদ খাঁ! রাজবংশে জন্মিয়া, অত নীচ হইও না। বীর হইয়া, অতটা কাপুরুষ হইও না। যদি বীরোচিত সাহস থাকে, আমাকে একটা অস্ত্র দাও—"

আত্‌মাদ খাঁ বলিল—"তুমি যখন আমার অস্ত্রহীন পিতার বক্ষে সুতীক্ষ্ণ অসি বিদ্ধ করিয়াছিলে, তখন কি তাঁহাকে অস্ত্রগ্রহণের অবসর দিয়া

ছিলে? পিতৃঘাতকের প্রতি আমি কোন করুণাই প্রকাশ করিব না!" এই কথা বলিয়াই, সে তরবারি খুলিয়া আততায়ীর বক্ষ লক্ষ্য করিল।

আমি তখনই ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া, আত্মাদের উপর পড়িলাম। সে আমার টাল রাখিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে, তাহার অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া, পূর্ব্বকথিত অস্ত্রহীন যোদ্ধার দিকে নিক্ষেপ করিলাম। তিনি চকিত মধ্যে তাহা কুড়াইয়া লইলেন। আমি ভূপতিত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু সে মহা বিপদ দেখিয়া, দ্রুতপদে পলাইয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশাইল।

উপকৃত ব্যক্তি, আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ধন্য সেই মহিমান্বিত খোদা—যিনি আজ আপনাকে আমার উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়াছেন! বন্ধো! বল কে তুমি? আজ মালবেশ্বরকে তুমি যে দুশ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ করিলে, তাহা অপরিশোধনীয়!"

আমি তৎক্ষণাৎ ভূমিতে বসিয়া, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিলাম—"জাঁহাপনা! মালবেশ্বর! যোদ্ধৃবীরের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিয়াছি। রাজরক্তে এই শান্তিময় ধরাবক্ষ কলঙ্কিত হইত! ঘটনাস্রোতে পড়িয়া, উপলক্ষ্যরূপে আমি তাহার প্রতিকার করিয়াছি!"

মালবেশ্বর আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "যাঁহার জন্য আমি জীবন ফিরিয়া পাইলাম, তাঁহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে পারি না। আজ আপনি আমার মাননীয় অতিথি।"

আমি বিনয়নম্র বচনে উত্তর করিলাম—"জাঁহাপনা! অধমের প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শনের জন্য, এ বান্দা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছে। জাঁহাপনার আদেশলঙ্ঘনে এ গোলাম সাহস করে না।"

সুতরাং সেই নৈশান্ধকার মথিত করিয়া, অগত্যা আমরা ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তাতেই বিভোর চিত্ত। আমার

অগ্রবর্ত্তী মালবেশ্বরও বাক্যহীন। বুঝিলাম—তিনিও অতীত ঘটনাবলীর আলোচনায় আত্মবিস্মৃত। এই ভাবে আমরা বহুক্ষণ ধরিয়া পথ চলিলাম।

দূর হইতেই মালব রাজপ্রাসাদ কক্ষের উজ্জ্বল আলোক, আমার চক্ষুগোচর হইল। এত রাত্রে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, মালবেশ্বর কেন সেই নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছিলেন, তখন সেই কথাই কেবল মনে হইতে লাগিল।

ছদ্মবেশী মালবাধিপতিকে দেখিয়াই, প্রহরী অস্ত্র নোয়াইয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। মালবেশ্বর আমাকে লইয়া, পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া খুবই মোহিত হইলাম।

মালবেশ্বর একটী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"মহাত্মন! এই সুসজ্জিত কক্ষ, আপনার বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজনী দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ। আমি ও আপনি উভয়েই শ্রান্ত। রাত্রে আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, আমার এই বান্দারা সমস্ত যোগাইয়া দিবে। নিজের বাটী মনে করিয়া, এ গরীব-খানায় রাত্রি যাপন করিলে বাধিত হইব। আর যতক্ষণ না আপনার আহারাদি শেষ হইবে, ততক্ষণ আমি নিজে উপস্থিত থাকিয়া আপনার খিজ্‌মত খাটিব।"

এ উদারতায় আমি বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"জনাবালি! আপনাকে এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। আপনার ন্যায় রাজ্যে-শ্বরের এতটা অনুগ্রহের যোগ্য আমি নহি।" আমার একান্ত নির্ব্বন্ধ দেখিয়া, তিনি অগত্যা সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

রৌপ্য-ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল আনিয়া, বান্দারা আমার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিল। মুসাফেরের পোষাকটী খুলিয়া লইয়া, আমাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে শোভিত করিল। নানাবিধ সুপাচ্য খাদ্য-সম্ভারে, আহার স্থান সজ্জিত করিল। মনে ভাবিলাম, ইহাকেই বলে অদৃষ্টের কূট প্রহেলিকা।

রাত্রে নিদ্রা হইল না। রজনীর শেষ যাম পর্য্যন্ত, অতীত ও বর্ত্তমানের

চিন্তায় কাটিল। ভাবিলাম--সত্যই মানুষের ভাগ্য, শরতের মেঘের মত খুবই পরিবর্ত্তনশীল। আমার ঘটনাময় জীবনে এ সত্য যতটা পরিস্ফুট হইয়াছে, এরূপ ত্বরিত পরিবর্ত্তন খুব কম লোকের অদৃষ্টেই দেখিয়াছি। রমণীর রূপমোহে পড়িলে, মানুষের যে কত লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে, তাহা আমি নিজের জীবনের অতীত ঘটনা পরম্পরায় বেশ বুঝিয়াছি।

আকবর বাদশাহের মন্সবদার—আমি! এ পদবী দুই মাস পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু এখন নাই। আজ ভাগ্য চক্রনেমি নিপীড়নে, আমি পথের ভিক্ষুক।

আমার আগরায় ফিরিবার আর কোন উপায়ই নাই। পলায়িত হতভাগ্য বন্দী আমি। ধৃত হইলেই সম্রাটের আদেশে হয় হস্তী-পদতলে, না হয় সর্পদংশনে, আমার প্রাণদণ্ড ঘটিবে। নবীন যৌবনে, এত আশা, আনন্দ, উদ্যম, উৎসাহ লইয়া ত আমি মরিতে পারিব না। কাজেই কাপুরুষের মত পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম।

দরবেশের বেশে, কতশত গ্রাম, নগর, প্রান্তর, উপত্যকা অতিক্রম করিয়া অবশেষে এই মালব দেশে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মনের বিশ্বাস এই, মালব স্বাধীন রাজ্য, এখানে হয়ত বিরূপ অদৃষ্ট আমার প্রতি পুনরায় প্রসন্ন হইতে পারে।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবামাত্রই দেখিলাম, দুই জন বাঁদী আমার প্রাতঃকৃত্যের জন্য, রৌপ্যভৃঙ্গারপূর্ণ কর্পূরবাসিত শীতল বারি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পর মুহূর্ত্তেই, আর দুই জন বাঁদী আমার প্রাতরাশের জন্য, সোণার পেয়ালা ভরা কাফি ও রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত কয়েক প্রকার পিষ্টক লইয়া উপস্থিত হইল। তখন গ্রীষ্মকাল। এজন্য বাঁদীরা আমার মুখ প্রক্ষালনের জন্য তুষারবারি আনিয়াছিল। দুইজন পাখা লইয়া, আমায় ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল।

আমি প্রফুল্লচিত্তে, সেই কাফি ও পিষ্টকগুলির কিয়দংশ খাইলাম।

মনে মনে একটু হাসিয়া লইলাম। ভাবিলাম—দিল্লীশ্বর আকবরশাহ কর্ত্তৃক দণ্ডিত রাজবন্দী—না আমি? তাই কি ঘটনাবশে আজ অন্য রাজগৃহে, আমার এত আদর অভ্যর্থনা! মনে মনে বলিলাম—"ভাগ্য! যত পার ছলনা কর! জানিও, এখন হইতে আমি আর কোনরূপ সুখ-দুঃখে বিচলিত হইব না।"

এমন সময়ে, একজন খোজা আসিয়া আমার হস্তে এক খণ্ড পত্র দিল। সেই পত্র পাঠে বুঝিলাম, মালবেশ্বর আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমি খোজার সহিত তাঁহার দরবার-গৃহে উপস্থিত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠিক—দরবার-গৃহ নয়। মালবেশ্বর বাজ্‌বাহাদুর এক নির্জ্জন কক্ষে চিন্তামগ্ন ভাবে উপবিষ্ট। দুইজন ভীমকায় খোজা, উন্মুক্ত শাণিত কৃপাণ হস্তে, তাঁহার দুই দিকে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চারি জন সুন্দরী ক্রীতদাসী, তাঁহাকে ধীরে ধীরে চামর-ব্যজন করিতেছে। আমি তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া, সসম্ভ্রমে কুর্ণীস করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম।

দেখিলাম, বাজ-বাহাদুরের মুখে পূর্ব্ব রজনীর সেই প্রসন্নভাব নাই। সেই স্বভাবগম্ভীর তেজদীপ্ত বদনে, যেন একটা আতঙ্কসৃষ্টিকারী গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িয়াছে। যাঁহার অসিবলে, মালব আজও স্বাধীনভাবে থাকিয়া, মোগল রাজ-পতাকার অধীনতা স্বীকার করে নাই, যিনি পূর্ব্ব রজনীতে আমাকে তাঁহার জীবনরক্ষক ভাবিয়া অতটা সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মিত্রোচিত যত্নে, অতিথিরূপে, সুহৃদরূপে গৃহে আনিয়াছিলেন, নিজে আমার খিজ্‌মত খাটিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার আজ এ ভাব-বৈষম্য কেন? আমি এ গভীর রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া, আবার

তাঁহাকে একটি কুর্ণীস করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম; না জানি অদৃষ্টচক্র আবার কি একটা নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিবে ?

আমি আশঙ্কা ও সন্দেহচকিত। সেই দরবার কক্ষ শব্দশূন্য। সহসা সেই মর্ম্মরকক্ষে এক গম্ভীর ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—"মুসাফের !"

আমি সসম্ভ্রমে কুর্ণীস করিয়া বলিলাম—"হুকুম তামিলদার আমি। জাঁহাপনার কি হুকুম ?"

বাজবাহাদুর, আমার অবস্থা দেখিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আকবরশাহের সেনাপতিরা, যে সর্ব্ববিধ অবস্থারই দাসত্ব স্বীকার করিতে পারেন, তাহা আপনাকে দেখিয়াই বুঝিতেছি।"

আমি মালবেশ্বরের এ অর্থপূর্ণ মন্তব্যে চমকিত হইয়া উঠিলাম। আমি যে দিল্লীশ্বরের সেনাপতি, এ কথা উনি জনিলেন কি রূপে ? বিস্ময়, উৎকণ্ঠা, আবেগ, আমার কণ্ঠ শুষ্ক করিতে লাগিল। আমি কাতরস্বরে, বিহ্বল ভাবে বলিলাম—"জাঁহাপনা ! আপনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। আমি এখন আর দিল্লীশ্বরের সেনানী নহি।"

মালবেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—"এখন না হইতে পারেন। কিন্তু এক মাস আগে আপনি তাঁহার সেনাপতি ছিলেন তো ! এখন আপনি না হয় একজন পলায়িত বন্দী।"

এ কথায় আমি আরও ভীত হইলাম। মালবেশ্বর কি তবে লোকের মুখভাব দেখিয়া, তাহার মনের কথা জানিতে পারেন ? জিন্-পরীর প্রভাবে আজন্ম আমার যথেষ্ট বিশ্বাস ! তবে কি মালবপতি বাজ্ বাহাদুর, কোনরূপ গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত—যাহার সহায়তায় তিনি আমার পূর্ব্বাবস্থা জানিয়াছেন !

আমাকে মুগ্ধ ও বিহ্বলচিত্ত দেখিয়া, মালবেশ্বর বলিলেন—"ইস্কান্দার খাঁ ! তুমি বীরপ্রবর সোহানীর সর্ব্বনাশ করিয়াছ, আর এখন বুঝিতেছি, আমারও সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছ ! গত রাত্রে তুমি আমার জীবন

রক্ষা করিয়াছিলে— সত্য। তোমার শৌর্য্য-বীর্য্য-মণ্ডিত, সৈনিক-হৃদয়ই সেই উদ্ধার সংকল্পের নিয়ন্তা। কিন্তু তুমি যদি আগে কোনরূপে জানিতে পারিতে, যে আমি মালবেশ্বর বাজবাহাদুর"—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"জনাবালি! এ গোলামের গোস্তাখি মাফ্ হয়। বান্দা আপনাকে মালবেশ্বর জানিয়াই, আপনার বহুমূল্য জীবন রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল।"

মালবেশ্বর বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"প্রমাণ?"

আমি উত্তেজিত ভাবে বলিলাম—"প্রমাণ আমার কথা! দোহাই খোদার! আপনি যাহা সন্দেহ করিতেছেন, আমি তাহা নই। দিল্লীশ্বর আকবরশাহের সহিত, এখন আমার কোন সম্পর্কই নাই! আমি রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত, কারা-পলায়িত বন্দী। যদি দৈব প্রেরিতা হইয়া গুলসানা এখনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়—"

বাজবাহাদুর, গুলসানার নাম শুনিয়া, চমকিত হইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"গুলসানা! সোহানীর পত্নী!"

আমি বলিলাম—জাঁহাপনার অনুমান যথার্থ।

বাজ্‌বাহাদুর। বলিতে পার—সে রমণীরত্ন এখন কোথায়?

আমি। তা জানি না জনাব! তিনিই আমাকে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার জন্যই বাদশাহের জহ্লাদের শাণিত কৃপাণমুখ হইতে, এ জীবন বাঁচিয়া গিয়াছে।

মালবেশ্বর বিস্মিতমুখে আবার বলিলেন—"গুলসানা! সোহানীর শৌর্য্যময়ী পত্নী! সে তোমার কে?"

"কেউ নয়, যদি কিছু সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে সে আমার মহা দুষ্‌মন্!"

"দুষ্‌মন্? তবুও সে তোমাকে কারামুক্ত করিল?"

"সে অনেক কথা! প্রয়োজন হইলে, এ বান্দা সময়ান্তরে হুজুরালিকে সে সকল গূহ্য কথা শুনাইবে।"

"গুলসানা এখন কোথায়, বলিতে পার?"

"না—তবে অনুমানে যতদূর বুঝিতেছি, সে সম্ভবতঃ আগরায়!"

"আকবর বাদশাহের রঙ্গমহালে?"

"সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু জাঁহাপনা! গুলসানা, আত্মসম্মানের মর্য্যাদা খুবই জানে।"

"তা আমি জানি। তাহার সহিত তোমার কত দিনের আলাপ?"

"মাত্র এক রাত্রের চোখের দেখা। তাহাতেই সে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

"বুঝিয়াছি! তুমি তাহার রূপে মোহিত হইয়া, নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছ! তাহার স্বামী সোহানী কি এখন তোমাদের মোগল-বাদশাহের বন্দী?"

"না—সোহানী অপঘাতে মরিয়াছে!"

"আত্মহত্যা?"

"প্রাণভয়ে আত্মহত্যা, বীরশ্রেষ্ঠ সোহানীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে পলাইবার সময় উপত্যকামধ্যে সহসা পদস্খলন হওয়ায়, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

"তুমি স্বচক্ষে সোহানীর মৃত্যু দেখিয়াছ?"

"হাঁ, আমিই তাঁহাকে—"

"বল—বল, চুপ করিলে কেন?"

"আমায় মার্জ্জনা করুন—জাঁহাপনা! বেশী বলিতে আমি অনিচ্ছুক।"

"জানিও ইস্কান্দার খাঁ! মালবেশ্বর বাজ্‌বাহাদুর তাঁহার স্বাধীন রাজ্যে, তোমার আকবর বাদশাহের মত সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যাহা জানিতে চান, তাহা না বলিলে তোমায় দণ্ডিত হইতে হইবে।"

"তা জানি। কিন্তু যে অধম, আপনার বহুমূল্য জীবনরক্ষার উপলক্ষ্য-স্বরূপ, তাহাকে যে আপনি নিগৃহীত করিবেন, ইহাও সম্ভবপর নয়।

মালবেশ্বর প্রসন্নমুখে বলিলেন—"যুবক! মালবেশ্বর বাজবাহাদুরকে তুমি এত নীচ ভাবিও না, যে তিনি প্রত্যুপকারের ঋণ, এইরূপেই পরিশোধ করেন। গতরাত্রে তুমি যখন বেশ পরিবর্ত্তন কর, তখন এই কাগজ খানি, তোমার বক্ষচ্যুত হইয়া নীচে পড়িয়া যায়। একজন বাঁদী, তাহা কুড়াইয়া লইয়া, আমার প্রধান খোজাকে দেখায়। খোজা সেই কাগজ খানি আমাকে দেয়। সেই পত্র খণ্ড হইতেই, আমি জানিতে পারিয়াছি, যে তুমি দিল্লীশ্বরের দণ্ডিত সেনাপতি—ইস্কান্দার খাঁ।"

"গুলসানাকে আমি খুব ভাল চিনি। এক সময়ে তাহার অপ্সরোপম সৌন্দর্য্যে-বিমোহিত হইয়া, আমিই তাহার হস্ত-প্রার্থী হই। কিন্তু গর্ব্বিতা গুলসানা, আমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্যেশ্বরের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া, সেই বর্ব্বর সোহানীকে পতিত্বে বরণ করে। এই জন্যই তোমার মুখে গুলসানার নাম শুনিয়া আমি একটু বিচলিত হইয়াছিলাম। এই জন্যই আমি আগ্রহবশে, তোমাকে সোহানীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

"তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, সে কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য। আজ হইতে সেইজন্য আমি তোমাকে পঞ্চশতী মনসব প্রদান করিলাম। আমার হারেমের প্রধানরক্ষক রূপে, তুমি এই রাজ-সংসারে কার্য্য করিবে। প্রায় একমাস হইল, আমায় হারেমের অধ্যক্ষ-সেনাপতির মৃত্যু হইয়াছে। আমি তোমায় এখন সেই পদই দিতেছি। যে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে আমার অন্তঃপুর রক্ষা কার্য্যে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই নাই। কেবল এই টুকু মনে রাখিও, আমি তোমাকে এক অতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দিলাম।"

আমি বাজবাহাদুরের এই অস্বাভাবিক উদারতায়, তাঁহার গুণবিমুগ্ধ

হইয়া পড়িলাম। তাঁহার প্রদত্ত, এই অযাচিত সম্মান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। উপকার করিয়া প্রত্যুপকার প্রার্থনা করা, আমার মতে নীতি-বিগর্হিত। কিন্তু আমি চিরদিনই ঘটনা-চক্রের দাস। যে অদৃষ্ট, আজ আমাকে এই পর্ব্বত-মণ্ডিত সুদূর মালবে টানিয়া আনিয়াছে, সে যে এরূপ একটা নূতন ও অসম্ভব পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

মালবেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিলেন—ইস্কান্দার খাঁ! যে কঠোর কর্ত্তব্য-ভার আমি তোমায় এইমাত্র প্রদান করিলাম, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিও। আমার আরও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী আছে, যাহাদিগকে আমি এ দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাদের উপেক্ষা করিয়া, কেবলমাত্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাবশেই, তোমাকে এই গৌরবান্বিত পদ প্রদান করিয়াছি। মানুষ নিজেই তাহার শত্রু, এই কথা মনে রাখিয়া কর্ত্তব্যপালন করিবে!"

মালবেশ্বর এই কথা বলিয়া, সহসা সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। সেই কক্ষমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্মিতচিত্তে নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া, আমাকে কুর্ণীস করিয়া বলিল—"ইস্কান্দার খাঁ সাহেব! আজ হইতে আপনি আমাদের প্রধান সেনাপতি। জাঁহাপনার আদেশে, আপনাকে আপনার নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আমি আসিয়াছি। আমার সঙ্গে আসুন।" আমি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ সেই রাজকর্ম্মচারীর অনুসরণ করিলাম।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, সুবেশা বাঁদীগণ আমাকে অভ্যর্থনা করিল। মনে ভাবিলাম, গতরাত্রে ঠিক এই সময়ে, আমি আশ্রয়হীন অবস্থায় রাজপথে বেড়াইতেছিলাম, অদৃষ্টচক্র আজ সেই দুঃখের মহাগহ্বর হইতে তুলিয়া আনিয়া এক অচিন্তিত সৌভাগ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এখন আমি এক স্বাধীনরাজ্যে, এক স্বাধীন নরপতির অন্তঃপুররক্ষক। পদমর্য্যাদার উপযুক্ত সজ্জায় আমার বাস কক্ষ সুসজ্জিত। চারিজন বাঁদী,

দুইজন বান্দা, আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। এলবাব্, আস্‌বাব, পোষাক পরিচ্ছদ, শিরোপা, আসরূফি, সবই আবার হইল, কিন্তু অতীত জীবনের দুঃখের স্মৃতি ত লোপ হইল না। স্নেহময়ী জন্মভূমি আগরাকে ভুলিতে পারিলাম না। সেই সুন্দরীললামভূতা, গরীয়সী গুলসানা, যাহার সাহায্যে কারামুক্ত হইয়া, আজ আমার এ সৌভাগ্যোদয়, জানি না—সেই বা এখন কোথায় ?

আমার উপরিতন কর্ম্মচারি, ইব্রাহিম খাঁ, আমার নম্র ব্যবহারে বড়ই খুস্‌মেজাজ্। মালবেশ্বরের বাজ্‌বাহাদুরের সহিত, প্রায়ই আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার সহিত, আমার সঙ্গে কথোপকথন করেন।

নূতন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, আমি কয়েক দিন সহর দেখিতে যাইতে পারি নাই। অপরাহ্নে আমার প্রায়ই অবকাশ থাকে। একদিন এ ইচ্ছার প্রাবল্য দমন করিতে না পারিয়া, সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সহরে যাইবার পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, যে ইব্রাহিম সাহেবকে সঙ্গে লই। কিন্তু নিজের সুখের জন্য, তাঁহাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলাম না। এজন্য সন্ধ্যার অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, একাকী প্রাসাদের বাহির হইলাম। জনপূর্ণ রাজবর্ত্মের মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম, পথিপার্শ্বস্থ এক দ্বিতল কক্ষ, রমণী কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত ঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

কি সুমিষ্ট গান! কি সুন্দর কণ্ঠ! সে গাহিতেছিল—

মুস্‌কিল্‌কা ইস্ দুনিয়ামে ভাই, রাখো ধরম কি নিশান।
আখের হোয়েগা, সব ছুটেগা, হিঁয়া মায়া মোকান্ ঘর্ বনা
ধরম্‌কো দিল্‌মে রাখো করম, প্রেম্‌সে করো ভাই দিল্ নরম
আগে চলো ভাই, পিছু নাহি রহো, সব সে হো যাও সিয়ানা।
বান্দাবাঁদী আমির ফকির, কাজি হাজি ঔর রাজা উজীর
সব কোহি ভাই পেয়ার করো—মরণ কো নেহি ঠিকানা।

একবার, দুইবার, তিনবার, এই সঙ্গীতের আবৃত্তি হইল। তবুও যেন ইহার নূতনত্ব ও মধুরতা ছুটিতে চায় না। গান থামিয়া গেল, সেই কক্ষ নিস্তব্ধ হইল, প্রতিধ্বনির বিরাম হইল, তবু যেন স্বপ্ন ছুটিতে চায় না! সুর গিয়াছে—প্রতিধ্বনি আছে। প্রাণ গিয়াছে—স্মৃতি আছে। আশা গিয়াছে—আনন্দ আছে! মধুরতার বিরাম হইয়াছে, তবুও যেন চির আরাম তথায় ক্রীড়া করিতেছে!

অনেক রাহি লোক এই গান শুনিবার জন্য, পথিপার্শ্বে, একত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গীতের বিরামে সকলেই যেন নিরাশ চিত্তে নানা দিকে চলিয়া গেল। অনুসন্ধানে জানিলাম, দৌলতাবাদ সহর হইতে দুইজন ভজন-গায়িকা আসিয়াছে, তাহারাই নিত্য সন্ধ্যার সময়, এই ভাবে বিধাতার মহিমা সংকীর্ত্তন করে।

এই সময়ে সহসা আমার মনে এক দুষ্কর কল্পনা জাগিয়া উঠিল। ইব্রাহিম সাহেব প্রায়ই বলিতেন, এক দিন আমাকে মীনা-মসজেদ দেখাইয়া আনিবেন। এই মীনা-মস্‌জেদ, বাজ্-বাহাদুরের মহিষী রূপমতী বেগমের গরীয়সী কীর্ত্তি। সহস্র দীপের আলোকে, তাহার বড়ই সুন্দর শোভা হয়।

আমি মীনা-মস্‌জেদ দেখিবার জন্য, দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে,—আর একটু আগে। পরিশেষে এই নামজাদা মস্‌জেদ পাইলাম।

কি সুন্দর কারুকার্য্য ইহার। বহির্দ্দেশ,—পালিসকরা দর্পণলাঞ্ছিত মর্ম্মরে নির্ম্মিত। ভিতরে অতি সুন্দর মীনার কাজ! আগরার অনেক মস্‌জেদ দেখিয়াছি। দিল্লীতে অনেক আমীর ওমরাহের কারুকার্য্যময় গৃহকক্ষ দেখিয়াছি, কিন্তু কলাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এমন বুঝি আর কিছুই হইবে না।

আমি অসংখ্য আলোক সমুজ্জ্বল সেই মস্‌জেদের অভ্যন্তরে গিয়া, নামাজ

করিলাম। অশান্ত প্রাণ যেন একটা অপার্থিব শান্তিতে বিভোর হইল। যখন শুনিলাম, রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন আর বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না। কারণ রাজপুরী রক্ষার দারুণ কর্ত্তব্যভার তখন আমারই স্কন্ধে অর্পিত।

একা ও তাঞ্জামের অনেক সন্ধান করিলাম। ভাগ্যদোষে একখানিও মিলিল না! অগত্যা সেই জনশূন্য অংশে দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দূর এই ভাবে অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে এক মমতাহীন বজ্রকঠিন হস্ত, আমার কোমল গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিল। পশ্চাৎ হইতে এরূপ জোরে ধাক্কা দিল, যে আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

আর একজন লোক, সহসা সেই অন্ধকার মধ্য হইতে আসিয়া ক্ষিপ্রগতিতে আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। তৃতীয় ব্যক্তি আমার কোষ হইতে অসি খুলিয়া লইল।

আমি প্রথমে ভাবিলাম—দস্যু। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন যখন বলিল,—"হতভাগ্য শয়তান! সে দিন আতমাদখাঁর সংকল্প বিফল করিয়াছিলি। বাজ্-বাহাদুরের জীবন রক্ষা করিয়া বাহাদুরী লইয়াছিলি। আজ তোকে রক্ষা করে কে?"

মুহূর্ত্তমধ্যে আমি সব কথা বুঝিতে পারিলাম। আমি যে ইহাদের সমবেত চেষ্টায় ইতিপূর্ব্বেই অস্ত্রহীন হইয়াছি, তাহাও জানি। আমি বলিলাম—"আতমাদ খাঁ! তুমি বীরত্বাভিমানী। আমায় ছাড়িয়া দাও—অস্ত্র দাও। বীরের মত কার্য্য কর।"

আতমাদ খাঁ বলিল—"তোকে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু একটী করারে। তুই মুসলমান। সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালার পবিত্র নামে শপথ করিয়া বল্, আমাদের সহায়তা করিবি।"

আমি বলিলাম—"বল, কিসে তোমাদের কাজে লাগিতে পারি?"

আতমাদ খাঁ দম্ভভরে বলিল—"সে দিন যাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলি, আমাদের নিয়োজিত গুপ্ত-ঘাতক রূপে, যদি তাহার প্রাণের রুধির আনিয়া দিতে পারিস্—"

এ কথা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল। আমি তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পারিলাম না। তাহার নীচাশয় সঙ্গীদ্বয়, সেই অবসরে আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল।

দুরাচার আতমাদ খাঁ দম্ভভরে বলিল—"এখনও আল্লার নামে শপথ করিয়া বল্। নচেৎ তোর জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন।"

আমি ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলাম—"তুই অতি নরাধম! খোদার নাম অতি পবিত্র। সে পবিত্র নাম, এ সব নীচ কাজের সম্পর্কে উচ্চারিত হইতে পারে না। প্রাণ অতি তুচ্ছ! কাপুরুষ—কুক্কুরাধম তুই! তাই একথা বলিতেছিস্।"

ক্রুদ্ধ আতমাদ খাঁ, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার বক্ষস্থল হইতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া, আমার বক্ষোপরি আঘাত করিল! আমি তখনই চেতনা হারাইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহত হইবার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে, আমার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে। চক্ষু চাহিয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময় শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। এক সুসজ্জিত কক্ষে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায়—আমি শুইয়া। সে কক্ষের সজ্জা, রাজকক্ষের মত।

আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধ যেন কাহাকে লক্ষ্য

করিয়া আশাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—“মা! আর কোন ভয় নাই। আমার রাত্রিব্যাপী পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। খোদা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। মুসাফের বোধ হয়, এ যাত্রা জীবন ফিরিয়া পাইল।”

আমি বৃদ্ধের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধানে, গৃহকক্ষের চারিদিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম,—আমার পাদমূলে বসিয়া এক পরমা সুন্দরী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রমণী।

আমার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইয়ামাত্র, সেই রমণী তাঁহার কমনীয় মুখমণ্ডল পূর্ণভাবে অবগুণ্ঠনাবৃত করিলেন। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—“তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই—হকিম সাহেব?”

হকিম সাহেব, শিরঃ-সঞ্চালনে জানাইলেন ভয়ের, কোন কারণ নাই। পরে ধীরভাবে বলিলেন—“যে দাওয়া দিয়াছি, তাহাই এখন চলুক। প্রয়োজন হইলে আবার আমায় ডাকিবেন।”

হকিম চলিয়া গেলেন। সেই সুন্দরীও ছায়ার মত তাহার পশ্চাৎ-বর্ত্তিনী হইল। সেই কক্ষ মধ্যে রহিলাম, একা আমি।

একি স্বপ্ন? কে এ? কঠোর ভাগ্যবিতাড়িত, মুসাফেরের প্রাণ রক্ষার জন্য, কে এত আয়াস স্বীকার করিতেছে? শুনিয়াছি, দেবলোকের অপ্সরারা, কোন কোন অভাগাকে বিপন্ন দেখিয়া দয়া করিয়া আশ্রয় দেন। ইনি কি তাহাদেরই একজন?

আমার চিন্তা-স্রোত ছিন্ন হইতে না হইতে, বিস্ময়প্লাবিত হৃদয়ের উত্তেজনা কমিতে না কমিতে, দুইজন বাঁদী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের মুখও অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত।

তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া বলিল,—“সাহেব! গৃহস্বামিনীর আদেশে, আমরা আপনার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি। আপনি এই সরবৎটা পান করুন। ইহাতে জরুর আপনার শরীরে শক্তি-সঞ্চার হইবে।”

আমি ধীরভাবে বলিলাম—"এ হতভাগ্য মুসাফেরের ছার জীবন যাঁহার চেষ্টায় বাঁচিয়া গেল, তাঁহার নাম জানিতে পারি কি ?"

বাঁদী বলিল—"সে কথা বলিতে এখন নিষেধ আছে।"

আমি। তাহা হইলে আমি সরবৎ খাইব না।

বাঁদী। এইরূপ অবাধ্যতার দ্বারাই কি আপনি আমার স্বামিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চাহেন ?

এ তীব্র তিরস্কারে আমি খুবই লজ্জিত হইলাম। বলিলাম—"না—না কোন কথাই আমি জানিতে চাহি না। কৃতঘ্নতা কি, তাহা যেন কখনও জানিতে না হয়।

জানি না—সরবতের মধ্যে কি ছিল। আমি প্রাণে যেন একটা নূতন শক্তি পাইলাম। তখন আর শায়িতাবস্থা ভাল লাগিতেছিল না। উঠিয়া বসিবার জন্য একটু চেষ্টা করিলাম।

যে বাঁদী আমায় সরবৎ দিয়াছিল, সে তড়িদ্বেগে আমার কাছে আসিয়া বলিল,—"করিতেছেন কি জনাব ? হকিম সাহেব আপনাকে ঐ ভাবেই থাকিতে বলিয়াছেন। খোদা আপনার সহায়, কারণ শত্রুর ছুরিকা আপনার বক্ষে বিদ্ধ না হইয়া, স্কন্ধ-পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়াছিল।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"আঘাত কি কি খুব গুরুতর হইয়াছিল ?"

বাঁদী বলিল—"তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু উঠিবার চেষ্টা করিলে পুনরায় রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে। অনেক কষ্টে শোণিতপাত বন্ধ হইয়াছে।"

আমি আর বেশী কথা বলিতে পারিলাম না। ঔষধের গুণে, তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

অক্লান্ত সেবা ও হকিমের দাওয়াইয়ের গুণে ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিলাম। কিন্তু এ অবস্থায় বেশী দিন থাকিতেও ইচ্ছা নাই। এক ঘেয়ে নির্জনতা, যেন দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রহেলিকা যেন আরও

ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। যে আমাকে আশ্রয় দিয়াছে, নিশ্চয়ই সে দেবদূতী। মাতার স্নেহ, ভগিনীর যত্ন, কিছুরই ত অভাব নাই। এক ভাগ্য-বিতাড়িত, পথি-নিক্ষিপ্ত, গুপ্তহন্তার অস্ত্রনিপীড়িত, হতভাগ্য পথিকের প্রতি কেন তার এত অসম্ভব যত্ন? স্থির করিলাম, যেরূপে পারি, এ রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করিব।

গভীরা রজনী। তজ্জন্য শ্যামাঞ্চলা নৈশপ্রকৃতি পূর্ণভাবে নিস্তব্ধ। আমার আবাস কক্ষে, জনপ্রাণীও নাই। শয্যা ত্যাগ করিয়া অতি ধীরে কক্ষদ্বার খুলিয়া আমি বাহিরে আসিলাম। কিন্তু কি যেন একটা অজানা ভয়ে আমার প্রাণের ভিতর মৃদুকম্পন উপস্থিত হইল।

সম্মুখেই উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত মর্ম্মর-মণ্ডিত, এক সুপ্রশস্ত বারান্দা। বারান্দা নিম্নে সমতল ভূমির উপর, বহুদূর বিস্তৃত শোভনোদ্যান। সেই উদ্যানে, স্তবকে স্তবকে সুগন্ধি নৈশ-কুসুম ফুটিয়া, প্রকৃতি-বক্ষবাহিত মলয়ার ক্ষীণ দেহ, সুবাসসিক্ত করিতেছে।

আমি ধীরগতিতে, বারান্দার শেষ প্রান্তে আসিলাম। এস্থান হইতে আর একটী ক্ষুদ্র সোপান বরাবর নিম্নতলে নামিয়া গিয়াছে। নীচে আসিয়া দেখিলাম, সোপানমুখে দাঁড়াইয়া এক অনিন্দ্য-সুন্দরী।

তাহার লাবণ্য-প্রোজ্জ্বল শুভ্র মুখে, বিমল চন্দ্রকিরণ পড়িয়া, বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই রত্নখচিত বহুমূল্য সূক্ষ্ম দেহবাসের উপর, মণি-খচিত ফিরোজা ওড়নার উপর, অফুরন্ত চন্দ্রকিরণ যেন রজতধারার মত গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, সেই অনুপম অপ্সর-কান্তি নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, হয়ত এ সুন্দর প্রতিমা প্রাণহীনা! তাহা না হইলে ইহাতে কোনরূপ স্পন্দন নাই কেন?

এ ভাবে দেখা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া, কক্ষের দিকে ফিরিলাম। পশ্চাৎ ফিরিবার সময় আমার চলিবার দোষে একটু পদশব্দ হইল। গভীর

কাননপথবিহারিণী মৃগী, নির্জ্জন বনভূমি মধ্যে, কোন শব্দ শুনিয়া চকিত নেত্রে যেমন পশ্চাতে চাহিয়া দেখে, সেই সুন্দরী কোন্ দিক হইতে শব্দটা আসিল, ঠিক ধরিতে না পারিয়া, একটু ভয়চকিত ভাবে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, সেই স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর অতি ধীরে ধীরে, সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, আমার বাঁদী আমাকে শয্যায় না দেখিয়া, ক্ষিপ্র-গতিতে, চিন্তিত ভাবে বারান্দার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পদ শব্দ পাইয়াই, বাঁদী ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"জনাব! আপনাকে নিদ্রিত দেখিয়া আমি আহার করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখি, আপনি শয্যায় নাই। এজন্য আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছিল। জানেন ত একটা দায়িত্ব লইয়া আমরা কাজ করি!"

এ কথার প্রকৃত উত্তর দিতে গেলে, আমিই ধরা পড়ি! কাজেই কপটতাশ্রয়ে বলিলাম—"উষ্ণ শয্যা আর ভাল লাগিতেছিল না। বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল, তাই বাহিরের পুষ্পগন্ধ-বাসিত শীতল হাওয়ায় একটু শান্তিলাভ করিতে গিয়াছিলাম।"

বাঁদী বলিল—"তাই হউক! খোদা আপনার মঙ্গল করুন।"

আমি বলিলাম—"বাঁদী! তোমার প্রভুকে বলিও, তিনি যে এ হতভাগ্যের প্রতি এত যত্ন করিলেন, অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় আমার প্রাণদান করিলেন, এজন্য খোদা তাঁহাকে চিরসুখী করুন। আর তাঁহাকে বলিও, আমি কাল প্রত্যুষেই এ স্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় পাইলে বড়ই সুখী হইব।"

বাঁদী বলিল—"জনাবের যেমন মর্জ্জি। কাল প্রভাতেই তাঁহাকে আপনার কথা জানাইব।"

আমি পুনরায় শয্যা আশ্রয় করিলাম। বাঁদী পার্শ্বের কক্ষে গিয়া শয়ন করিল। অনুমানে বুঝিলাম, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। রজনীর একটী অর্দ্ধ যাম কাল শয্যায় শুইয়া, চোখ বুজিয়া রহিলাম। মনে মনে কেবল আলোচনা করিতে লাগিলাম, কে এ অতুলনীয়া সুন্দরী! ইনিই কি সেই দেবী, যিনি দয়া করিয়া আমাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছেন?

পরদিন লোকলোচন তপন, শ্যামল ধরাবক্ষে স্বর্ণবৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে বাঁদী আসিয়া বলিল—"জনাব! আমাদের কর্ত্রীকে আপনার কথাগুলি বলিয়াছিলাম। তিনি আপনাকে একখানি পত্র ও এই ক্ষুদ্র থলিয়াটি উপহার দিয়াছেন। আপনার জন্য অশ্বও প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। এ গুলি না লইলে, তিনি বড়ই মনোকষ্ট পাইবেন।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"পত্র কোথায়?"

বাঁদী। ঐ থলিয়ার মধ্যেই আছে।

দেখিলাম, থলিয়ার মুখ শীলমোহর করা। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি দেখিয়া, বাঁদী বলিল—"আমার প্রভুর অভিলাষ, এ বাটীর বাহিরে গিয়া, আপনি এই পত্রখানি পাঠ করিবেন। বিবির এ সামান্য অনুরোধটী রক্ষা না করিলে তাঁহার অপমান করা হইবে।"

আমি অগত্যা পূর্ব্বপরিহিত পরিচ্ছদে, সেই কক্ষের বাহির হইলাম। বাঁদীকে পুরস্কার স্বরূপ কিছু অর্থ দিতে গেলাম—কিন্তু সে লইল না।

মনে ভাবিলাম, যাহা কিছু ঘটিয়া গেল—সবই যেন স্বপ্ন! গত রাত্রে সোপান পার্শ্বে চন্দ্র-কিরণ-মণ্ডিতা যে সুন্দরীকে দেখিয়াছি—তাহাও কি অলীক স্বপ্ন? দেখিতেছি, দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মধ্যে পড়িয়া, আজীবন কষ্ট পাওয়াই আমার ভাগ্যলিপি!

আর চিন্তার সময় নাই। অশ্বপালক আসিয়া বলিল—"প্রভু! আমি

আপনার অপেক্ষায় সজ্জিত অশ্ব লইয়া দাঁড়াইয়া আছি।" আমি বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কশাঘাত করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কঠোর দুঃখের মধ্যেও যে সুখ থাকে, পর্ব্বতের পাষাণময় আবরণের মধ্যেও, যে সুমিষ্ট প্রস্রবণ-ধারা থাকে, তাহা আমি কয়েক দিবসের ঘটনায় বেশ বুঝিয়াছি। কাজেই অত দুঃখের মধ্যেও, মাত্র সুখের স্মৃতিটুকু লইয়া, আবার আমি মালব রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম জড়প্রকৃতি সেইরূপ স্থির, শান্ত ও সুনির্ম্মল। কিন্তু আমার মন যেন দাবানলের জ্বালাপূর্ণ। হায়! সব যায়—স্মৃতি কি যায় না?

ইব্রাহিম সাহেব আমায় সহসা ফিরিতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। আমার হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে, তিনি ও তাঁহার প্রভু মালবেশ্বর, বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। আমার অনুসন্ধানের জন্য, তাঁহারা সম্ভবমত যাহা করিতে পারেন, সেরূপ কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি হয় নাই।

আমি আত্‌মাদ-খাঁর আক্রমণ-ঘটিত সমস্ত ব্যাপার ইব্রাহিম সাহেবকে খুলিয়া বলিলে, তাঁহার বিস্ময় কতক পরিমাণে অপনীত হইল বটে, কিন্তু আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছি, তাহা জানিবার জন্য, তিনি বড়ই সমুৎসুক হইলেন। ব্যাপারটা, গোপনে রাখিবার জন্য, আমি প্রকৃত ঘটনাটী একটু উলট্‌-পালট্‌ করিয়া বলিলাম। ইব্রাহিম সাহেব যে আমার এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না, তাহাও বুঝিলাম।

অবসর মত, মালবেশ্বরের সহিত নির্জ্জনে দেখা করিলাম। তাঁহার নিকট সেদিন রাত্রের ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তাঁহারই হিতসাধন করিতে গিয়া, আমার জীবন যে পুনরায় বিপন্ন হইয়াছিল, ইহা শুনিয়া

তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। তৎপরদিনই রাজবিদ্রোহী আত্‌মাদ খাঁকে ধরিয়া আনিবার জন্য রাজাদেশ ঘোষণা হইল। আর তখনকার মত আমার জীবনের গুপ্ত ঘটনাবলীর উপর, একটা বিস্মৃতির যবনিকা পড়িয়া গেল।

দুই দিন কাটিয়া গেল। আমি তখন মালবেশ্বরের রাজপুরীর প্রধান রক্ষক। নানা গোলযোগে, সেই থলিয়া ও তন্মধ্যস্থ পত্রের কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বিতীয় নিশায়, পত্রের কথা মনে পড়িল। থলিয়া খুলিয়া পত্র খানি বাহির করিলাম। সেই পত্রে লেখা ছিল,—

সহৃদয় মুসাফের! আমার বাঁদীর মুখে শুনিলাম, আপনি কল্য প্রত্যুষে চলিয়া যাইবেন। আর আমি আপনাকে বাধা দিতে পারি না। ধরিয়া রাখিলে হয়তো আপনার কার্য্যক্ষতি সম্ভাবনা। যদি সে দিন "নীলঝরণা" হইতে ফিরিতে আমার বিলম্ব না হইত, তাহা হইলে হয়ত, আপনার জীবন রক্ষা করিতে পারিতাম না। আমার শরীর-রক্ষীরা, আপনাকে পথিমধ্যে ভূপতিত দেখিতে পাইয়া আমায় সংবাদ দেয়। আপনাকে আহত ও বিপন্ন দেখিয়া রমণী-স্বভাব-সিদ্ধ করুণাবশে, আপনাকে আমার গৃহে আনিয়া কর্ত্তব্যবোধে শুশ্রূষা করি। আপনি এখন এ অধিনীর সেবায় রোগমুক্ত হইয়াছেন। আমার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। খোদার দুনিয়ায় অনেক লোক আছে। সকলকে না হয় নাই জানিলেন? আর সকলকে জানিতে গেলেই বা সময়ে কুলায় কই? যাহা হউক, আপনারা কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও আকৃতি দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, আপনি সদ্বংশজাত সৈনিকপুরুষ। আপনার পাথেয় স্বরূপ, যৎকিঞ্চিৎ এই থলিয়ার মধ্যে দিলাম। ইহা স্নেহের চিহ্ন—সহানুভূতির চিহ্ন। দানের শক্তি খোদা আমায় দেন নাই। এ অবলার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। "রুবিয়া"

রুবিয়া! রুবিয়া! কি সুন্দর নাম! পত্রখানির আদ্যোপান্ত কি একটা অনাবিল সৌজন্যতায় পূর্ণ! কে এ স্বর্গ বিহারিণী দেবী—যে মর্ত্ত্যের জীবকে কেবল দয়া করিতে, এই নির্ম্মম ধরণীতে আসিয়াছে। সেই অনিন্দ্যসুন্দরী, যাহাকে আমি বারান্দার সোপান-পার্শ্বে দেখিয়াছিলাম, তিনিই কি এই রুবিয়া? তিনিই কি এই পত্রের লেখিকা?

নিভৃতে বসিয়া কল্পনার সাহায্যে, সেই বিরল নৈশান্ধকারে বারাণ্ডায় দৃষ্ট মূর্ত্তির অনুকরণে, মনোমধ্যে রুবিয়ার এক সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিলাম। সে চিত্র অতি উজ্জ্বল—অতি মধুর। কল্পনাসুন্দরী অঙ্গুলী হেলনে যেন দেখাইয়া দিল—"এই সেই—যে তোমাকে বাঁচাইয়াছে!"

ইব্রাহিম সাহেব একদিন আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, যে, অন্তঃপুরের একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত, আমার যাইবার অধিকার আছে। এত দিন পর্য্যন্ত সেই সীমাটী কেবল দূর হইতেই দেখিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কাছে যাই নাই। সেই সীমা মালবপ্রাসাদের বহিরাংশ। তাহার পর হইতেই সমুন্নত, গগনস্পর্শী, পাষাণপ্রাচীরবেষ্টিত, বাজ্‌বাহাদুরের রঙ্গমহাল আরম্ভ। শুনিয়াছিলাম—এই রঙ্গমহালে তাঁহার পত্নী দেশবিশ্রুত সৌন্দর্য্যশালিনী, রূপমতী বেগম বাস করেন।

রাত্রি দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ প্রায়। সহসা অন্তঃপুরের এক প্রকোষ্ঠ হইতে, প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতোচ্ছ্বাস আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিল। আমি সেই সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া, ধীরপদে অগ্রসর হইলাম। কি এক অজানিত মন্ত্রশক্তিবলে, সেই মধুময় কাকলী, আমাকে সুদৃঢ় মোহকীলকে আবদ্ধ করিল।

আমি রাজোদ্যানস্থিত এক মর্ম্মরাসনে বসিয়া, বাতায়ন-পথ নিঃসৃত কমনীয় সঙ্গীত-সুধা-ধারা, অবাধে পান করিতে লাগিলাম। গানের কথা, অনেক স্থলে স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও, তাহার সুরের তীব্র মদিরায় বিভোর চিত্ত হইয়া উঠিলাম। কতক্ষণ এরূপ বিমুগ্ধ অবস্থায় ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

যে কক্ষ হইতে সঙ্গীতধারা নিঃসৃত হইতেছিল, সে কক্ষটী সমুজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত। দেখিলাম, এক কমনীয় রমণীমূর্ত্তি, ধীরে ধীরে কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মূর্ত্তির মুখে, উজ্জ্বল

দীপালোক পড়িয়াছে। নীলঝরণা রাজপ্রাসাদে যে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এ যেন তাহারই প্রতিচ্ছায়া। সহসা সে মূর্ত্তি, বাতায়ন-পথ হইতে সরিয়া গেল। আর আমিও প্রাণের উদ্বেলিত আবেগ সংযত করিতে না পারিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলাম—"রুবিয়া! দেবী! তুমি? তুমি ওখানে কেন?"

ইহার অল্পক্ষণ পরে, এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী, দ্রুতপদে আমার কাছে আসিয়া, সহসা তাহার মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিল। সে যেন বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—"সাহেব! আপনার সাহস ত কম নয়! জানেন আপনি রুবিয়া বেগম কে? শাহাজাদী রুবিয়ার নামোচ্চারণ করিয়া, এই মাত্র আপনি কি বলিতেছিলেন?"

আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। কথাটা শুনিয়া ভয়ে হৃৎকম্প হইল। রুবিয়া কি শাহাজাদী? কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে ত আমি বড়ই মূর্খের মত কাজ করিয়াছি। সামলাইয়া লইয়া সপ্রতিভভাবে বলিলাম, "বিবি সাহেব! তোমার বোধ হয় শুনিতে ভুল হইয়াছে।"

যে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, সে একজন তাতারী। তীক্ষ্ণধার আয়ুধভূষিতা তাতারীরাই রাজান্তঃপুরের রক্ষক। রঙ্গমহাল, বেগমদের ক্ষুদ্র-রাজ্য। এ রাজ্যে ইহারাই সর্ব্বকর্ত্তৃত্বময়ী। স্বভাবতঃই ইহারা অতি উগ্র-প্রকৃতি এবং অপরাধীর প্রতি কখনই মার্জ্জনাশীল নহে। রমণী হইয়াও ইহারা এত নিষ্ঠুর, যে সে কঠোর নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনিলে, পুরুষের প্রাণও ভয়ে শিহরিয়া উঠে। তাতারণী ব্যঙ্গচ্ছলে বলিল—"আমার হয়ত শুনিতে ভুল হইয়াছে, কিন্তু আমার প্রভু কন্যার ত ভ্রম হইতে পারে না। তিনিই ত আমাকে তাঁহার নামোচ্চারণকারীর সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন।"

আমি সোৎসুকে বলিলাম, "যদি তাহাই হয়, তাহাহইলে এ অপরাধের কি মার্জ্জনা নাই?"

তাতারণী বলিল—"আছে, কিন্তু সেটা বিচারকর্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অগ্রে পরিচয় দিন, কে আপনি ?"

আমি তখন যেন অমানিশার অন্ধকার মধ্যে একটু বিদ্যুৎচ্ছটা দেখিতে পাইলাম। সাগ্রহে বলিলাম, "আমি মালবেশ্বরের নব-নিযুক্ত পুরীরক্ষক সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁ।

তাতারণী, কঠোর হাস্যের সহিত বলিল—"তাজ্জব কথা বটে! বাজ্-বাহাদুরের গোলাম হইয়া, আপনার এই ধৃষ্টতা ? আপনি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। ধরিতে গেলে, তাঁহার কন্যার নামোচ্চারণ করিয়া, আপনি প্রকারান্তরে মালবের বাদশার অবমাননা করিয়াছেন।"

আমি এ কথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। ধীরভাবে বলিলাম, শাহাজাদী কি আমাকে ক্ষমা করিবেন না ?

"বোধ হয় নয়!"

"তাহা হইলে উপায় ?"

"রাজদণ্ডে অতি শোচনীয় মৃত্যু! রঙ্গমহালের উদ্যানে, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। পুরীরক্ষক সেনাপতি হইয়া, এ সোজা কথা যে আপনি জানেন না, ইহাই অতি তাজ্জব!"

"আমি ত মহালের ভিতরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করি নাই।"

"তা না করিলেও আপনি মালবাধীশ্বরের কন্যার নামোচ্চারণ করিয়া অপরাধী হইয়াছেন।"

"শাহাজাদীকে বলিও, তিনি সে দিন যে মুসাফেরের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে মূর্ত্তিময়ী করুণাময়ী দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই এই অপরাধ করিয়াছে। যে প্রাণ তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সে প্রাণের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আধিপত্য। আমি তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য হাসিতে হাসিতে মরিতে পারি।"

তাতারণী বলিল—"শাহাজাদীকে এ সব কথা যথাসময়ে জানাইব। কাল আপনি ঠিক এই সময়ে এই স্থানে আসিবেন। আপনাকে এ সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিব।"

সেই তাতার-রমণী সম্মুখে একটু অগ্রসর হইয়া, উদ্যানস্থ প্রাচীর গাত্রের এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রেতযোনির মত সহসা অদৃশ্য হইল। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেইখানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে নিজকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মুখ ফুটিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, মনের কথা বলিবার উপায় নাই, পরামর্শ চাহিবার পথ নাই। ইব্রাহিম সাহেবকে ডাকিয়াও যে একটা উপায় করিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই। নিজে ইচ্ছা করিয়া, পতঙ্গের মত জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছি। ইব্রাহিমের সাধ্য কি যে, আমায় প্রচণ্ড রাজ-রোষ হইতে রক্ষা করেন! দেখিতেছি, খোদার করুণা ভিন্ন, আমার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই!

নির্জ্জনকক্ষে, মর্ম্মর-খচিত মেঝের উপর বসিয়া, যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে বলিলাম—"ইয়ে মেরে খোদা! ইয়ে দীন্ ছুনিয়ার মালিক! ইয়ে মেহেরবান্! এবার আমার প্রাণ রক্ষা কর। আমার সুনাম ও ইজ্জত রক্ষা কর।"

উন্মত্তের মত, চঞ্চলপ্রাণে শয়ন কক্ষের দিকে ধাবিত হইলাম। অশান্তি-পূর্ণ বিকলহৃদয়ে, আবার সেই জ্বালাময় শয্যা আশ্রয় করিলাম। কক্ষ মধ্যস্থ তীব্র আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিলাম। বাতায়নগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। চন্দ্রালোক, আমার কক্ষতলের শ্বেতমর্ম্মরের

উপর, শুভ্র-শয্যার, উপর, শুভ্রবস্ত্রমণ্ডিত গাত্রের উপর, অজস্র রজতধারার সৃষ্টি করিল। আমি ক্লান্ত দেহে, বিষণ্ণ মনে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হায়! হায়! নিদ্রাতেও কি আমার নিস্তার নাই, চিন্তার বিরাম নাই, হা-হুতাশের অবসর নাই, অবসন্নতার বিলোপ নাই, মর্ম্মজ্বালার শান্তি নাই। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপতলে, জ্যোতির্ম্ময় স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সিংহাসনের উপর বসিয়া এক বিদ্যুৎ বর্ণা, তীব্র কটাক্ষশালিনী, নারী মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি রুবিয়ার! শাণিত কৃপাণ হস্তে, ভীমকায়া তাতার-নারীগণ, সিংহাসনের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। আমি যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, বন্দীরূপে, সেই সিংহাসনাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপিণী, রুবিয়ার সম্মুখে দণ্ডায়মান। রুবিয়া যেন গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "এই বন্দী—পিশাচ! পাষণ্ড! রমণীলোলুপ! তোমরা এখনই ইহার হৃৎপিণ্ডচ্ছেদ কর। সে আজ্ঞা পালন করিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন শত শত শাণিত কৃপাণ, ঝকমক করিয়া উঠিল। তখনই যেন সে আজ্ঞা পালিত হইল। উষ্ণ রুধির-স্রোতে, যেন সে স্বর্ণ-সিংহাসনের তলদেশস্থ সুনীল মখমল আস্তরণ, লোহিতবর্ণ হইয়া গেল।

হায়! হায়! যাতনার কি শেষ নাই। জাগরণে নিদ্রায়, সকল অবস্থাতেই এ হতভাগ্যের সমান কষ্ট। যখন প্রভাত হইল তখন দেখি, প্রধান বান্দা আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে—"জনাব! প্রভাত হইয়াছে। কাল রাত্রে কিছুই আহার করেন নাই। সুগন্ধি কাফি ও সুমিষ্ট পিষ্টক প্রস্তুত। শয্যা ত্যাগ করুন।"

আমি মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়া, শয্যা ত্যাগ করিলাম। বুঝিলাম, রজনীর সে বিকট স্বপ্ন মিথ্যা হইয়াছে। গতরাত্রে দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া, বারিবিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করি নাই। সুতরাং প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া লইয়া কিছু আহার করিয়া এক সুখাসনে উপবিষ্ট হইলাম। সহসা

শয্যার উপাধানের দিকে, আমার দৃষ্টি নিপতিত হইল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, উপাধান নিম্নে একখানা রক্তবর্ণ কাগজ রহিয়াছে। সেখানি খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে :—

"প্রতিশ্রুতি মত, আপনি রাত্রি দশটার সময় সেই মর্ম্মরবেদীর নিকটেই থাকিবেন। আপনাকে শাহাজাদীর আজ্ঞা জ্ঞাপন করা যাইবে। এ উপদেশ অবমাননা করিলে, জানিবেন, এ কথা মালবেশ্বরের কাণে পৌঁছিবে। তখন হয়তো আপনার জীবন রক্ষা করা ভার হইবে।"

অদ্ভুত পত্র! ইহার লেখক যে কে, তাহার কোন পরিচয়ই নাই। বিস্ময়ের বিষয়—এই নামশূন্য পত্র, আমার অবরুদ্ধ কক্ষে, উপাধানের নীচে আসিলই বা কিরূপে? তবে কি আমি, মনের উত্তেজনায়, কাল রাত্রিকালে কক্ষদ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়াছিলাম?

যাহা হউক, এই পত্র-নির্দ্দিষ্ট উপদেশানুসারে আমি রাত্রির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য যে, ইব্রাহিম সাহেব সে দিন আর আমার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই। মালবেশ্বর বাজ্ বাহাদুরও আমাকে সেদিন দরবারে তলব করেন নাই।

আমার অভীপ্সিত রক্তরাগময়ী সন্ধ্যা, যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। অন্ধকারের প্রারম্ভেই, আমি গুপ্তদ্বার দিয়া মহলের বাহির হইয়া গেলাম। প্রহরাধিক রাত্রির পর, পুরীমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলাম। আমার বান্দার নিকট জানিলাম, তখন পর্য্যন্ত কেহ আমার সন্ধান করে নাই।

রাত্রি দশটা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষায়, পত্রোল্লিখিত সেই মর্ম্মর আসনে বসিয়া আছি। কই? কেহই ত সেখানে আসিল না! তবে কি শাহাজাদী আমায় মার্জ্জনা করিয়াছেন? তবে কি ব্যাপারটা সহজেই মিটিয়া গিয়াছে? এ চিন্তায়, প্রাণে অনেকটা সাহস ও শান্তি আসিল। আমি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম।

এই সময়ে সহসা এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী, ধীরে ধীরে আমার নিকট

আসিয়া দাঁড়াইল। অতি কোমল স্বরে বলিল—"সাহেব! আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

আমি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ তাহার অনুসরণ করিলাম। সে আমাকে অন্তঃপুর প্রাচীর গাত্র-সংলগ্ন একটী লৌহময় ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট লইয়া গেল। তাহার চাবি—তাহারই কাছে ছিল। সে বিনা বাক্যব্যয়ে, সেই লৌহদ্বার খুলিয়া বলিল—"আমার সঙ্গে রঙ্গমহালের ভিতরে আসুন।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, এমন সময়ে সেই রমণী যেন তীব্র বিদ্রূপের সহিত বলিল, "আপনি না সৈনিক পুরুষ? আপনি না বীর? একটা রমণীর সঙ্গে আসিতে এত ভয় পাইতেছেন কেন?"

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি, অন্ধকে যেমন টানিয়া লইয়া যায়, প্রবল স্রোত যেমন তৃণকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, ভাগ্যকে যেমন কর্ম্মফল আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, আমিও সেইরূপ, বিদ্রূপ বাণ-জর্জ্জরিত হইয়া অপূর্ব্ব পরিদৃষ্টা এই তাতারীর পশ্চাতে, চুম্বকাকর্ষিত লৌহের ন্যায় চলিলাম।

মহলের চারিদিকে ভীমকায় খোজাগণ, শাণিত ছুরিকা হস্তে পাহারা দিতেছে। খিলান-নিম্নস্থ, প্রজ্বলিত আলোকচ্ছটায়, তাহার ছোরার শাণিত ফলকগুলি চক্‌মক্ করিতেছে। নিষ্ঠুরতা-অঙ্কিত, তাহাদের সেই কৃষ্ণবর্ণ মুখে, সুতীব্র আলোকচ্ছটা পড়ায়, তাহা আরও ভীষণ দেখাইতেছে। আমার সঙ্গিনী তাতারী, প্রত্যেক প্রধান খোজাকে এক খানি সাংকেতিক পাঞ্জা দেখাইয়া, মহলের প্রধান ঘাটি গুলি পার হইয়া গেল।

তার পর সে সহসা একস্থানে দাঁড়াইয়া, তাহার বক্ষ-নিহিত ছুরিকা বাহির করিল। এ ব্যাপার দেখিয়া, আমি বীরপুরুষ হইয়াও, ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। অপ্রত্যাশিত বিপদাশঙ্কায়, হৃদয় অধীর হইল। মনে মনে ভাবিলাম, তবে কি ইহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিবার জন্য, আমায় এ নির্জ্জন স্থানে আনিয়াছে?

চতুরা তাতারী বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝিতে পারিল। সে রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"সাহেব!"

"কেন সাহেবা?"

"আপনি কত দিন হইতে লড়াই করিতেছেন?"

"যত দিন হইতে তরবারি ধরিতে শিখিয়াছি।"

"দেখিয়া ত বোধ হয় না।"

"কেন?"

"আমার হাতে ছোরা দেখিয়া, আপনি শিহরিয়া উঠিলেন যে? আপনার মুখ অত মলিন হইল কেন?"

বুঝিলাম, তাতারী সেই উজ্জ্বল আলোকে আমার ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে। এত সতর্ক না হইলে, তাহারা বাদশার রঙ্গমহলে পাহারা দিতে নিযুক্ত হইবে কেন?

তাতারী বলিল—"আপনি কোথায় আসিয়াছেন, কিছু বুঝিলেন কি?"

আমি তীব্র বিদ্রূপের সহিত বলিলাম—"বোধ হয় কোন গুপ্ত বধ্যভূমিতে।"

তাতারী এ কথায় হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসির প্রবল তরঙ্গে, সেই নির্জ্জন স্থান যেন বিকট প্রতিধ্বনি পরিকম্পিত হইল।

আমি বলিলাম—"হাসিলে কেন সাহেবা?"

"আপনার অবস্থা দেখিয়া।"

"আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

"রঙ্গমহালের ভিতরে।"

"রঙ্গমহাল বাদশার অন্তঃপুর। শুনিয়াছি, রঙ্গমহালে পুরুষের প্রবেশ একেবারেই নিষেধ।"

"অপরাধীর পক্ষে নহে। বিশেষতঃ যাহাদের বিচার, বাদশাবেগম বা শাহাজাদীরা নিজে করেন।"

"আমি কি তবে মৃত্যুর জন্যই রঙ্গমহলের মধ্যে যাইতেছি?"

"বিচার ফল না দেখিয়া কি করিয়া বলিব?"

"যদি তোমার সঙ্গে না যাই—"

"তাহা হইলে, আমি আপনাকে যাওয়াইতে বাধ্য করিব। আমরা কেবল হুকুমের নফর।"

"আমার বক্ষমধ্যেও ছুরিকা আছে। আর আমার এ সবল হস্ত অস্ত্রধারণে এখনও শক্তিহীন হয় নাই।"

"বাদশার রঙ্গমহাল, অকারণ অস্ত্রক্রীড়ার স্থান নয় সাহেব! এখানে এক বিন্দু রক্তপাত হইলে, বাদশা আপনাকে মাটীতে জীবন্ত প্রোথিত করিবেন। আর সাধ্য কি—আপনার, যে আপনি এখানে অস্ত্র ব্যবহার করেন। দেখিতে চান—এখানে আপনার প্রকৃত অবস্থা কি?"

এই কথা বলিয়া, সেই ভীমকায় তাতারী, তৎক্ষণাৎ অতি একটা তীব্র শিশ্ দিল। মুহুর্ত্তমধ্যে, পঁচিশ জন ভীমকায় খোজা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের সকলেরই হাতে, উন্মুক্ত শাণিত ছুরিকা।

খোজার সর্দ্দার, সেই তাতারণীকে সেলাম করিয়া বলিল—"কি হুকুম মা?"

আমি সেই ভীমকায় খোজাদের, যেন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রবৎ বোধ করিলাম। ভয়ে আমার মুখ শুকাইল! প্রাণ কাঁপিল! বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তাতারী আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সর্দ্দার খোজাকে বলিল,—"শাহাজাদীর হুকুম, আর এক ঘণ্টা পরে, রঙ্গমহালের সমস্ত দরওয়াজা বন্ধ হইবে।"

প্রধান খোজা একটা সেলাম করিয়া, "যো-হুকুম" বলিয়া তখনই

সেখান হইতে দলবল লইয়া চলিয়া গেল। যেন কতকগুলা কালিমা-মণ্ডিত ভীষণ প্রেত-মূর্ত্তি, অন্ধকারের কোল হইতে উঠিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে ছায়ার মত আবার অন্ধকারে মিশাইল। আমি মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

তাতারী, এবার প্রসন্ন মুখে বলিল—"সাহেব! যখন আপনি লড়াই করিয়া থাকেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার সাহস আছে!"

"স্বীকার করিয়া লইতেছি।"

"এই বার আপনার চোখ্ বাঁধিব।"

"কেন?"

"কারণ, এবার আপনাকে রঙ্গমহালের ভিতরে যাইতে হইবে।"

"সেখানে ত শাহাজাদীরা থাকেন—বেগমেরা থাকেন!"

"থাকিলেই বা! এই মাত্র বলিয়াছি, আপনার বিচার ত তাঁহারাই করিবেন।"

"তাহা হইলে আমার চোখ্ বাঁধিয়া দাও!"

"আপনার তরবারি ও ছুরিকা আমায় দিন!"

"কেন?"

"রঙ্গমহালের ভিতর সশস্ত্র যাওয়া নিষেধ!"

"কার হুকুমে?"

"মালবের বাদশার।"

"তাঁহার হুকুম মান্য করিতে আমি বাধ্য।"

এই বলিয়া সেই তাতারীকে আমি আমার অসি ও ছুরিকা খুলিয়া দিলাম। তাতারী এক খণ্ড লোহিত বর্ণের রেশমী রুমালে আমার চোখ বাঁধিল। তার পর দৃঢ় স্বরে বলিল—"আমার হাত ধরুন।"

আমার আবদ্ধ চক্ষু, তখন দর্শন শক্তি-বিহীন। অগত্যা আমি

তাহার হাত ধরিলাম। সে যেন আমায় চুম্বকের মত টানিয়া লইয়া চলিল।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে যাওয়ার পর, এক স্থানে গিয়া সে আমার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল। সেখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইল। যেন প্রেতপুরী ত্যাগ করিয়া, আমি প্রদীপ্ত আলোকোজ্জ্বল চির-সুগন্ধ-পরিপূর্ণ, মধুর সঙ্গীতভরা, বেহেস্তেই আসিয়াছি। আমি আবেগভরে, মহা বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"ইয়ে মেরে মেহেরবান্ খোদা! এ সব কি? আমি কোথায় আসিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কি দেখিলাম! তোমরা শুনিবে কি? যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিতে আমার ভাষায় আসিবে না, শক্তিতে কুলাইবে না।

বেহেস্তের কথা কেতাবে পড়িয়াছি। কিন্তু চোখে কখনও বেহেস্ত দেখি নাই। আজ দেখিলাম। যাহা কল্পনা ছিল, স্বপ্নের সুকৃষ্ণ যবনিকায় আবরিত ছিল, আজ তাহা প্রত্যক্ষ হইল।

আমি দেখিলাম, শত সহস্র আলোকোজ্জ্বল এক কক্ষে, সেই তাতারী আমায় পৌঁছিয়া দিয়া গিয়াছে। অত উজ্জ্বল আলো, আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। সে আলোতে আমার চির আঁধার প্রাণ যেন চির-দিনের জন্য আলোকিত হইল। রজতাধারে প্রতিষ্ঠিত, অসংখ্য দীপাবলীর সুতীব্র আলোকচ্ছটা দেখিয়া বোধ হইল, যেন শত সহস্র চঞ্চলা দামিনী, স্থির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই মর্ম্মর-মণ্ডিত কক্ষ মধ্যে চঞ্চলভাবে জ্যোতিচ্ছটা বিকীরণ করিতেছে।

একটী প্রস্তরময় সুবৃহৎ, সুচিত্রিত কক্ষের মধ্য স্থলে, মর্ম্মর-নির্ম্মিত প্রস্রবনশীল স্তম্ভের চারিদিক বেষ্টন করিয়া বেলা, চামেলি,

মল্লিকা মালতী, চম্পক ও নাগকেশর প্রভৃতি গন্ধভরা পুষ্পের মালিকা-রাশি।

যুগ্ম স্তম্ভের উপর, এক একটী খিলান। প্রত্যেক খিলানে স্বর্ণ ও রৌপ্য-পিঞ্জর। রজত শৃঙ্খলে দোদুল্যমান পিঞ্জরের মধ্যে ভীমরাজ পাপিয়া, বুলবুল, কোয়েলা ও ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি সেই স্থান কাকলী-মণ্ডিত করিতেছে। তাহারা সেই উজ্জ্বল আলো দেখিয়া মাঝে মাঝে তান ছাড়িতেছে, আর মর্ম্মরমণ্ডিত কক্ষমধ্যে তাহাদের সেই ষড়জ গান্ধার রেখাব মিশ্রিত কলতান, চারিদিকে অলস ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কক্ষমধ্যে রক্ত, পীত, নীল, হরিত-বর্ণের মখমলমণ্ডিত বিবিধ বিচিত্র আসন। সে সমস্ত সুকোমল আসনের উপর মণি মুক্তাদির কাজ করা। সেই সুচিকণ কাজের উপর উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা পড়িয়া, আরও চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

আমি সেই সুসজ্জিত কক্ষের একাংশই দেখিতেছিলাম। আমার সম্মুখেই একটী সুবৃহৎ রেশমী পরদা। ইহা কক্ষটিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। পর্দ্দার অপর পাশে কি আছে, তাহা তখনও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

সহসা সেই সুবৃহৎ রেশমী পরদা তুলিয়া উঠিল। কে যেন মন্ত্রশক্তি-বলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা উপরে তুলিয়া লইল। তৎপরে আমি যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আমি কেন, অনেকেই কখনও চোখে দেখেন নাই। দেখিলাম, বাদশাহের রঙ্গমহলের অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! দেখিলাম, এই জ্বালাময় মর্ত্ত্যে, বেহেস্ত সৃষ্টি হইয়াছে? দেখিলাম, সেই রঙ্গমহলে রূপসী রমণীর মেলা কি নেত্র-বিমোহন! দেখিলাম, যেন আমি মন্ত্রবলে এক অজ্ঞাত স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আরও দেখিলাম, এক স্বর্ণখচিত, মণিদ্যুতিপূর্ণ ক্ষুদ্র-সিংহাসনে বসিয়া

এক অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী। তাঁহার মুখ-মণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত, কিন্তু তবুও যেন তাঁহার অঙ্গ ফাটিয়া লাবণ্যস্রোত বাহির হইতেছিল। আর সেই বরাঙ্গবেষ্টনকারী চিকণের কাজ করা, রত্ন-খচিত ফিরোজা রঙ্গের ওড়না ভেদ করিয়া, সেই রূপসীশ্রেষ্ঠার সুবিমল গৌরকান্তির স্নিগ্ধমধুর জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই হৈম সিংহাসনের আশে পাশে, বিচিত্র আসনে বসিয়া অসংখ্য রূপসী রমণী। ইহাদের সকলেরই মুখ অনাবৃত।'

কক্ষমধ্যস্থ রমণীদের সকলেই অবর্ণনীয় সুন্দরী। তাহাদের সকলেরই অতি সমুজ্জ্বল বেশভূষা। জানি না—আজ আমি কোন অজ্ঞাত দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশে, এই যাদুগৃহে আমি উপস্থিত হইয়াছি!

সেই রত্নময় হৈম-সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, আমার পূর্ব্ব পরিচিতা সেই তাতারী প্রহরী! কিন্তু সে এ ক্ষেত্রে একা নয়। তাহার মত আরও অনেক তাতারী, এ পাশে ও পাশে শাণিত অস্ত্র হস্তে ঘুরিতেছে।

সেই অবগুণ্ঠনমুক্তা সুন্দরীদের একজনকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। কিন্তু আমার অতীত-জীবনের অনেক কায বিচার করিতে গিয়া, প্রতিপদে ভ্রমে পড়িয়াছি। এজন্য মনে করিলাম, এটাও বুঝি আবার সেইরূপ একটা নূতন ভ্রান্তি।

সেই সিংহাসনোপরিস্থা অবগুণ্ঠনবতীর অঙ্গুলীহেলন মাত্রেই, আমার পূর্ব্ব পরিচিত তাতারী, আমার পার্শ্বে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"সাহেব! শাহাজাদীর আদেশ, আপনি দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

আমি বুঝিলাম,—সিংহাসনোপবিষ্টা সেই সুন্দরীই শাহাজাদী। আমি নম্রভাবে বলিলাম—"শাহাজাদী! আমি জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করি নাই। এ রঙ্গমহালের পুরীরক্ষক নবনিযুক্ত সেনাপতি আমি। এ ব্যাপারে আমার এ পর্য্যন্ত যতটা লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে, তাহাই আমার অনুষ্ঠিত অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।"

এই কথায়, রমণীমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই হো—হো শব্দে হাসির রোল তুলিল। অনেকে বিদ্রূপসূচক মুখভঙ্গী করিল। কেহ বা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া—কথাটা যেন একেবারেই কাণেই তুলিল না।

তাতারণী বলিল—"শাহাজাদীর ইচ্ছা, আপনি যদি সরলভাবে মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আপনাকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হইবে।"

আমি বলিলাম, "মুক্তি পাই আর না পাই, মিথ্যাকথা বলা আমার অভ্যাস নাই।"

তাতারণী বলিল—"আপনি কাল অত জোরে শাহাজাদী রুবিয়ার নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন কেন?"

আমি বলিলাম—"আমার মনে কোনরূপ অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। দোহাই খোদার! সত্য বলিতেছি, রুবিয়া মানবী নহেন—দেবী। অন্তরের কৃতজ্ঞতাবশেই আমি তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়াছিলাম।"

"তাঁহার সহিত আপনার ত কোন সম্বন্ধই নাই?"

"তা জানি না। যদি কিছু থাকে, তাহা—কৃতজ্ঞতার। একদিন এই দেবী রুবিয়া, দয়া করিয়া আমায় পথ হইতে মূর্চ্ছিত অবস্থায় তুলিয়া আনেন, মূর্ত্তিমতী করুণার মত সেবা করিয়া এ ছার প্রাণ বাঁচান।"

"কোন রুবিয়ার কথা বলিতেছেন?"

"যাঁহার নামোচ্চারণে আজ আমি মহা অপরাধী, যাঁহার নিকট এখন আমি বিচারের জন্য উপস্থিত, তিনিই সেই!"

"সাহেব! এ দুনিয়াতে রুবিয়া অনেক থাকিতে পারে। আপনি কেমন করিয়া জানিলেন, আমাদের শাহাজাদি আর তিনি এক ব্যক্তি! এই সহরে অনেক ধনী আমীর ওমরাহ আছেন, তাঁহাদের বাটীতেও ত ঐ নামে কেহ থাকিতে পারে?"

"তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে দেবীকে আমি ভাল করিয়া চক্ষে দেখি

নাই, কেবল তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে—স্নেহ ও করুণার পরিচয় পাইয়াছি, যিনি এই স্বার্থভরা সংসারে, মূর্ত্তিমতী করুণার প্রতিমারূপে আলো করিয়া আছেন, কল্পনায় আমি যাঁর মনোমোহন চিত্র আঁকিয়াছি, নর্ম্মদাতীরের প্রাসাদে যাঁর সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি, একদিন সোপানপার্শ্বে দেখিয়াছিলাম, রঙ্গ-মহালের কক্ষবাতায়নে পরিদৃষ্ট মূর্ত্তির সহিত তাঁহার খুব সাদৃশ্য দেখিয়াই, আমি প্রাণের আবেগে "রুবিয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম।"

তাতারণী বলিল—"জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দুই প্রকারের অপরাধ হয়। আপনি অজ্ঞাত অপরাধে অপরাধী। এজন্য রঙ্গমহালের নিয়মানুসারে আপনি কোনরূপ কঠোর শাস্তি পাইবেন না। তাহার কারণ—আমাদের শাহাজাদী করুণারূপিণী দেবী। কিন্তু এ মুক্তির জন্য আপনাকে একটা কাজ করিতে হইবে।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"কি কাজ ?"

"শাহাজাদী ঐ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, উনি এখনিই অবগুণ্ঠন মোচন করিবেন। পার্শ্বে বসিয়া উহাঁর দ্বাদশ জন সঙ্গিনী! শাহাজাদীর ইচ্ছা, যে আপনি তাঁহাদের মধ্যে, কে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী—তাহা বিচার করিয়া বলিয়া দিবেন। বলাবাহুল্য—এ বিচার আপনি অবশ্য বিনাসংকোচে, নিরপেক্ষ ভাবেই করিবেন।"

"বিবি! আমার দ্বারা ইহার কোনরূপ মীমাংসা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

"আমরা শুনিয়াছি, রমণীর রূপ বিচার করিতে আপনি একজন পাকা জহুরী। গুলসানা বলিয়া এক সুন্দর রমণীর তসবীর, আপনি বড়ই পছন্দ করিয়াছিলেন। আর—"

এ কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। রঙ্গমহালের নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ হইয়া, ইহারা আমার মত এক অপরিচিত ব্যক্তির জীবনের অতি গুহ্যকথা জানিল কিরূপে ?

আমি বিনম্রভাবে বলিলাম—"শাহাজাদীর কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন এ ব্যাপারে আমায় মার্জ্জনা করেন।"

সেই বাঁদী বলিল—"যতক্ষণ না আপনি এ বিষয়ের মীমাংসা করিবেন, ততক্ষণ আপনার নিস্তার নাই। রজনী মধ্য-যামে আসিয়াছে। আর আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। শীঘ্র মতামত প্রকাশ না করিলে শাহাজাদীর আদেশে আপনি রঙ্গমহালের মধ্যে কারারুদ্ধ হইবেন।"

আমি বড়ই গোলমালে পড়িলাম। মনে মনে বলিলাম—জানি না রমণী! তোমার ঐ নবনীত-কোমল হৃদয়মধ্যে, এত কঠিনতা কোথা হইতে আসে? পুরুষকে লইয়া ক্রীড়নকবৎ খেলা করিতে তোমাদের মত, আর কেহ ত অত সিদ্ধহস্ত নয়! লোকে সমাজচক্ষে যত বড় হউক না কেন, যতই ঐশ্বর্য্য, মান-সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, গৌরব ও বীরত্ব বিমণ্ডিত হোক না কেন, সব যেন অন্দরে আসিলে কোথায় উড়িয়া যায়। অবরোধের নিভৃতান্তরালবর্ত্তী সম্মোহন কটাক্ষ, ওষ্ঠাধরস্পর্শী মৃদু মধুর হাসি, ছলনাময় প্রেমসম্ভাষণ, মনগোলানো সোহাগ, পাথরের মত মানুষকেও তুলার মত হাল্‌কা করিয়া দেয়।

আমি তখন বুঝিলাম, যে বড়ই সঙ্গীন অবস্থায় পড়িয়াছি। যাঁহারা সেখানে উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই সুন্দরী। সঙ্গিনীদের মুখ দেখিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু স্বয়ং শাহাজাদী তখনও অবগুণ্ঠনাবৃতা। তাঁহার মুখ না দেখিলে, এ রূপের বিচার করিই বা কিরূপে? এ রূপের হাটে ছোট বড় বিচার করা বড়ই ধৃষ্টতা। আমি এক একবার সকলের মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সুরমা-রঞ্জিত চব্বিশটী সমুজ্জ্বল বিদ্যুৎ শিখাময় কটাক্ষ সেই প্রদীপালোকে এক একবার চকমক করিয়া উঠিতেছিল। ঘৃণা, অবজ্ঞা, দম্ভপূর্ণ মধুর হাসি, তাঁহাদের সকলেরই সুলোহিত ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া তখনই বিলীন হইতেছিল।

আর মুখ-টিপিয়া অবজ্ঞার এই হাসিটা, আমার প্রাণে খুব জোরে আঘাত করিতেছিল।

বোধ হয়, ইহারা কোনরূপ যাদু মন্ত্র জানে। মনের কথা বুঝিতে পারে। আমি এই সমস্ত কথা মনে মনে ভাবিতেছি, এমন সময়ে স্বয়ং শাহাজাদী, মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন।

এই কি রুবিয়া? কল্পনার সহায়তায় যে মদির-মাধুরীমাখা, সৌন্দর্য্যভরা চিত্র আঁকিয়াছিলাম, এর রূপে যে তার কিছুই দেখিতেছি না। একদিন জ্যোৎস্নালোকবিধৌত, সোপানগাত্রাবলম্বী যে বিদ্যুল্লতার অতি তীব্র জ্যোতি দেখিয়াছিলাম, এত সে নয়! শাহাজাদী হইলেই কি শ্রেষ্ঠ রূপসী হইতে হইবে? প্রাণে দয়া মায়া স্নেহ থাকিলেই, কি বাহিরের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে? হয়তঃ আমি আগাগোড়াই একটা ভ্রম করিয়াছি।

আমি চকিত মনে, আবার একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিবামাত্রই বুঝিলাম—যেখানে আসিয়াছি, সেটা প্রকৃতই রূপের হাট। সে হাটে, আমার মত ঝুটা জহুরীর স্থান নাই! বাঁদী বলিয়া তাহারা বাঁদীর মত নহে। সকলেরই পোষাক পরিচ্ছদ শাহাজাদীর মত। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, একবার সেই সব সুন্দর মুখ গুলির উপর ঘুরিয়া আসিল। আমি আবার একবার শাহাজাদীর মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

যে বাঁদী, ইতিপূর্ব্বে আমার সহিত কথা কহিতেছিল, সে বলিল, "সাহেব! আপনার মতামত কি শীঘ্র বলুন।"

আমি বলিলাম, "নিন্দা সুখ্যাতির স্থান এই বেহেস্ত নয়। এখানে সবই সুন্দর। আপনারা আমার মার্জ্জনা করুন—"

এবার শাহাজাদী বলিলেন—"তাহা হইতেই পারে না। আমাদের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়াছে। এই কক্ষস্থিত দর্পণগুলি মীমাংসা করিয়া দিয়াছে,

আমরা সবাই সুন্দরী। কিন্তু আমার সখীগণ বলে, আমার সৌন্দর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়। রমণীর রূপের বিচারক—পুরুষ। যখন একটা সুযোগ ঘটিয়াছে, তখন আপনার দ্বারাই এ ব্যাপারের মীমাংসা করাইয়া লওয়া উচিত। যতক্ষণ না আপনি এ বিবাদের একটা ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করিতেছেন, ততক্ষণ আপনার নিস্তার নাই।”

আমি আর একবার সেই সুন্দরী রমণীগুলির দিকে চকিতভাবে দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু সহসা একস্থানে, যেন আমার দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া গেল। সেখান হইতে চক্ষু যেন আর ফিরিতে চাহে না।

যাহার দিকে আমার দৃষ্টি দৃঢ়ভাবে আকর্ষিত, তাহাকে বোধ হয় আর কথনও দেখি নাই! কিন্তু তাহার রূপ, এই দুনিয়ার বুকে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বোধ হয়, কোন অপ্সরীর দেহ সাজাইতেও সৃষ্টিকর্ত্তাকে অতটা পরিশ্রম করিতে হয় নাই। কোথায় লাগে—গুলসানা? শত শত গুল-সানা, তাহার চরণপ্রান্তে বিকাইবার যোগ্য নহে।

আমি দুইবার তিনবার, সেই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার মুখের দিকে, সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে, আমাদের চোখে চোখে মিলিল। সেই সুন্দরী একটু সলজ্জভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। আমার হৃদয়কন্দরে, পলকের মধ্যে সেই অপ্সরী মূর্ত্তির ছায়া দৃঢ়ভাবে আঁকিয়া গেল। প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ, যেন সেই সুন্দর রূপজ্যোতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল! কি সুন্দর! আ মরি—কি সুন্দর!

জানি না, সেই কক্ষমধ্যস্থ অপরা রমণীগণ আমার এ বিমুগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়াছিল কি না? সেই দীপমালা সমুজ্জ্বলিত গন্ধভরা কক্ষ, যেন একেবারে নিস্তব্ধ! আমিও নির্ব্বাক ভাবে, চোরের মত, অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। আমার প্রাণে তখন এমন শক্তি ও সাহস ছিল না, যে ভরসা করিয়া কাহারও মুখের দিকে চাই।

সেই সিংহাসনোপবিষ্টা, শাহাজাদী আমায় বলিলেন—"সাহেব! রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। আপনার সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য এখন আমরা সকলেই খুবই সমুৎসুক। মনে রাখিবেন, এটা মালবের বাদশাহের রঙ্গমহল। পুরুষের প্রবেশ ও দীর্ঘকাল এখানে অবস্থান একেবারে নিষিদ্ধ।"

আমি একটী ছোট খাট কুর্ণীস করিয়া বলিলাম—"আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত রহস্য করিতেছেন কেন শাহাজাদি? যে কার্য্যের ভার আমায় দিয়াছেন—আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

শাহাজাদী গম্ভীর মুখে বলিলেন—"রহস্য নয়, সাহেব! সত্যই আমরা আপনার মতামত জানিতে বড়ই উৎসুক। এ সম্বন্ধে, আপনার স্বাধীন মতই, অদ্য আপনাকে দণ্ড হইতে মুক্তি দান করিবে।"

আমি বলিলাম—"আর যদি আমি সত্য কথা না বলি?

শাহাজাদী বলিলেন—"তাহা হইলে গত কল্য আপনি আমার নামোচ্চারণে যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা বাদশার কাণে তুলিব। আপনাকে তাহা হইলে অতি কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।"

আমি এ কথায় একটু দমিয়া গেলাম। ইহারা যেরূপ গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহাতে ত রহস্যের নাম গন্ধমাত্র দেখি না। আবার ভাবিলাম, বাদশাজাদীদের মনে অনেক সময়ে, অনেক অদ্ভুত রকমের খেয়াল আসে। এটীও বোধ—সেই রকম কোন একটা কিছু হইবে।

আমি সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম—"শাহাজাদি! বোধ হয় সত্য কথা বলিলে, আপনি আমার উপর রুষ্ট হইবেন না?"

শাহাজাদী হাসিয়া বলিলেন—"কখনই না। বরঞ্চ আপনার স্পষ্ট-বাদিতার জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করিব।"

শাহাজাদীর এই কথা শুনিয়া, আমার প্রাণে যেন একটু সাহস আসিল।

আমি ইতিপূর্ব্বে যে সুন্দরীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দুই তিনবার দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া, বলিলাম.—"আমার মতে উনিই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী।"

এই কথা বলিবামাত্রই সেই কক্ষ-মধ্যস্থ উজ্জ্বল দীপাবলী, যেন মায়াবলে তথনিই নিবিয়া গেল। তথন আমার চারিদিক ব্যাপিয়া সূচীভেদ্য অন্ধকার! সেই স্বপ্ন-সৃজিত অপ্সর-রাজ্য, যেন মন্ত্রবলে মুহূর্ত্তমধ্যে নরকের মত অন্ধকারময় ভাব ধারণ করিল। সেই অন্ধকারে একজন তাতারী আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল—"খাঁ সাহেব! চলুন আপনাকে রঙ্গমহলের বাহিরে রাখিয়া আসি। আমাদের কাজ শেষ হইয়াছে।"

কিন্তু আসিবার সময় তাতারী আমার চোখ বাঁধিল না। যে পথে আসিয়াছিল, সে পথেও গেল না। আমাকে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে, উদ্যান-প্রাচীরের এক ক্ষুদ্র দ্বারের কাছে আনিয়া উপস্থিত করিল।

তৎপরে, সে এক কুঞ্জিকার সহায়তায়, সেই ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার খুলিয়া আমায় বলিল—"এই দ্বারের বাহিরেই আপনার মহল। আদাব সাহেব!"

সে এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, যে আমি তাহাকে কোন একটা প্রশ্ন করিবার অবসর মাত্র পাইলাম না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমি রঙ্গমহালের দ্বার-পথ হইতে, বাহির হইবামাত্রই দেখিতে পাইলাম, আমার সম্মুখ হইতে, ছায়া-মূর্ত্তির মত কি যেন একটা সরিয়া গেল।

আমি কয়েক মুহূর্ত্তকাল সেইখানে সন্দিগ্ধচিত্তে, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যে দিকে সেই মূর্ত্তি চলিয়া গিয়াছিল—সেই দিকে ধীরপদে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু তবুও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তবে কি

গুপ্ত শত্রু আমার অনুসরণ করিতেছে? নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, আমি আমার নিজ কক্ষের পথ ধরিলাম।

সহসা আমার পৃষ্ঠের উপর কে যেন অতি কোমল হস্ত স্পর্শ করিল। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—"কে তুমি? দেখিতেছি—স্ত্রীলোক! তোমার অভিপ্রায় কি?"

সে বলিল—"আমায় সন্দেহ করিতেছেন? মন্দ কথা নয়। স্ত্রীলোক দেখিলে আপনার এত ভয় কেন? এই মাত্র ত এক রাশ রূপসীর নিকট নিকট হইতে অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ছি!"

আমি রুষ্টভাবে বলিলাম—"সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি?"

সেই স্ত্রীলোক দৃঢ়স্বরে বলিল—"প্রয়োজন আছে বলিয়াই, এ রাত্রে এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়া জনাবের অনুসরণ করিয়াছি।"

আমি বলিলাম—"এরূপ প্রকাশ্য স্থানে, এ ভাবে কথাবার্ত্তা কহা ঠিক নয়। তুমি আমার কক্ষে এসো।"

"চলুন"—বলিয়া সেই স্ত্রীলোক বিনা বাক্যব্যয়ে, আমার পশ্চাদনুসরণ করিল।

রাত্রি তখন তৃতীয় যাম। কক্ষদ্বারের সম্মুখে আমার ভৃত্যটা বসিয়া ঢুকিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"কেরামৎ! তুই নিজের ঘরে গিয়া শয়ন কর। আজ আর আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নাই।"

অত রাত্রে, আমার সঙ্গে এক অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোককে দেখিয়া, কেরামৎ আলি যেন একটু বিস্মিত হইল। আর সেই বিস্ময়টুকু, একটী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা নীরবভাবে প্রকাশ করিয়া, সে নিঃশব্দে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

আমার কক্ষে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। সেই স্ত্রীলোক বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া, আমি বলিলাম—"বিবি! ভিতরে আসুন।"

সে আমার কক্ষ মধ্যে আসিল। অবগুণ্ঠনে তাহার সমস্ত মুখখানি ঢাকা। সে যে কে, তাহা চিনিতে পারিলাম না। এইজন্য একটা নূতন বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়িলাম। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ সবই সম্ভ্রান্ত রমণীর মত।

আমি সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলাম—"এ রাত্রে আপনি কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছেন?"

"আপনার সহিত দুদণ্ড কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য সাহেব!"

"অপরিচিত পুরুষের সহিত আলাপ করিবার অধিকার আপনার আছে কি না—আর সেটা কতদূর নীতিসঙ্গত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

"এখনিই যে রঙ্গমহালের এক রাশ রূপসীর সহিত আলাপ করিয়া আসিলেন, তাহাতেই বা আপনার নীতি-সঙ্গত অধিকার কত টুকু?"

"আমি এক অদ্ভুত ঘটনাবশে সেখানে গিয়া পড়িয়াছিলাম।"

"আর আমিও তার চেয়ে এক অদ্ভুত ঘটনাবশে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

"আপনার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভবা। ভদ্রে! আপনার এ কি ব্যবহার?"

"আর আপনার ব্যবহারই কি ভাল—জনাব? আপনি কোন আক্কেলে, বাদশাহের রঙ্গমহালের মধ্যে গিয়া, একরাশ সুন্দরী রমণীর মধ্য হইতে একটীকে দেখিয়াই ভালবাসিয়া ফেলিলেম, আর অতি নির্ল্লজ্জের মত তার রূপের প্রশংসা করিলেন—আবার এখনি তাহাকে ভুলিয়া গেলেন?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। তবে কি এই—সেই। আমি স্বর্গ হাতে পাইলাম। আমার চোখের সম্মুখে, যেন বেহেস্তের উজ্জ্বল কিরণরাশি ফুটিয়া উঠিল। আমি আনন্দে অধীর হইয়া, তাহার হস্তস্পর্শ করিতে গেলাম। কিন্তু সে রমণী তখনই হাত সরাইয়া লইয়া দূরে দাঁড়াইল। তিরস্কারপূর্ণ তীব্র শ্লেষময় ভাষায় সে বলিল,—"বীরপুরুষ হইয়া অতটা

অপদার্থ হওয়া ভাল নয়! চিত্তটাকে একটু দমন করিয়া রাখিতে হয়। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলেই, ধৈর্য্য হারাইতে নাই।"

এ তিরস্কারে হটিলাম বটে, কিন্তু আর এক নূতন সমস্যার মধ্যে পড়িলাম। মনে ভাবিলাম—যাহার মুখে সরলতা, চোখে করুণা, হাস্যে প্রেম, আস্যে সৌন্দর্য্য, দেখিয়াছি—সে অত নিষ্ঠুর কেন?

সেই রমণী বলিল—"আপনি আজ যে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"কেন? এমন কি অন্যায় করিয়াছি?"

"আপনি শাহাজাদীর অবমাননা করিয়াছেন! তাঁহাকে ছোট করিয়া তাঁহার বাঁদিকে উপরে তুলিয়াছেন।"

"শাহাজাদীর অনুরোধেই আমি এরূপ করিয়াছি।"

"কিন্তু আপনারও একটা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত ছিল।"

"যা হইবার তা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন উপায় কি বিবি?"

"উপায় কিছুই নাই! বুঝিতেছি—মৃত্যু আপনার এই ধৃষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত। শাহাজাদীর অপমান করা—বিশেষতঃ তাঁর বাঁদীদের সমক্ষে—বড় সহজ অপরাধ নয়!"

"কিন্তু এ মৃত্যু ঘটাইবে কে?

"শাহজাদী—নিজে।

"মরিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এ জীবনে চিরদিন কষ্টভোগই করিয়া আসিতেছি। এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু সুখ পাইয়াছিলাম, তাহার ফলও দেখিতেছি—মৃত্যু। বেশ কথা! মরিবার জন্যই প্রস্তুত রহিলাম।"

"মৃত্যুও কেবল আপনার নয় সাহেব! আপনার সঙ্গে সঙ্গে আর একজনও যে মরিবে!"

"কে—সে?"

"যাহাকে আপনি দেখিবামাত্রই ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন। জানেন ত শাহাজাদীরা রঙ্গমহালের একাধিশ্বরী। তাঁহাদের মহালে কোন অপরাধ ঘটিলে, তাঁহারই তার বিচারক। কেন—আপনি ত দিল্লীর সম্রাটের প্রাসাদে থাকিতেন, আর এ সামান্য কথাটা জানেন না? আপনি রাজ-কন্যাকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার বাঁদীকে ভাল বলিয়াছেন। প্রবৃত্তি-চালিত প্রবল রূপানুরক্তিই, আপনাকে এ মত প্রকাশে বাধ্য করিয়াছে! কিন্তু শাহাজাদী ইহাতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আপনার শোণিতদর্শন না করিলে তাঁহার সে ক্রোধ ও ক্ষোভ মিটিবে না।"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। তখনই সেই হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, দীনভাবে করজোড়ে সেই রমণীকে বলিলাম—"আপনি যেই হউন, আর আমায় এই কষ্টকর সন্দেহমধ্যে রাখিবেন না। আমার যা হয় হউক, কিন্তু বলুন! আমার প্রিয়তমার কোন অনিষ্ট ঘটিয়াছে কি না?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল—"তা বলিতে পারি না! তবে সে যে এতক্ষণে তাতারীদের হস্তে বন্দিনী হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তার পর সেই হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি আছে, তাহা খোদাই জানেন।"

আমি তখনই উপাধানতল হইতে এক শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিলাম—"বিবি! শাহাজাদী যদি আমার রুধির-ধারায় তৃপ্ত হন, তাহা হইলে এই হৃদয়ের শোণিত তাঁহাকে এখনই উপহার দিতেছি। আপনি ইহা লইয়া তাঁহাকে উপহার দিন। আমার কাতর প্রার্থনা, যেন সেই নির্দ্দোষী অবলার কোন অনিষ্ট না হয়।"

আমি তখনই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা কোষমুক্ত করিয়া, সবলে বক্ষে বিঁধিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে সেই রমণী, তড়িদ্বেগে উঠিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"ছি! ছি! ইস্কান্দার সাহেব! করেন কি? আপনি যে সকল কাজেই অধীর হইয়া পড়েন দেখিতেছি। নিশ্চয়ই

আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি সব জাহান্নমে গিয়াছে। তাহা না হইলে, এতক্ষণ কথাবার্ত্তার পরও, আমাকে চিনিতে পারিলেন না কেন?”

এই বলিয়া, সেই অবগুণ্ঠিতা রমণী, তাঁহার মুখের উপর হইতে নীলাঞ্চলখানি তড়িদ্বেগে সরাইয়া লইল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, সে আর কেহই নহে, আমার সেই স্নেহময়ী কুলসম—সেখজীর সোহাগিনী পত্নী।

আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম,—“কুলসম্! কুলসম্! ওঃ—ঠিক হইয়াছে! আমি তোমাকেই রঙ্গমহালে প্রথম দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তখন ঠিক চিনিতে পারি নাই। কিন্তু সেখজী কোথায়?”

কুলসম বলিল—“সে এই সহরেই আছে, কিন্তু ও সব বাজে কথা এখন থাক্। কাজের কথা বলি, এখন মন দিয়া শুনিয়া যাও।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি বিস্মিত ভাবে বলিলাম—“বড়ই তাজ্জব কথা! তুমি বাজ্-বাহাদুরের রঙ্গমহালে আসিলে কেমন করিয়া কুলসম্?”

কুলসম্ হাসিয়া বলিল—“তুমিই বা এখানে আসিলে কেমন করিয়া খাঁ সাহেব?”

আমি বলিলাম—সে কথা যাক্। ব্যাপার কি বল দেখি?”

“ব্যাপার আর কি—সবই খুস্-খবর।”

“তবে আমাকে ভয় দেখাইতেছিলে কেন শয়তানী?

“একটু সখ্ হইয়াছিল।”

“মন্দ সখ্ নয়। এখন বল তাহাকে রক্ষার উপায় কি?”

“কাহাকে?”

"যাহাকে আমি না বুঝিয়া প্রাণ দিয়াছি? যাহার জন্য শাহাজাদীর ভীষণ কোপে পড়িয়াছি!"

"খোদা তাহাকে বাঁচাইবেন সাহেব।"

"সত্য—কিন্তু সে হয়তো এতক্ষণে তাতারীদের দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়াছে।"

"কার সাধ্য তাহাকে কারারুদ্ধ করে?"

"তোমার কথা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না কুলসম! এই মাত্র তুমিই ত বলিলে, সে হয় ত এতক্ষণে নিষ্ঠুর তাতারীদের হাতে পড়িয়াছে।"

"মিথ্যা কথা! রহস্য মাত্র! তোমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলাম।"

"এমন নিষ্ঠুর রহস্য করিতে নাই! দেখিলে ত আমি নিরাশায় আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।"

"আমি যখন এখানে সশরীরে উপস্থিত, তখন আত্মহত্যা করিতে দিব কেন? ইস্কান্দার সাহেব! তুমি যাহাকে ভাল বাসিয়াছ, যাহার অনিষ্টাশঙ্কায় এত ব্যাকুল, তিনিই শাহাজাদী রুবিয়া! আর সিংহাসনে যে শাহাজাদী সাজিয়া বসিয়াছিল, সে তাঁহার ক্রীতদাসী।"

যদি তখনি সেইস্থানে বজ্রপাত হইত, তাহাতেও আমি ততটা আশ্চর্য্য হইতাম না। কিন্তু কুলসমের এ কথায় আমার বিশ্বাস হইল না। আমি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলাম—"কুলসম! অত নিষ্ঠুর হইও না। এ রহস্যের সময় নয়।"

কুলসম বলিল—"রহস্য নয় সাহেব! প্রকৃত কথাই বলিতেছি। শাহাজাদী তোমায় দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিলেন। তোমার আহত ও অচেতন অবস্থাতে, এই শাহজাদি রুবিয়াই, তোমার সেবা

শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আর আমিই তাঁহাকে সংবাদ দিই, যে তুমি এই প্রাসাদের মধ্যেই থাক। যে দিন তুমি গবাক্ষপথে "রুবিয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলে, সেই দিনই তিনি তোমায় দেখিতে পান। তার পর যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সবই আমার ও তাঁহার পরামর্শ এবং কৌশলময় মন্ত্রণার ফল।"

আমি তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বলিলাম—"বহুৎ খুব! কিন্তু কুলসম বিবি! তোমাদের মন্ত্রণায় আমি যে যথেষ্ট যন্ত্রণা পাইলাম। তুমি যদি এতটা জানিতে, তবে আমাকে কোন উপায়ে পূর্ব্বে কোন সংবাদ দাও নাই কেন কুলসম?"

কুলসম বলিল—"আমি তাঁহার প্রিয়সঙ্গিনী হইলেও তিনি মালবে-শ্বরের আদরিণী কন্যা—রঙ্গমলের একাধিশ্বরী। আমরা তাঁর দাসী বই তো নয়। তাঁহার যেমন অভিরুচি, আমাদের সেইরূপ করিতেই হইয়াছে।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম—"তাহাহইলে উপায় কি কুলসম?

কুলসম গম্ভীরমুখে বলিল—"উপায় ত কিছু দেখিতেছি না, সাহেব! সত্যসত্যই তোমরা ঘোর বিপদের মুখে!"

"বিপদ আমারই হইতে পারে। কিন্তু শাহাজাদীর কি?"

"শাহাজাদীর বিপদও কম নয়। আমেদনগরের সুলতান, তাঁহার হস্তপ্রার্থী। কিন্তু রাজকন্যা তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন।"

"আমি শাহাজাদীর সুখের অন্তরায় হইতে চাহি না। যাহাতে তিনি আমার আশা ছাড়েন, তাহার উপায় আমি নিজেই করিব।"

"তবে কি তুমি নিরাশায় আত্মহত্যা করিবে?

"না তত কাপুরুষ আমি নই। দেখ কুলসম!, জীবনে কখনও কাহাকেও প্রাণভরিয়া ভালবাসি নাই! আর যখন দেখিতেছি, তাহা-

ঝাসেলই বিপদ আসিয়া জুটে, তখন এ কণ্টকময় পথ ত্যাগ করাই ভাল। প্রেমের ত অনেক উচ্চ আদর্শ আছে।"

"তাহা হইলে ফকিরি লইবে না কি?"

"সেটা মন্দ কথা নয়! কিন্তু কাল তুমি দেখিবে, ইস্কান্দার খাঁ মান্দু প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"এটা ত নিছক নিষ্ঠুরের কথা। অতি অকৃতজ্ঞের কথা। এখনই কি ভুলিয়া যাইতেছ, যে শাহাজাদী রুবিয়া, একদিন তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।"

কুলসমের এ কথায় আমি একটু মর্ম্মে আঘাত পাইলাম। কি যে উত্তর করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। শূন্যদৃষ্টিতে, স্থিরভাবে, সেইখানে দাঁড়াইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম।

কুলসম বলিল—"সাহেব! রজনী ত শেষ যামে আসিয়াছে। আমায় এখনই মহলে ফিরিতে হইবে। শাহাজাদীর উপদেশ অনুসারেই এখানে আসিয়াছিলাম। তিনিও উৎকণ্ঠিত চিত্তে তোমার সংবাদ অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি এই পত্রখানি তোমায় দিয়াছেন। এখন তাঁহার পত্রের উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া, কুলসম তাহার বস্ত্র মধ্য হইতে, একখানি লোহিতবর্ণ কাগজ বাহির করিয়া, আমার হস্তে দিল। আমি সেই পত্রখানি আগ্রহের সহিত একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে লাগিলাম।

পত্রপাঠ শেষ হইলে, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি, কুলসম নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া, কুলসমের কথা ও অতীত রজনীর অদ্ভুত ঘটনাগুলি ভাবিতেছি, এমন সময়ে বাজ্‌বাহাদুরের একজন পদাতিক আসিয়া বলিল—"জাঁহাপনা এখনই আপনাকে তলব করিয়াছেন।"

তখনই বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আমি দরবারে চলিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, তবে কি বাজ্‌বাহাদুর গত রজনীর সমস্ত কথাই জানিতে পারিয়াছেন? তবে কি আজ আমার মিলনের দিন নয়, শোচনীয় মৃত্যুর দিন! তবে কি তিনি ভীষণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্যই, আমাকে তলব করিয়াছেন?

রুবিয়ার পূর্ব্বোক্ত পত্রে লেখা ছিল—

"প্রিয়তম! আজ প্রভাতে আমাকে নর্ম্মদাতীরের সেই প্রাসাদে যাইতে হইবে। পিতার আদেশ। সুতরাং ইহার কারণানুসন্ধানে আমার কোন ক্ষমতাই নাই। তুমি দয়া করিয়া মধ্যরাত্রে মীনা-মসজেদের কাছে থাকিবে। সেইখানে কুলসমের দেখা পাইবে। ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য সেই করিবে।"

আমি এই প্রেমাহ্বান-পত্রের কথা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে, দরবারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, সে দিন প্রথামত দরবার হয় নাই। সুলতান তাঁহার খাস্‌-কামরাতেই বিরাজ করিতেছেন।

আমি ভয়ে ভয়ে সসম্ভ্রমে কুর্ণীশ করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। নম্রভাবে বলিলাম—"জাঁহাপনার আদেশ পালনের জন্য, এ দাস সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

বাজ্‌বাহাদুর বলিলেন—"ইস্কান্দার! আজ তোমায় একটী গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার অর্পণ করিতেছি। আহম্মদনগর রাজ্যের সুলতান, আমার ভাবী জামাতা। তাঁহাকে আনিবার জন্য, নানাবিধ উপহার দ্রব্য লইয়া তোমাকে আহম্মদনগরে যাইতে হইবে। এজন্য তোমার সঙ্গে দুইশত

অশ্বারোহী সৈন্য যাইবে। তুমিই তাহাদের অধিনায়ক। আর মৎপ্রদত্ত বহু-মূল্যবান উপহার-সমূহের রক্ষক।”

আমি সেলামের উপর সেলাম করিয়া বলিলাম,—“জাঁহাপনার আদেশ পালন করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব, কিন্তু আমায় কখন প্রস্তুত হইতে হইবে জনাবালি?”

বাজ্ বাহাদুর গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—আজই অপরাহ্নে! সুলতান্ মধ্যপথে, তোমার জন্য তাঁহার শিবিরে অপেক্ষা করিবেন। তোমাকে অবশ্য আহম্মদনগর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এ সংবাদ লইয়া একজন অশ্বারোহী ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। আশা করি, আমার মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া তুমি এ কাজটী সুসম্পন্ন করিতে পারিবে!”

কথাটা শুনিবামাত্রই, আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। মাথায় বজ্র পড়িল। আমি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিলাম,—“জনাবের আর কোন আদেশ আছে?”

বাজ্ বাহাদুর একটু হাসিয়া বলিলেন—“আর বেশী কিছু নয়। কিন্তু সাবধান! পথে যেন অযথা বিলম্ব করিও না। তোমার পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে, আমাকে সুলতানের নিকট মিথ্যাবাদী হইতে হইবে। আমার ইচ্ছা, অদ্য অপরাহ্নের পূর্ব্বেই তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক। এখন বিদায় হইতে পার।”

কি দুর্দ্দৈব! যে রুবিয়া আমাকে আদর করিয়া মিলন-নিমন্ত্রণ করিয়াছে, যে রুবিয়ার গোলামের যোগ্যও আমি নহি—হায়! আজ অদৃষ্টচক্র সৃষ্ট এক নূতন ঘটনায় বাধা পাইয়া, তাহার সাদর আহ্বান আমাকে উপেক্ষা করিতে হইতেছে। এজন্য আবাসে ফিরিবার পর, সমস্ত দিনটা নানা দুশ্চিন্তায় কাটিল। শেষে অপরাহ্ন আসিল।

বাজ্ বাহাদুর আমাকে যে হুকুম করিয়াছেন, তাহাই আমি তালিম করি-

লাম। রাজধানী হইতে তিন ক্রোশ দূরে, নেসারংপুরের মাঠে যখন আমার সেনারা পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অগত্যা আমি আমার অধীনস্থ সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিলাম—"এই স্থানেই আজ ছাউনি কর। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর অতি প্রত্যূষেই পুনরায় অগ্রসর হওয়া যাইবে।"

আমার এ আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। নির্জ্জনে শিবির মধ্যে বসিয়া, নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। আসিবার সময়, নর্ম্মদা-তীরস্থ সেই রাজপ্রাসাদ, আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল। আমি একান্তচিত্তে সেই প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তিনী, স্বর্ণপ্রতিমা রুবিয়ার কথা ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু চিন্তাসমুদ্রের কোন কূল কিনারা পাইলাম না। শেষে একটা দুষ্কর কল্পনা আমার মনে উদিত হইল। ভাবিলাম যে উপায়ে পারি, রুবিয়ার সঙ্গে আজই দেখা করিব।

আমি প্রবৃত্তির বাঁধ বাঁধিতে না পারিয়া, হৃদয়ের আবেগ দমন করিতে না পারিয়া, সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বলিত নিস্তব্ধ নিশীথে, অতি সংগোপনে অশ্বারোহণে, শিবির হইতে বাহির হইলাম। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে মীনা মসজেদের নিকট পৌছিলাম।

অশ্বটীকে এক বৃক্ষে বাঁধিয়া, মসজেদের সম্মুখে আসিলাম। যে স্থানে আমার অপেক্ষা করার কথা স্থির ছিল, এই ত সেই স্থান! কই কেহই ত সেখানে নাই।

অনেকক্ষণ আমি সেখানে দাঁড়াইয়া, নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়ে কে যেন আমার কাছে আসিয়া বলিল, "সাহেব! আপনার এত বিলম্ব হইল যে?"

এ কণ্ঠস্বর ত কুলসমের নয়!

আমি বলিলাম—"তুমি কে? কুলসম কোথায়?"

সে বলিল—"কুলসম কোন বিশেষ কারণে আসিতে পারে নাই।

তাহার পরিবর্ত্তে শাহাজাদী আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার সন্দেহের কোন কারণ নাই। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

আমি বলিলাম—"ঐ গাছে আমার অশ্ব বাঁধা আছে। অশ্বটী সঙ্গে লইব কি ?"

সে বলিল—"কোন প্রয়োজন নাই। এ পথে লোক জন বড় একটা চলে না। আর বাজ্‌বাহাদুরের এ রাজ্য অতি সুশাসিত। কেহই তাঁহার সৈনিকের অশ্ব চুরি করিবে না। আপনি বড় দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন। শীঘ্র আমার সঙ্গে আসুন।"

আমার অদৃষ্টকে আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই, আজও করিলাম না। সন্দেহের কোন কারণ না থাকিলেও, মনে যেন একটা প্রবল আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। কে যেন বলিয়া দিল—"সাবধান! আবার তুমি রমণীর রূপমোহাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্যহানি করিতে উদ্যত হইয়াছ! আবার তুমি স্বেচ্ছায় তোমার বিড়ম্বিত ভাগ্যকে, স্বহস্তে দলিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছ ?"

অনুশোচনার তীব্র দংশনে, প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিজাতীয় যাতনা উপস্থিত হইল। আমি নির্ব্বাক অবস্থায়, সেই বাঁদীর পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলাম। যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই যেন উদ্বেগ বাড়িতেছে। ঐ ত অদূরে নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী রাজপ্রাসাদ। বিবেক দংশনে অধীর হইয়া সহসা আমি স্থিরভাবে দাঁড়াইলাম। আমার সঙ্গিনীকে বলিলাম,—"আমি আর যাইব না। তুমি শাহাজাদীকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিও, আমি মালবেশ্বরের সেনাপতি হইয়া কর্ত্তব্যহানি করিতে পারিব না। তিনি যেন আমাকে মার্জ্জনা করেন।"

সে বোধ হয়, আমার সেদিনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকল কথাই ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল। এজন্য সে একটু রুষ্টস্বরে বলিল,—"যিনি শাহাজাদী হইয়া

একজন পরাক্রান্ত সুলতানকে উপেক্ষা করিয়া আপনাকে ভাল বাসিয়াছেন, আপনার আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহাকে নিরাশ করা কি আপনার কর্ত্তব্য? যিনি একদিন এই স্থান হইতে আপনাকে অচেতন অবস্থায় তুলিয়া লইয়া গিয়া, জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণ করা কি আপনার উচিত?"

বাঁদীর এ তিরস্কারে আমি লজ্জিত, ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইলাম। তাহাকে বলিলাম—"চল বিবি! আমি তোমার সঙ্গেই যাইতেছি। আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, আমি শাহাজাদী রুবিয়ার অনুরোধ রক্ষা রক্ষা করিবই করিব।"

এক গুপ্তদ্বার দিয়া, আমরা প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই বাঁদী আমাকে দ্বিতলে লইয়া গেল। আমি আহত অবস্থায় যে কক্ষে ছিলাম, ঘটনাবশে সেই কক্ষেই উপস্থিত হইলাম। কিন্তু কোথায় রুবিয়া? শাহাজাদী রুবিয়া ত সেখানে নাই!

এখনই রুবিয়াকে দেখিতে পাইব, এই আশায় প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। জগত যেন আমার চক্ষে পূর্ণ আনন্দময় হইয়া উঠিল। মনে ভাবিলাম—"কিসের ভয়? দীর্ঘ রজনীর মাত্র দুই যাম অতীত। প্রভাতের পূর্ব্বে কোন উপায়ে শিবিরে পৌঁছিতে পারিলেই, সব হাঙ্গাম মিটিয়া যাইবে।" হায়! চিরলাঞ্ছিত বিড়ম্বিত ভাগ্য! এবারও তুমি আমায় প্রতারিত করিলে?

দশম পরিচ্ছেদ।

আমার উৎকণ্ঠাময় আশাপ্রতীক্ষা নিষ্ফল হইল না। কুলসম হাসিতে হাসিতে, সেই কক্ষে আসিয়া বলিল—"তুমি যে আজ এখানে আসিতে

পারিবে, শাহাজাদী তাহা বিশ্বাস করেন নাই। আর এখানে যে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবে না, তাহাতেও তিনি দুঃখিত। তিনি তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমার সঙ্গে এসো।"

আমার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেহে যেন তড়িৎ-প্রবাহের একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বিরহের অবসানে, মিলনের আনন্দে, হৃদয়ে কত সুখময় ভাবলহরী উঠিল। আমি রুবিয়ার দর্শনাশা প্রফুল্লচিত্তে, কুলসমের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম।

সন্ত্রস্ত হৃদয়ে, আশাপূর্ণ প্রাণে, আমি রুবিয়ার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, মখমলমণ্ডিত সোফায় বসিয়া, সেই সুন্দরী-ললামভূতা রুবিয়া, রূপের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ ছড়াইতেছেন। সেই কমনীয় বরাঙ্গ-জ্যোতিঃ, নীলরঙ্গের চিকণদার ওড়নার মধ্য দিয়া, ষোলকলাপূর্ণ চন্দ্রকিরণের মত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। উরসবিলম্বিত জ্যোতির্ম্ময় রত্নহারের উপর, সমুজ্জ্বল দীপালোক পড়াতে, রত্নালঙ্কারগুলি আরও ঝক্‌মক্‌ করিতেছে! বাহুপ্রকোষ্ঠস্থিত, দীপ্তিময় হীরকালঙ্কারের জ্যোতিঃ, যেন সেই বিমল রূপ-প্রভার নিকট বিমলিন বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই মূর্ত্তি—যেন বিদ্যুৎ জ্যোতিমণ্ডিত। সে রূপমাধুরী যেন শতজন্ম নয়ন ভরিয়া পলকহীন নেত্রে, দেখিলেও দেখার সাধ মেটে না।

আমায় দেখিবামাত্র রুবিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি নতজানু হইয়া প্রেমমুগ্ধ-স্বরে বলিলাম—"সুন্দরী! একবার তোমার ঐ কোমল করপল্লব স্পর্শ করিয়া, এ অধমকে কৃতার্থ হইতে দাও!"

রুবিয়া দেখিল, কুলসম চলিয়া গিয়াছে। সেই বরবর্ণিনী তাড়াতাড়ি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া, নিকটস্থ এক সোফার উপরে বসাইল। মৃদুস্বরে বলিল,—"সাহেব! জানিবেন, এ হৃদয় আপনার চরণেই উৎসর্গ করি-

য়াছি। আমি রাজ্য চাহি না, ঐশ্বর্য্য চাহি না, ধনরত্ন চাহি না, আপনাকে চাই। আপনি ইতিপূর্ব্বে যখন আহত অবস্থায় এখানে আসেন, তখন দিনরাত নিদ্রাহীন নেত্রে আপনার পরিচর্য্যা করিয়াছি। হায়! সেই পরিচর্য্যাই আমার সর্ব্বনাশ করিল!"

আমি বলিলাম—"দেবি! এ জীবন তোমার করুণাতেই বাঁচিয়াছে। এ হতভাগ্য প্রাণের উপর তোমার পূর্ণ অধিকার। কিন্তু আমি অতি দুর্ভাগ্য। তোমায় লাভ করা অনেক সুকৃতির কাজ। আমার এ দুরাশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।"

রুবিয়া আগ্রহের সহিত বলিল—"কেন! কেন! প্রিয়তম? তোমার আশা পূর্ণ হইবে না কেন?

আমি রুবিয়ার সেই পুষ্পকোমল, সুন্দর হাত দুখানি ধরিয়া, নিরাশা পীড়িত হৃদয়ে, কম্পিতস্বরে বলিলাম—"আহম্মদনগরের সুলতান তোমার হস্তপ্রার্থী! আর বাদশাহ তাঁহাকে যখন কন্যাদানে প্রস্তুত, সেরূপ স্থলে আমার সুখের আশা কোথায় রুবিয়া?"

এই কথা শুনিয়া, রুবিয়ার সদাপ্রফুল্ল মুখখানি মলিন হইয়া গেল। সেই সরল হাস্য-রসসিক্ত ওষ্ঠাধর, নিরাশার কম্পনে, মৃদুমৃদু কাঁপিতে লাগিল। রুবিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"আমি তোমাকে হৃদয় দান করিয়াছি। এ হৃদয়ে তোমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেছি। বাজ্ বাহাদুরের কন্যা হইয়া, আমি তো দ্বিচারিণী হইতে পারিব না। সেই হীনচরিত্র, কুৎসিতদর্শন সুলতানকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। পিতার সহস্র নিপীড়ন, আমার ঘৃণাকে অনুরক্তির পথে লইয়া যাইতে পারিবে না। ইস্কান্দার! প্রিয়তম! আমার এই কণ্ঠহার আমি তোমার গলায় দিতেছি। জানিও—ইহাই আমাদের বিবাহ! খোদা সাক্ষী! অই নৈশ সমীরণ সাক্ষী! জ্যোৎস্না-প্লাবিত ঐ স্নেহময়ী প্রকৃতি সাক্ষী।

নীলাকাশ বিহারী জ্যোতিষ্ক সম্রাট্ অই চন্দ্র সাক্ষী। আজ হইতে আমি তোমার চরণের দাসী হইলাম। রাজরাণী হওয়ার সুখ আমি চাহি না।"

এই প্রেমোচ্ছ্বাসময় কথায়, হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, আমি রুবিয়াকে দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলাম।

আমরা যখন এই সুখময় অবস্থায় আত্মহারা, সেই সময়ে কুলসম দ্রুত-বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অতি ব্যাকুল ভাবে, উত্তেজনাময় স্বরে বলিল,—"শাহাজাদী! মহা বিপদ উপস্থিত! বাদশা আসিয়াছেন। এখন উপায় ?"

রুরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—"সর্ব্বনাশ! এখন রক্ষার উপায় কি কুলসম ?"

কুলসম বলিল—"উনি না হয় তোমার বিশ্রামকক্ষে লুকাইয়া থাকুন। সম্ভবতঃ রাদশাহ সে কক্ষে কখনই যাইবেন না।"

আমি ত্বরিতগতিতে কুলসমের নির্দ্দিষ্ট কক্ষের দ্বারের দিকে ধাবমান হইলাম। বারান্দায় পৌঁছিবামাত্রই দেখিলাম, আমার সম্মুখে এক দীর্ঘাকার মূর্ত্তি। আমি পলাইতে যাইতেছি, এমন সময়ে সেই বীরপুরুষ, অসি নিষ্কাষণ করিয়া, বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কে তুই ?"

আমি বাক্যহীন অবস্থায় প্রস্তরমূর্ত্তির মত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল। চক্ষু কর্ণ নাসা ভেদ করিয়া, যেন জ্বালাময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।

আমি সে গম্ভীর স্বর শুনিয়াই বুঝিয়াছিলাম, যে আমি মালবেশ্বরের সম্মুখে পড়িয়াছি। এইবার আমার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

মালবেশ্বর, তাঁহার পার্শ্বচর এক প্রহরীকে আলোক আনিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ সে একটী জলন্ত বর্ত্তিকা লইয়া আসিল।

বাদ্‌শাহাদুর সেই বর্ত্তিকালোকে আমায় চিনিতে পারিয়া বলিলেন,

"ইস্কান্দার খাঁ! তুমি এখানে কেন? মালবের বাদশার কন্যার আরাম প্রাসাদে তোমার মত হীন্ নফর, কোন সাহসে প্রবেশ করিয়াছে?"

আমি কক্ষতলে বসিয়া, তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া, ভয়চকিত স্বরে বলিলাম—"জাঁহাপনা! এ ক্ষেত্রে সত্যই আমি অপরাধী! আমায় আপনার ইচ্ছামত দণ্ড দিন! প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু আমি এখানে কেন আসিয়াছি—সে সম্বন্ধে কোন কিছুই বলিব না।"

মালবেশ্বরের ইঙ্গিতে, প্রহরীগণ তখনই আমাকে বন্দী করিল। বাজ্-বাহাদুর সেই বারান্দার মধ্যে এক আসন গ্রহণ করিয়া, অতি কঠোর স্বরে ডাকিলেন—"কুলসম?"

শরপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে, কুলসম মালবাধিপতির সম্মুখে আসিল। ভয়ে ভয়ে আভূমি-প্রণত হইয়া এক কুর্ণীশ করিল।

বাজ্‌বাহাদুর কঠোর স্বরে বলিলেন—"শয়তানী! তোকে কুকুর দিয়া খাওয়াইব। সত্য বল্—এ সব ব্যাপারের অর্থ কি? এ শয়তান নফর ইস্কান্দার খাঁ—আমার কন্যার কক্ষে কেন?"

কুলসম কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"জাঁহাপনা! এ ব্যাপারে শাহাজাদীর কোন অপরাধই নাই। এই সাহেবেরও কোন অপরাধ নাই। যদি কেহ এ ব্যাপারে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করিয়া থাকে, ত সে আমি।"

এই কথা বায়ুস্তরে বিলীন হইতে না হইতেই, রুবিয়া উন্মাদিনী বেশে পিতার নিকট আসিয়া, তাঁহার চরণে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "পিতা! রাজরাজেশ্বর! ন্যায়-বিচারের জন্য আপনার প্রজারা আপনাকে বড়ই সম্মান করে। আমি আপনার কন্যা হইলেও—প্রজা। আমি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিতেছি। এই ইস্কান্দার খাঁর এমন সাহস নাই, যে সে বিনা আহ্বানে মহাপরাক্রান্ত বাজ্‌বাহাদুরের কন্যার পবিত্র কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে! আমিই উহাঁকে পত্র লিখিয়াছি। আমি বাঁদী

পাঠাইয়া উঁহাকে এখানে আনিয়াছি। খালি তাই নয়—সাহান্‌শা! আমি আমার কণ্ঠহার বিনিময়ে উঁহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

"বটে—কলঙ্কিনী! আচ্ছা আমি তোর প্রার্থনামতই এখনই ন্যায়-বিচার করিতেছি। যখন তুই আমার অমতে, ইহাকে স্বামীরূপে বরণ করিয়াছিস্, রাজপুত্রকে ত্যাগ করিয়া এক নফরের নফরকে ভাল বাসিয়াছিস্, আমার বংশ-গৌরবে কলঙ্ক আনিয়াছিস্, তখন আমিই স্বহস্তে তোর অকাল বৈধব্য ঘটাইব।" এই বলিয়া বাজ্‌বাহাদুর ত্বরিত গতিতে শাণিত কৃপাণ কোষমুক্ত করিয়া, আমার মস্তক লক্ষ্য করিলেন।

আমি ভূতলে বসিয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া, দীনভাবে বলিলাম—"জাঁহাপনা! এ মস্তক আমি স্বেচ্ছায় পাতিয়া দিতেছি। এখনি আমায় বধ করুন। শাহাজাদীর কোন দোষই নাই।"

এমন সময়ে কোথা হইতে এক নীলবসন-পরিহিতা, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বিদ্যুৎবেগে আসিয়া, বাদশাহের হাতখানি ধরিয়া, তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"বাজ্‌বাহাদুর! একদিন তুমি যোড়হস্তে আমার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলে। আজ আমি তোমার নিকট করজোড়ে, এই যুবকের ও তোমার কন্যার জীবন ভিক্ষা করিতেছি। মালব সম্রাট! আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

এই আগন্তুককে আর কেহ চিনিতে না পারিলেও—বাজবাহাদুর তখনই চিনিলেন। মালবেশ্বর, তৎক্ষণাৎ সেই তীক্ষ্ণধার অসি কোষ-নিবদ্ধ করিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন—"তুমি! তুমি! এ বেশে এতদিন পরে? তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

সেই নীলবসনা-রমণী বলিল—"সব বলিব। কাল রাত্রে তোমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিয়া সব বলিব। আমি তোমার রাজ-বিধানের অবমাননা করিতে চাই না। তুমি এই ইস্কান্দার খাঁকে

বন্দী করিয়া কারাগারে রাখিয়া দাও, কিন্তু উহার প্রাণবধ করিও না। রাজরাজেশ্বর! আমার হস্তস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, যে আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে!"

বাজ্‌বাহাদুর মুগ্ধস্বরে বলিলেন—"একদিন যখন তোমার ঐ চরণে আমার সর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিলাম, যখন তোমার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলাম, তখন তোমার এরূপ একটী সামান্য অনুরোধ রক্ষায় আমি অসম্মত হইতে পারি না। আমি কুলসম ও ইস্কান্দারের কারাবাস আদেশ করিতেছি। আমার কন্যার অপরাধের বিচার পরে করিব।"

সেই রমণী আর কিছু না বলিয়া, কৃতজ্ঞভাবে মস্তক অবনত করিয়া, বাজ্‌বাহাদুরকে সেলাম করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষ হইতে চলিয়া গেল!

প্রহরীগণ, আমাকে ও কুলসমকে লইয়া, কারাগারে চলিয়া গেল। বাজ-বাহাদুরও সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। সুতরাং সেই স্থানে রহিল, কেবল রোরুদ্যমানা, ভয়-কম্পিতা—রুবিয়া! আমি রুবিয়াকে কোন কিছু না বলিতে পারিয়া, দারুণ মর্ম্মজ্বালা ভোগ করিতে লাগিলাম। আর তখনও বুঝিতেও পারিলাম না—এই অর্দ্ধাবগুণ্ঠবতী নীলবসনা সুন্দরী কে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বাজ্‌বাহাদুরের আদেশ, পুনরায় আমি এক হতভাগ্য বন্দী। কিন্তু এ বারের কারা-যন্ত্রণা যেন অতি ভীষণ। আমি ভূগর্ভস্থ এক অন্ধ-কারময় পাষাণ গুহায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। সেখানে আলো নাই, বাতাস নাই, প্রেতের নিশ্বাস শব্দ পর্য্যন্ত নাই।

আলোকের রেখামাত্র দেখিতে পাইতেছি না। কয়দিন যে এরূপভাবে কাটিল, তাহাও বলিতে পারি না। কক্ষতলে একখানা কম্বল মাত্র

একটী ময়লা বালিস। রক্তশোষিণী চিন্তায়, শরীর ও মন যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়, তখন একটু নিদ্রা আসে। কোন্ সময়ে তা ঠিক্ জানি না, প্রতিদিন একটা লোক আলো হাতে করিয়া, কিছু খাবার রাখিয়া যায়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে কোন কথার উত্তর দেয় না। আহারেও আমার কোন রুচি নাই। কোন দিন খাই, কোন দিন বা সমস্ত খাদ্য পড়িয়া থাকে।

নিজের ভবিষ্যৎ ভাবনায় আমি তিলমাত্র কাতর নই, কিন্তু রুবিয়ার পরিণাম ভাবিয়া, আমি উন্মাদের মত হইয়া উঠিলাম। আহা! সেই সরলপ্রাণা, হয়তো আমারই মত নির্জ্জন কারামধ্যে নিক্ষিপ্তা হইয়া, কতই না অসহনীয় কষ্ট পাইতেছে!

তৎপরে ভাবিলাম, কে সেই নীলবসন-পরিহিতা মহিমময়ী রমণী, যে এক কথায়, বাজ্ বাহাদুরের মত পুরুষ প্রকৃতির লোককে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল! অস্পষ্ট আলোকে তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখ দেখিয়া, তাহাকে চিনিতে পারি নাই বটে—কিন্তু তাহার বীণার ঝঙ্কারমাখা কণ্ঠস্বর যেন আমার পূর্ব্বশ্রুত।

এই সব দারুণ দুশ্চিন্তায় আমার দিন রাত কাটিতে লাগিল। কোনদিন বা আতঙ্কময় স্বপ্নে দেখিতাম, তাতারীরা রুবিয়াকে রাজাদেশে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। তাহার সেই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য, সুকোমল দেহ, শোণিত প্লাবিত হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছে। কেহই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য একটী কথাও বলিল না। স্বল্পদিনের জন্য সুখময় বেহেস্ত হইতে জ্বালাময় এ দুনিয়ায় সে আসিয়াছিল। আর এই নিষ্ঠুর নর-জগতের অত্যাচার, জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, সে যেন আবার সেখানে চলিয়া গেল।

চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আর ত এ যন্ত্রণাময় নির্জ্জনতা সহ্য

হয় না। চোর হউক, নরঘাতক হউক, একটা মানুষ আমার মিলাইয়া দাও খোদা! তাহার সহিত একটী কথা কহিয়া বাঁচি।"

সহসা সেই ভীম তমসাপূর্ণ কারাকক্ষের বক্ষ ভেদ করিয়া, এক ক্ষীণ আলোক রেখা ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম, কে যেন একজন জ্বলন্ত বর্ত্তিকা-হস্তে, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া, অতি সন্তর্পণে সেই কারাকক্ষের চাবি খুলিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সে—স্ত্রীলোক। তবে কি কোন তাতারী আমায় গুপ্তভাবে হত্যা করিতে আসিয়াছে?

সেই রমণী কারাকক্ষের দ্বার খুলিয়া, হস্তস্থিত জলন্ত বর্ত্তিকাটী দূরে রাখিয়া বলিল—"অপরাধী! এইমাত্র তুমি না একজন মানুষ চাহিতে ছিলে? সত্য বল দেখি—তুমি মানুষ চাও, না মুক্তি চাও?"

আমি বলিলাম—"আমি মুক্তি চাই। পশুপক্ষীও যখন স্বাধীনতার প্রয়াসী, তখন আমি না হইব কেন? কিন্তু তার আগে আমি আমার রুবিয়ার সংবাদ জানিতে চাই।"

"রুবিয়া? তাহার সহিত তোমার সম্পর্ক কি বন্দী?"

"সে আমার জীবনীশক্তি। আমি দেহ—সে প্রাণ। আমি আধার-আধেয়। সে আমার সর্ব্বস্ব! সে পত্নী—আমি স্বামী!"

"রুবিয়ার সংবাদ যদি আমি তোমায় না বলি?"

"এই কারাগার হইতে এক পাও নড়িব না।"

"বোধ হয় তুমি জান না, কাল প্রত্যূষে তোমায় অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার জন্য, রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছে।"

"কেন—কি অপরাধে?"

"তুমি শাহাজাদী রুবিয়ার কক্ষে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিয়াছিলে বলিয়া!"

"পতিপত্নীর পবিত্র মিলন যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি তাহার জন্য মরিতেও প্রস্তুত।"

"বুঝিলাম—তুমি রুবিয়াকে ভালবাস। কিন্তু রুবিয়াও যে তোমার মত কষ্টকর কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অধিকন্তু—সে তথায় পীড়িতা। রাজাদেশে তাহার মৃত্যু না হইলেও, রোগে সে নিশ্চয়ই মরিবে।"

"কেন এ সংবাদ আমায় শুনাইলে বিবি! আমাকে নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা-দেওয়াই কি তোমার উদ্দেশ্য?"

"না আমি তোমাকে কারামুক্ত করিতে আসিয়াছি।"

"আমি কখনই এ কারাগারের বাহিরে যাইব না। যাহার জন্য আমার এ অস্তিত্ব, জীবনে সাধ, সে যখন মরিতে বসিয়াছে, তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

"শোন তবে, আমার কথা। তোমাকেও মরিতে হইবে না, তাহাকেও মরণের রাজ্যে যাইতে দিব না। আমি তোমাদের দুইজনকেই উদ্ধার করিব।"

"কে তুমি—দেবী? বল কোন্ বেহেস্তে তোমার নিবাস?

"দুর্ভাগ্য ইস্কান্দার খাঁ! আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি গুলসানা।"

"গু—ল্—সা—না!"

"হাঁ—সোহানীর গরীয়সী বিধবা পত্নী হতভাগিনী গুলসানা। তোমারই হস্তে নিগৃহীতা, ভিখারিণী গুলসানা।"

"গুলসানা! আর আমাকে লজ্জা দিও না। এত দিন তুমি কোথায় ছিলে গুলসানা? তুমিই কি সে দিন বাজ বাহাদুরকে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলে?"

"সে সব কথা পরে বলিব। ইস্কান্দার! এখনই আমার সঙ্গে এস। নহিলে আগামী প্রভাতে, ঘাতকের শাণিত অস্ত্রে, তোমার অতি শোচনীয় মৃত্যু ঘটিবে।"

গুলসানা জোর করিয়া আমার হাত ধরিয়া উঠাইল। আমাকে

টানিয়া লইয়া, কারাকক্ষের বাহিরে আসিয়া, অতি ধীরে ধীরে কক্ষ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার কৃপায়, আমি কারামুক্ত হইয়া—উন্মুক্ত রাজপথে আসিলাম। গুলসানা চলিয়া যাইবার সময়, কেবলমাত্র আমায় বলিয়া গেল—বেশী কথা কহিবার সময় নাই। এই বাজ বাহাদুর জাতিতে পাঠান। ভয়ানক প্রতিহিংসা পরায়ণ এ পাঠান জাতি। ধরা পড়িলে—তোমার প্রাণ ত যাইবেই, অথচ আমিও লাঞ্ছিত হইব। সময় অতি অল্প। আজ রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে, অভাগিনী কুলসমকেও উদ্ধার করিতে হইবে। শাহাজাদী রুবিয়ারও একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই পত্র খানি রাখিয়া দাও। ইহাতে যে উপদেশ দিয়াছি, সেই অনুসারে কাজ করিও। তাহা হইলে তুমি নিরাপদ। না করিলে, নিশ্চয়ই—জানিও, মৃত্যু—তোমার শিয়রে!"

আকাশ—তখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন। আমি প্রাণভয়ে, দ্রুতপদে, সেই ভীষণ প্রলয়ান্ধকার রাশি মথিত করিয়া চলিতে লাগিলাম।

নির্জ্জনতায় চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি হয়, পথও কমিয়া আসে। আমি নানা-কথা ভাবিতে ভাবিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, সেই প্রসূন-প্রতিমা তুল্য, কোমলাঙ্গী রুবিয়া, কারাগারে জানি না কতই কষ্ট পাইতেছে? সে মাতৃহীনা, কিন্তু, শুনিয়াছি নূতন রাণী রূপমতী, তাহাকে বড় স্নেহ করেন। রূপমতী বেগমের কৃপায়, রুবিয়া হয়ত এতক্ষণে কারামুক্ত হইয়াছে। কিন্তু রূপমতী বেগম, যদি তাহাকে মুক্ত করিতে না পারেন, রুবিয়া যদি রোগযন্ত্রণায় মরিয়া যায়! তাহা হইলে আমার যে সর্ব্বনাশ হইবে! রুবিয়া গেলে, আমি কি লইয়া ইহসংসারে থাকিব? রুবিয়া—যে আমার সর্ব্বস্ব! দেহ, প্রাণ, আশা, আনন্দ, সবই যে—আমার সে! ভরসা উৎসাহ, সুখ দুঃখ, সবই যে—আমার সে।

দুশ্চিন্তা আমার শক্তিক্ষয় করিল। আবার ভাবিলাম, হয়তঃ রুবিয়ার

সেই কুসুমকোমল বর বপু, কালের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যময় দেহ, নিশ্চলভাবে ভূমিতলে পড়িয়া আছে। তাহাতে রূপ আছে, প্রাণ নাই! সৌন্দর্য্য আছে—ভাষা নাই। সকলে যেন তাহার সেই সুন্দর দেহ, শীতল সমাধিগর্ভে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। সেই আগুল্ফলম্বিত সুকৃষ্ণ কেশপাশ, আলুলায়িত ও বিশৃঙ্খল। সেই কৃষ্ণতারকাময় আয়ত লোচনদ্বয়, চিরজন্মের মত মুদিত। সেই বান্ধুলি-রাগ-রঞ্জিত উৎফুল্ল ওষ্ঠাধর, একেবারে নীরস, বিবর্ণ ও চির-শীতল। সেই পুষ্প-কোমল-স্পর্শময় সুকান্তি মণ্ডিত বরাঙ্গ, স্পন্দহীন, উত্তাপহীন, সৌন্দর্য্যহীন।

রুবিয়ার মৃত্যুর আশঙ্কায়, আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। দুর্নিমিত্ত কল্পনায়, আমার চিন্তাব্যথিত ক্ষীণ মস্তিষ্ক ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি ঘোর উন্মাদ! সম্মুখে—খরস্রোতা নর্ম্মদা, কলকল গর্জ্জনে ছুটিতেছে। বিরাট নৈশ-নিস্তব্ধতার মধ্যে, সে ভীম গর্জ্জন আরও রুদ্রগম্ভীর স্বরে কঠোর প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিতেছে।

বুঝিলাম—আমার মত হতভাগ্যের মৃত্যু ভিন্ন সুখ নাই, শান্তি নাই, জ্বালার অবসান নাই। রুবিয়া—নিশ্চয়ই মরিবে। রোগে না মরিলেও, বাজ্ বাহাদুরের প্রদত্ত, গুপ্ত বিষে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত! কারণ, সে কখনই আহম্মদনগরের সুলতানকে বিবাহ করিবে না। যে দিকেই দেখি, কেবল মরুবৎ অনন্ত নিরাশা। রুবিয়া যদি গেল—আমার রহিল কি? না—না—মৃত্যুই আমার এ মহা নিরাশার একমাত্র মহৌষধ।

তখন কে যেন আমার হৃদয়ের মধ্য হইতে বলিয়া দিল, "রুবিয়াকে তুমি পাইবে—কি এ জ্বালাময় মর জীবনে নয়। অভিশপ্ত ভালবাসা লইয়া তুমি ধরায় আসিয়াছ। যাহাকে ভালবাসিবে, তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে! যদি রুবিয়াকে চাও, তাহা হইলে পরলোকে গিয়া

তাহার জন্য অপেক্ষা কর! মৃত্যুর পথ অতি সহজ! ঐ দেখ ভীম ভৈরব গর্জ্জনে, প্রচণ্ড বেগবতী রেবা নদী উন্মাদিনীর মত ছুটিতেছে। এখনই ঐ শৈলমালা সুবেষ্টিতা, কলনাদিনী নর্ম্মদার সুশীতল সলিলগর্ভে, আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, রুবিয়ার সহিত পরলোকে মিলিত হও।"

আমি পিশাচের মত সেই অন্ধকাররাশি মথিত করিয়া, নর্ম্মদাতীরে আসিলাম। নদীর তীর-ভূমি, ক্ষুদ্র শৈলমালা মণ্ডিত ছিল। আমি ধীরে ধীরে এক ক্ষুদ্র শৈলস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

নদী-বক্ষও ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! সেই শান্ত, স্থির, শব্দশূন্য, স্পন্দনশূন্য মৃত্যুভরা নিশীথে, আমি কালের কঠোর আহ্বানে, নিরাশা-পীড়িত হৃদয়ে, নর্ম্মদায় ঝম্প প্রদানের উদ্যোগ করিলাম। কিন্তু আমার সে উদ্দেশ্যও বিফল হইয়া গেল। কে যেন পশ্চাৎদিক হইতে, দ্রুতবেগে আসিয়া সবলে আমার বস্ত্রাকর্ষণ করিল। আবার আমি আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিলাম।

আমি রুষ্ট স্বরে বলিলাম—"কে তুমি? আমি দুঃখের জ্বালায় মরিতে যাইতেছিলাম, তুমি তাহাতে বাধা দিলে কেন?"

সেই মূর্ত্তি দীর্ঘাকার। তাহার আপাদমস্তক—বস্ত্রাবৃত। সে যে ভয়ানক শক্তিশালী, তাহা তাহার আকর্ষণমাত্রেই বুঝিলাম। ঘোর অন্ধকার বেষ্টিত সেই অপরিচিত পুরুষ, গম্ভীরস্বরে বলিল—"মুসাফের! যে মনুষ্য-জন্মের জন্য জীব অতি লালায়িত, তুমি স্বেচ্ছায় তাহা নষ্ট করিতেছিলে কেন?"

আমি বলিলাম,—"সুখভোগের জন্যই ত জীবন। যাহার জীবনে কোন সুখ নাই, তাহার পক্ষে মৃত্যুই যে শ্রেয়ঃ।"

আগন্তুক কঠোর হাস্যের সহিত বলিল,—"জীবন কখনও সুখ শূন্য হইতে পারে না। যাহাকে দুঃখ বলিয়া আমরা ভাবি—সেটা যেমন ভ্রম, আর সুখও—তেমনি ভ্রম। মায়া এবং একান্ত স্বার্থপরতাই সুখ ও দুঃখ সৃষ্টি

করে। তবে মানুষ যদি চিত্তজয় করিতে পারে, তাহাহইলে তাহার আর সুখ দুঃখের বিভিন্নতা বোধ থাকে না।"

আমি বলিলাম—"সে চিত্তজয়ের শক্তি ত সবার নাই। অপরন্তু অবিচ্ছিন্ন নিরাশা এবং দুঃখ লইয়াও ত মানুষ বাঁচিতে পারে না।"

"তুমি দরিদ্র?"

"ছিলাম,না—এখন হইয়াছি।"

"অর্থ চাও?"

"না!"

"দরিদ্র—অথচ অর্থ চাও না! তুমি বলিতেছে, দুঃখের জ্বালায় মরিতে আসিয়াছিলে। অর্থ দ্বারা ত তোমার দুঃখমোচন হইতে পারে। বল, কি চাও? কি হইলে সুখী হও? আমি একজন সংসার বিরাগী ফকির। কিন্তু খোদার কৃপায়, সম্রাট্ আকবর-শা পর্য্যন্ত আমায় ভক্তি করেন।"

"আমি যাহা চাই, সম্রাট ত দূরের কথা, সেই মহা শক্তিমান সম্রাটের সম্রাটও তাহা দিতে অসমর্থ!"

"ঘোর মূর্খ তুমি! বিকৃতবুদ্ধি তুমি! খোদার মহাশক্তিতে অবিশ্বাস করিতেছ? তিনি না পারেন, এমন কোন কাজই এ দুনিয়াই নাই। বল—তুমি কি চাও?"

"সাহেব! আপনার সাধ্যাতীত যে কাজ, তাহার জন্য অনর্থক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন না। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা দেওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব।"

"দূর ছাই! কি চাও—তাই আগে খুলিয়া বল না কেন।"

"আমি চাই, এ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধন—রুবিয়া!"

"রুবিয়া?"

"হাঁ—রুবিয়া! মালবপতি বাজ্‌বাহাদুরের কন্যা—রুবিয়া?"

সেই আগন্তুক, আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"আমার সঙ্গে আস্তানায় এস। তুমি নিশ্চয়ই সেই রুবিয়াকে পাইবে। তাহার পূর্ব্বে, আমি তোমার জীবনের সমস্ত কথা জানিতে চাই।"

সেই অন্ধকার-বেষ্টিত, নির্জ্জন পার্ব্বত্য-পথে, আমার হাতখানি ধরিয়া তিনি অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বুঝিলাম সমস্ত পথ ঘাট, যেন তাঁহার চক্ষে, নখদর্পণের মত অতি পরিষ্কার। কিয়দ্দুর গিয়া, তিনি এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গলের একটী বাঁক ঘুরিবার পরই, এক পরিচ্ছন্ন কুটীর পরিদৃষ্ট হইল।

তিনি, সেই ভীষণ জঙ্গলমধ্যস্থ, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের সম্মুখে এক নাতিবিস্তৃত, প্রস্তরমণ্ডিত চাতালে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইলেন। আমায় কিছু ফলমূল ও সুশীতল জল খাইতে দিয়া বলিলেন, "এ গুলি ভক্ষণ করিয়া আত্মাকে সুশীতল কর। আমি এখনই আসিতেছি।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ফকির সাহেব ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "রুবিয়ার জন্য, তুমি আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলে কেন?"

ধীরভাবে, ক্ষুব্ধস্বরে আমি বলিলাম—"প্রভু! জানি না আপনি কে? কিন্তু আপনার প্রতিভা-বিমণ্ডিত মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় দেখিয়া বোধ হইতেছে—আপনি নিশ্চয়ই কোন মহাজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ।"

ফকির একথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"আমি কিছুই নই বাবা! খোদার এ কর্ম্মময় সংসারে তৃণাদপি ক্ষুদ্র। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রুবিয়ার জন্য তুমি আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলে কেন? সত্যই কি, তাহাকে তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাস? না—তাহার অলোকসামান্য

রূপ-মোহিত হইয়া, এক লালসাময় বাসনার অতৃপ্তিতে, আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলে? তুমি কি জান না, ইস্কান্দার খাঁ! আত্মহত্যা মহাপাপ!"

সহসা ফকিরের মুখে আমার নামোচ্চারিত হইতে শুনিয়া, আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। যিনি ইতিপূর্ব্বে আমায় কখনও দেখেন নাই, আমি যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, তিনি আমার নাম জানিলেন কিরূপে? তবে কি এই মহাত্মা যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ!

আমি তাঁহার পদযুগল ধরিয়া, আগ্রহের সহিত বলিলাম—"মহাপুরুষ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। বলুন! রুবিয়া এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না?"

ফকির সাহেব ধীরভাবে বলিলেন,—"বৎস! ব্যস্ত হইও না। অধিক চাঞ্চল্যে, সব কাজ নষ্ট হয়। রুবিয়া—এখনও জীবিতা। তাহার জন্য আশঙ্কা করিও না। আমি এইমাত্র স্বচক্ষে তাহার পীড়ার অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি। মান্দু প্রাসাদ হইতে যখন আস্তানায় আসিতেছিলাম, দেখিতে পাইলাম, তুমি উন্মাদের মত নদীকূলে ধাবিত হইতেছ। বুঝিলাম, আত্মহত্যাই তোমার উদ্দেশ্য। এজন্য কৌতূহল বশে, আমি তোমার অনুসরণ করিয়াছিলাম।"

আমি ব্যস্ততার সহিত তাঁহার পদযুগল ধরিয়া বলিলাম—"বলুন প্রভু! রুবিয়া এখন কোথায়?"

ফকির গম্ভীরমুখে বলিলেন—"সে প্রথমে রাজপ্রাসাদের একটী কক্ষে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু পীড়িতা হইয়া পড়ায়, রাণী রূপমতী তাহাকে নিজের কক্ষে লইয়া রাখিয়াছেন। তাহার পীড়া অতি কঠিন। দুর্ভাবনায় ও অপরিসীম মনঃকষ্টে যে রোগ জন্মিয়াছে, তাহা দুরারোগ্য।"

আমি বলিলাম—"রুবিয়া রাজান্তঃপুরে থাকে। সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। আপনি এ সংবাদ জানিলেন কিরূপে?"

ফকির হাসিয়া বলিলেন—"বৎস! আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছ?

বাজ্‌বাহাদুরের রঙ্গমহালে তুমি গিয়াছিলে কিরূপে? ফকির, সন্ন্যাসী রাজবৈদ্য, ইহারা আহুত হইলেই, রাজান্তঃপুরে যাইতে পারে।"

আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলাম—"আপনি কি চিকিৎসাশাস্ত্রেও অভিজ্ঞ? মালবেশ্বর বাজবাহাদুরও কি আপনার সহিত পরিচিত?"

ফকির হাসিয়া বলিলেন—"তোমার অনুমান যথার্থ। ইস্কান্দার! আমি ইহাও জানি যে তুমি পলায়িত বন্দী। একবার নয়—দুই দুই বার তুমি কারাগার হইতে পলাইয়াছ। এই দুই বারই গুলসানা তোমাকে উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু যখন তুমি আমার আশ্রয়ে আসিয়াছ, তখন তোমার কোন ভয়ই নাই!"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম—"গুলসানা! সোহানীর বিধবা পত্নী? তাহাকে আপনি চিনিলেন কিরূপে?"

ফকির গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"সে কথা নাই বা শুনিলে? তবে এই টুকু জানিয়া রাখ, সে আমার শিষ্যা।"

"গুলসানার কথা এখন থাক্‌। রুবিয়ার সংবাদ, আরও কিছু জানেন ত বলুন?"

"রুবিয়ার জন্য তুমি অতটা অধীরতা দেখাইও না। মহা নিরাশার শেষ যন্ত্রণা, অতি ভয়ানক!"

"হউক— কিন্তু সে যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারেরও ত অনেক উপায় আছে।"

"কি উপায়? আত্মহত্যা! এই মাত্র যাহা করিতে যাইতেছিলে? না বৎস! আত্মহত্যা অতি কাপুরুষের কাজ। এক মহা ঘৃণ্য নারকীয় পাপ। এ সংসারে চিত্তজয়ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি-দমনই প্রকৃত মহত্ব!"

ঠিক এই সময়ে, বাদশাহের একজন পদাতিক সেখানে আসিয়া ফকিরের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। ফকির সাহেব সেই পত্রখানি পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদ-মণ্ডিত ভাব ধারণ করিল।

উৎকণ্ঠিত স্বরে সন্ন্যাসী আমায় বলিলেন—"ইস্কান্দার খাঁ! আমার নাম শাহজালাল ফকির। তোমাকে আল্লার নামে অনুরোধ করিতেছি, যতক্ষণ না আমি বাজবাহাদুরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ স্থিরভাবে এই স্থানে অপেক্ষা কর।" এই কথা বলিয়া তিনি সেস্থান ত্যাগ করিলেন। ঝটিকাক্রান্ত পথিক, যেমন ভীষণ বজ্রনাদে চমকিত হইয়া উঠে, শাহজালালের নাম শুনিয়া, আমার মন সেইরূপে চমকিয়া উঠিল। যে শাহজালাল ফকিরের নিকট, দিল্লীশ্বর আকবরশাহ অবনত-শির, আজ আমি তাঁহারই আশ্রয়ে। কাজেই তিনি এইমাত্র আমায় যে আদেশ করিলেন, তাহা লঙ্ঘনের সাধ্য আমার নাই!

মনে কিন্তু নানা অশুভ কল্পনা উঠিতে লাগিল। ফকির সাহেব অত দ্রুত-বেগে চলিয়া গেলেন কেন? এখনও ফিরিতেছেন না কেন? তবে কি রুবিয়ার পীড়া কঠিন হইয়াছে? বিশ্বপাতা বিধাতা! করিলে কি প্রভু? নিরাশার ঘোর অন্ধকার মধ্যে কণামাত্র আলোকছটা দেখিয়া, উল্লাসময় প্রাণে সংসার পথে ধাবিত হইতেছিলাম, সে আলোকটীও নিভাইয়া দিলে! সবই অদৃষ্ট! যত পার যন্ত্রণা দাও, কিন্তু আমি কিছুতেই রুবিয়ার স্মৃতি ভুলিতে পারিব না। জীবনেও নয়—মৃত্যুতেও নয়। ইহলোকে নয়—পরলোকেও নয়। রুবিয়া! রুবিয়া! জানি না—এখনও তুমি জীবিত আছ কি না?"

সহসা সেই প্রস্ফুট দিবালোকে, কে একজন আমার সম্মুখে আসিয়া ডাকিল—"ইস্কান্দার খাঁ!" আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—সে গুলসানা।

গুলসানা আমার কাছে বসিয়া ধীরভাবে বলিল—"ইস্কান্দার খাঁ! রুবিয়ার জন্য অত কাতর হইলে ত চলিবে না।"

আমি বলিলাম—"গুলসানা! আমি এ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যেই ডুবিতেছি। উজ্জ্বল আলোকের রেখাটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। এত দিন পরে এ চির আঁধার জীবনে, যেন একটু ক্ষীণ আলোকজ্যোতিঃ

পাইয়াছিলাম। আর তাহা দেখিয়া, এক কল্পনাতীত সুখের স্বপ্নে, প্রাণ বিভোর করিয়াছিলাম। হায়! গুলসানা! ভাগ্য দোষে আমার সে সাধের সুখ স্বপ্ন, বুঝি বা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।"

গুলসানা বলিল—"বৃথা কাতর হইও না তুমি ইস্কান্দার! মানুষ মরিতে পারে, কিন্তু ভালবাসার মৃত্যু নাই! দেহের সুখ যাহারা চায়, তাহারা ভাবে, ইহলোকেই সব শেষ হইল! কিন্তু তাহারা একবারও বুঝিয়া দেখে না, যে দুনিয়াতে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে, ফুল শুকাইয়া যায় মৃত্যু যেখানে চিরদিন আসন পাতিয়া বসিয়া আছে, সেখানে বিচ্ছেদ-বিহীন ভালবাসা—অসম্ভব! স্বার্থ এবং বাসনা-পীড়িত লোকে, প্রিয়বিরহে দুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশা, মর্ম্মজ্বালায় জ্বলিয়া মরে, কিন্তু যাহারা নিজের সুখ ছাড়িয়া ভালবাসার সুখ চায়, তাহারা ইহলোকের আশাকেই পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করে না।"

আমি বলিলাম,—"গুলসানা! স্বীকার করিতেছি, আমি আত্মসুখ-পরায়ণ, প্রবৃত্তিলোলুপ, রূপমুগ্ধ! এ স্বার্থময়, আকাঙ্ক্ষাময় জগতে, অমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা কোথায় পাইব? আমি ভোগ চাই, ত্যাগ চাই না। অনুরাগ চাই, বিরাগ চাই না। মিলন চাই– বিরহ চাই না। সুখ চাই, দুঃখ চাই না। তোমার কথিত নিঃস্বার্থ ভালবাসা কোথায় পাইব গুলসানা?"

গুলসানা বিদ্রূপের সহিত বলিল,—"ইস্কান্দার! সত্যই তুমি রূপ মুগ্ধ, প্রবৃত্তি লোলুপ। প্রকৃত ভালবাসা যে কি, তাহা এখনও বুঝিলে না। এ জন্মেও বুঝিবে না। দেখিতেছি, তোমার ভালবাসার সঙ্গে খোদার একটা অভিসম্পাত জড়িত আছে। রূপমুগ্ধ হইয়া আমার আশায় একবার তুমি উন্মত্ত হইলে। ফলে আমার সর্ব্বস্ব গেল—আমি স্বাধীন রাজ্যেশ্বরী ছিলাম, শেষ কিনা পথের ভিখারিণী হইলাম! যাহার আশ্রয়ে কত লোক প্রতিপালিত হইত, সে নিরাশ্রয় হইয়া, এই প্রসিদ্ধ-ফকির শাহজালালের আশ্রয় প্রার্থনা

করিল। তারপর তুমি রুবিয়াকে ভালবাসিলে। জীবনে তাহার কত সুখ ছিল, কত আনন্দ ছিল, কত আলো ছিল, কত আশা ছিল। কিন্তু তোমার আকাঙ্ক্ষার পৈশাচিক ফুৎকারে সব নিবিয়া গেল! তুমি নিজে মজিলে, তাহাকেও মজাইলে! রাজকন্যা হইয়াও সে এখন সামান্যা রমণীর মত নিগৃহীতা, লাঞ্ছিতা, কঠোর মর্ম্মবেদনা-কাতরা। ভিন্নবক্ষা শুক্তির মত, যন্ত্রণায় ধরাশায়িনী! এই ভরা যৌবনে আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, সুখ, সব অপূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া সে কিনা মরিতে বসিয়াছে! ইস্কান্দার! সত্যই আমি ঘটনা-পরম্পরা বিচারে বুঝিতেছি, তোমার ভালবাসায় অভিশাপ আছে। তুমি ভালবাসিয়া জীবনে কখনও সুখ পাইবে না।"

এই উত্তেজনাময় শ্লেষ-মাখা তীব্র তিরস্কার বাক্যগুলি শেষ করিয়াই গুলসানা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই আস্তানার মধ্যে অদৃশ্য হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"রুবিয়া মরিয়াছে!"

ভীষণ বজ্রধ্বনির মত, ভৈরব-হুঙ্কারে কে যেন বায়ুস্তর বিকম্পিত করিয়া, বজ্রনাদে বলিল,—"রুবিয়া মরিয়াছে!!"

প্রতিধ্বনি সেই কথা বুকে করিয়া লইয়া, আমার কাণের কাছে, আসিয়া বলিল—"রুবিয়া মরিয়াছে! হতভাগ্য ইস্কান্দার! তোমার আশা-ভরসা সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে।"

এই কথা শেষ না হইতে হইতে, অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে সেই শান্ত সৌম্য-মূর্ত্তি শাহজালাল আসিয়া, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভীষণ স্বরে বলিলেন "রুবিয়া মরিয়াছে!"

আমি নিশ্চল,—নিস্পন্দ। আমার মাথার ভিতর দিয়া অগ্নি স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। সেই অগ্নিস্রাবের জ্বালাময়ী শিখা, নেত্র দিয়া বাহির

হইবার চেষ্টা করিতেছিল। সর্ব্ব শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীতে, বিদ্যুতের স্রোত বহিতেছিল। শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, কালসর্পের তীব্র হলাহলের উৎকট যাতনা দেখা দিল। বিকল হৃদয়, যেন অতিরিক্ত স্পন্দনপূর্ণ হইল! ভাষা-যেন শব্দঝঙ্কার হীন হইল! আর প্রাণ, চিতামধ্যস্থ শবদেহের ন্যায় ধীরে পুড়িতে লাগিল! খোদা! প্রভু! কি শুনি? রুবিয়া মরিয়াছে! স্বর্ণপ্রতিমা রুবিয়া আর ইহলোকে নাই? হা ভাগ্য! হা কর্ম্মফল!

আমি মনে মনে বলিলাম—"এই নৈশান্ধকার চির দিনের জন্য এ বিরাট বিশ্ব গ্রাস করুক। আর যেন শস্য-সম্পদময়ী শ্যামলা প্রকৃতি সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল না হইয়া উঠে! যেন চির তমসায় এই বিশ্বের শোভা-সম্পদ ডুবিয়া যায়। বজ্রের প্রদীপ্ত অগ্নিতে, যেন এই শোভাময়ী বিশ্ব, ভস্মে পরিণত হয়। সূর্য্য চন্দ্র কক্ষচ্যুত হইয়া, যেন ধূলায় লুটায়। যাক্—সব ছারে খারে যাক্। যখন রুবিয়া গিয়াছে—তখন সব যাক্। পৃথিবীর বুকে প্রেত-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক!" কিন্তু আমার এ দারুণ অভি-সম্পাতের কোন ক্রিয়াই হইল না। নৈশান্ধকারময়ী, তারকামালিনী মেদিনী, যেমন ছিল—তেমনই রহিল। আমার অন্তরে মহা প্রলয় গর্জ্জন, কিন্তু বাহিরে বিশ্বের স্থির শান্তিময় সৌন্দর্য্য! কি মূর্খ আমি! আমার ইচ্ছায় কিনা বিশ্বে মহাপ্রলয় ঘটিবে? আমি তখন এতই অবিদ্যা-বিমুগ্ধ, শোকে কাতর, বাহ্যজ্ঞান বিহীন!

শাহজালাল, মৃদুভাবে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। সে শক্তিময় পবিত্র স্পর্শে, যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

স্নেহপূর্ণ স্বরে আমার পৃষ্ঠদেশে হস্তাবমর্ষণ করিয়া শাহজালাল বলি-লেন—"বৎস ইস্কান্দার! কাতর হইও না। এ মিথ্যাময় জগতে, মৃত্যুই স্থির ও অভ্রান্ত সত্য। জীব মরিবার জন্যই দুনিয়ায় জন্মিয়াছে। মৃত্যুর হস্ত

হইতে কাহারও নিস্তার নাই। মৃত্যুতে শোক—মুর্খের কার্য্য। মৃত্যুতেই শান্তি। মৃত্যুতেই এ মর প্রবাসের কষ্টের শেষ। মৃত্যু—নূতন জীবন।"

আমি উন্মাদবৎ বিকট-দৃষ্টিতে, একবার সেই শান্ত, সৌম্য—গুণাশ্রয়, সংসার মোহমুক্ত, সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেন দীপ্তাগ্নির মত জ্বলিতেছে। তিনি ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বৎস! এই জগৎ যেমন সত্য, তুমি আমি যেমন সত্য, এই নিশা-সমাগম যেমন সত্য, রুবিয়ার মৃত্যুও সেইরূপ স্থির ও নিশ্চিত।"

"আপনি স্বচক্ষে রুবিয়ার মৃত্যু দেখিয়াছেন কি প্রভু?"

"হাঁ!"

"সেই সুন্দর দেহ, এখন নিস্পন্দ, স্থির ও বাক্যহীন!"

"হাঁ"—

"আপনার চক্ষু প্রতারিত হয় নাই ত?"

"তুমি মূঢ়, ভ্রান্ত, ভালবাসায় অন্ধ! তাই একথা বলিতেছ।"

"না প্রভু! বোধ হয় আপনিই ভ্রান্ত! রুবিয়া কখনও মরিতে পারে না। তাহার নিশ্বাস সুগন্ধে আমার প্রাণ এখনও বিভোর। তার বীণা-নিন্দিত সুস্বর লহরীতে এখনও আমার কর্ণ পরিসিক্ত। তাহার অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের সমুজ্জল আলোকে, এখনও আমার নেত্র ঝলসিত। রুবিয়ার নশ্বর দেহের মৃত্যু হইয়াছে—কিন্তু রুবিয়া মরে নাই। সে আমার সম্মুখে, হৃদয়ে, পার্শ্বে ও প্রাণের মধ্যে। এই বিরাট বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া, তাহার পঞ্চভূতময় দেহের শক্তি ও অপূর্ব্ব মধুরিমা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার অফুরন্ত রূপ, এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-সমষ্টি সমন্বিত, বিশাল জড়-জগতের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত! প্রভু! সে মরে নাই—সে চির জীবিত। আপনি ভ্রান্ত!"

আমি আর বলিতে পারিলাম না। বোধ হইল, যেন আমার

মস্তিষ্কের প্রত্যেক সূক্ষ্ম তন্তু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে, শাহজালালের চরণ প্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

* * * *

আমার চেতনা হইলে বুঝিলাম, কে যেন কুসুমকোমল করপল্লব সঞ্চালনে, আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। তবে কি রুবিয়া মরে নাই? তবে কি আমার অনুমান অমূলক নয়?

চক্ষু মেলিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল, কে অতটা স্নেহভরে আমার মাথায় হাত বুলাইতেছে। কিন্তু পারিলাম না—সাহস হইল না। মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, পাছে আমার আশার রত্নময় প্রাসাদ একেবারে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়।

সত্যই কি রুবিয়া মরে নাই? সত্যই কি সে এখন আমার পাশে বসিয়া! সত্যই কি, সে আমার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া স্নেহসিক্ত-চিত্তে আমার শুশ্রূষা করিতেছে! খোদা! আমাকে অন্তর্দৃষ্টি দাও, আমি চোখ না খুলিয়া যেন হৃদয়ের মধ্যে আমার জীবনাধিক প্রিয়, রুবিয়াকে দেখি। কিন্তু আমার এ সুখ স্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। যে আশঙ্কা করিতে-ছিলাম, তাহাই ঘটিল। কে যেন স্নেহময় কোমল কণ্ঠে আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিল,—"ভাই! ইস্কান্দার! এখন কেমন আছ?"

এ কণ্ঠস্বর ত রুবিয়ার নয়। এ সে গুলসানার স্নেহময় সম্বোধন।

আমি চক্ষু চাহিলাম। উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। পারিলাম না—শরীর বড়ই দুর্ব্বল। গুলসানা পুনরায় স্নেহময় স্বরে বলিল, "ইস্কান্দার! এখন একটু সুস্থ বোধ করিতেছ কি?"

আমি মনে মনে বলিলাম—"গুলসানা! কেন তুমি এ জ্বালাময় মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলে? জানিনা, বিধাতা তোমায় কি প্রকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কি মহত্ত্বে তোমার চিত্তকে বিভূষিত করিয়াছেন" আমি

তোমার মহা শত্রু, আমা হইতেই আজ তুমি পথের ভিখারিণী। তবু তুমি আমায় এত স্নেহ কর? দুইবার তুমি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ। কিন্তু এমন নরাধম আমি, যে এক সময়ে তোমারই রূপমুগ্ধ হইয়া, হীন পশু-প্রকৃতি পাইয়াছিলাম। তবে এখন তোমারই কৃপায়, আমার সে পশুত্ব ঘুচিয়াছে। বুঝিয়াছি—প্রবৃত্তির পূর্ণতায় মানুষ পশু, আর নিবৃত্তিতেই সে দেবতা হইতে পারে!" এই কথা বলিয়া আমি অর্থ শূন্য উদাসদৃষ্টিতে গুলসানার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

গুলসানা আমায় নিরুত্তর দেখিয়া বলিল—"ইস্কান্দার খাঁ! তোমার কি খুব কষ্ট হইতেছে?"

আমি উন্মাদের মত হাস্য করিয়া বলিলাম—"কিছুই না গুলসানা! কিছুই না! বিধাতার রাজত্বে কষ্ট বলিয়া যাহা ছিল, তাহার সবই একে-একে আমার ভোগ হইয়া গিয়াছে। ভোগের বিরামে, প্রাণে এক মহাতৃপ্তি জাগিয়াছে। অতীতের সব ভুলিয়াছি, কিন্তু একটা কথা ভুলিতে পারিতেছি না। বলিতে পার গুলসানা—অভাগিনী রুবিয়ার মৃত্যুসংবাদ সত্য কি?"

গুলসানা আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, স্নেহময়স্বরে বলিল, "ভাই ইস্কান্দার! অতটা কাতর হইও না অমর জীবন লইয়া, অনন্তযুগ কাঁদিলেও, রুবিয়াকে তুমি এ জন্মে আর ফিরিয়া পাইবে না। আজ রাত্রে রুবিয়ার সমাধি হইবে।"

আমি দানবের শক্তি লইয়া, ক্ষিপ্তের মত শয্যা হইতে উঠিয়া, সাগ্রহে বলিলাম—"বল কি? আজ সে সুন্দর দেহের সমাধি হইবে?"

"হাঁ!"

"কোথায়?"

"মীনা-মসজেদের সমাধি-ক্ষেত্রে!"

"আমায় সেখানে লইয়া চল—গুলসানা! একবার জন্মের মতন তাহাকে দেখিব।"

"এখন তুমি অতি দুর্ব্বল। অতদূরে যাইবে কি করিয়া ইস্কান্দার?"

"না—এখন আমার শরীরে দানবের শক্তি আসিয়াছে!"

"তাহা হইলেও তোমার সে স্থানে যাওয়া অতি বিপদজনক!"

"কেন?"

"তুমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী!"

"কার হুকুমে?"

"খোদ্ বাজ্ বাহাদুরের"

"হায়! একদিন আমিই যে তাঁর জীবনরক্ষা করিয়াছিলাম!"

"সে কৃতজ্ঞতার ঋণ, তিনি অনেকদিন ত পরিশোধ করিয়াছেন।"

"আমি যে এখানে আছি, তাহা তিনি জানেন কি?"

"না! এই মহাত্মা ফকির তোমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া, তুমি এখনও নিরাপদ।"

"বেশ্! কিন্তু গুল্‌সানা! আমি জীবন চাই না—মৃত্যু চাই! আর এই মৃত্যুর পণে রুবিয়াকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি!"

"তুমি বিকার ব্যাধি-গ্রস্ত। এখনও চিত্তদমন করিতে শিখ নাই।"

"পারিবও না। এ হৃৎপিণ্ড কেহ যদি তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে একবারে ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহা হইলে বোধ হয় পারি।"

"স্থির হও। কাতর হইও না। শাহজালাল্ সাহেব ফিরিয়া আসুন, তারপর যাহা হয় একটা পরামর্শ স্থির করা যাইবে।"

এই কথা শেষ না হইতেই, শাহ জালালউদ্দিন রুদ্রনেত্রে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"ইস্কান্দার! এখনি পলাও! বাদ্‌শা জানিতে পারিয়াছেন, যে তুমি এখানে আছ!"

আমি তাঁহাকে বলিলাম—"প্রাণ যায় যাউক! এ দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই! কিন্তু রুবিয়াকে আমি একবার জন্মের মত দেখিব। সে আমার ধর্ম্মপত্নী।"

শাহজালাল বলিলেন—"বৎস! তুমি নিতান্তই বোধ শূন্য! রুবিয়াকে দেখা, এক্ষণে কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। স্বয়ং বাজ্‌বাহাদুর সেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবেন, আর তোমাকে দেখিতে পাইলেই তিনি হত্যা করিবেন। একে তিনি স্নেহময়ী দুহিতার শোকে কাতর, তাহার উপর বিজাপুরের সেই দুষ্ট সুলতান, তাহাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। বৎস! আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর। খোদার কৃপা হইলে, তুমি আবার তোমার রুবিয়াকে দেখিতে পাইবে।"

আমি ক্রুদ্ধভাবে বলিলাম—"আপনি সাধু, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী। সংসারী লোকের মত, আমার সহিত প্রতারণা করিবেন না। এইমাত্র আপনি বলিলেন, রুবিয়ার সমাধি হইবে। তাহা হইলে, আমি রুবিয়াকে পুনরায় পাইব কিরূপে? মৃত কি কখন জীবন প্রাপ্ত হয়? নিশ্চয় আপনি আমায় বৃথা স্তোক বাক্যে ভুলাইতেছেন!"

শাহজালাল, প্রবুদ্ধভাবে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বৎস! অনন্ত শক্তিময় ঈশ্বরে ভক্তিমান হও। তিনি ইচ্ছা করিলে, শবদেহেও জীবন সঞ্চার করিতে পারেন। জগতে সকলের চক্ষে রুবিয়া মরিয়াছে বটে, কিন্তু আমার চক্ষে নহে। আমি জীবনে কাহারও সহিত প্রতারণা করি নাই। আর তোমার সঙ্গে সেরূপ কোন কিছু করা খুবই অসম্ভব।"

ফকির শাহজালাল, একজন মহাজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ। এবার তাঁহার কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু কি রহস্য বলে মৃত পুনরায় জীবনের সীমায় ফিরিয়া আসিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অতীব বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

(কুলসমের কথা)

আমার নাম কুলসমবিবি। আমি সেথজীর অনুরাগিনী পত্নী—গুলসানার সখের বাঁদী। সোহানী-পত্নী গুলসানা, আগরা ত্যাগ করিবার সময়, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। এজন্য আমার বৃদ্ধ স্বামী সেথজীও আমার সঙ্গ ছাড়িল না। গুলসানা একদিন অশ্রুপূর্ণনেত্রে আমায় বলিলেন—"কুলসম! সংসার আর আমার ভাল লাগে না। সংসারের কোলাহল, আমার বড়ই কষ্টকর বোধ হয়। এক সময় আমি রাজরাজ্যেশ্বরী ছিলাম, কত লোককে আশ্রয় দিয়াছি! এখন আমি হীনা দেওয়ানা,—পরাশ্রয়-ভিখারিণী। উদার অম্বরই এখন আমার শীতবাত নিবারণের অসীম চন্দ্রাতপ। বৃক্ষচ্ছায়াই আমার সুখময় বিরাম কক্ষ। তুই কেন আমার সঙ্গে থাকিয়া বৃথা কষ্ট পাইবি? আমি তোকে বাজ্‌বাহাদুরের অন্তঃপুরে কোন ভাল কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতেছি। সেখানে গেলে তুই চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবি। তোর ইহাতে কোন আপত্তি আছে?"

আমি নানাদিক ভাবিয়া, তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। বাজবাহাদুরের উপর তাঁহার যে কতটা ক্ষমতা, আগে তাহা আমি জানিতাম না। একদিনের একটী সামান্য ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারিলাম।

গুলসানা আমাকে লইয়া, সহসা একদিনে বাজ্‌বাহাদুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাজবাহাদুরের প্রধান মহিষীর নাম রূপমতী। রূপমতী বেগম, গুলসানার অপরিমেয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া, মোহিতচিত্তা হইলেন। তিনি নির্নিমেষ নয়নে গুলসানার মাধুরীভরা রূপরাশি দেখিয়া, মনে মনে কি ভাবিলেন—তা জানি না, কিন্তু তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত রূপ লইয়া ধরায় আসিয়াছ—তুমি কে বহিন্?"

গুলসানা বলিলেন—"ভগিনী! আজ তুমি ভাগ্যক্রমে যে রত্নখচিত আসনে মালবেশ্বরী রূপে উপবিষ্টা, ঐ আসনে এক দিন আমারই বসিবার কথা হইয়াছিল। আমার পিতা, বাজ্‌বাহাদুরের সহিত, আমার বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সোহানী নামক এক পাঠান বীরের শৌর্য্য-বীর্য্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলামণ কেবল তাই নয়, এ জন্য বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহার নিকট স্বেচ্ছায় পলায়ন করি। আমার নাম—গুলসানা।"

রূপমতী বলিলেন—"বহিন্! ইতি পূর্ব্বে তোমার অদৃষ্টের সকল কথাই আমি শুনিয়াছি। কিন্তু ভাগ্য ছাড়া ত পথ নাই। তুমি আমার এই প্রাসাদেই থাক। আমি তোমাকে সহোদরার অধিক যত্ন করিব।"

গুলসানা একটু দর্পের সহিত বলিলেন—"বেগম! তোমার এ মহত্ত্বের জন্য আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি। পাঠান সম্রাটপত্নীর উপযুক্ত কথাই তুমি বলিয়াছ। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর সহিত, আমি সংসার-বাসের সকল সুখ বাসনাই ত্যাগ করিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাতের কারণ এই, আমার এই প্রিয়তমা বাঁদিকে তোমায় উপহার দিলাম। এ সৎকুলোদ্ভবা ও সুচতুরা। তুমি ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিও। ইহাকে আশ্রয় দিলেই আমার উপকার করা হইবে।"

এই কথা বলিয়া, গুলসানা অন্য কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রাজপুরী ত্যাগ করিলেন। সেই দিন হইতে আমি মালবেশ্বরের অন্তঃপুরে রূপমতী বেগমের খাস বাঁদীরূপে নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু আমার বয়স অল্প বলিয়া, রূপমতী বেগম আমাকে তাঁহার কন্যা শাহাজাদী রুবিয়ার সখীরূপে নিযুক্ত করিলেন। আর আমার বৃদ্ধস্বামী সেখজী, সহরের মধ্যে গিয়া স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিলেন।

শাহাজাদী রুবিয়া কেন জানি না, আমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে

দেখিতেন। ক্রমশঃ আমি তাঁহার অতি প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠি-লাম। শেষ এমন দাঁড়াইল, আমি সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার একজন বিশ্বাসী সঙ্গিনী হইয়া পড়িলাম। আহত ইস্কান্দার খাঁকে, আমিই সর্ব্বপ্রথমে নর্ম্মদা-তীরের রাজ-প্রসাদে চিনিতে পারি। ইস্কান্দার খাঁ, পরম রূপবান পুরুষ। দিনরাত তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া, শাহাজাদী যে ক্রমশঃ সেই অপরিচিত যুবকের কামকমনীয় সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিতেছেন, তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তখন আর রুবিয়াকে তাঁহার গন্তব্যপথ হইতে ফিরাইবার কোন উপায় ছিল না। প্রাণের আবেগে, তিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ষাপ্লাবন-পীড়িত উচ্ছ্বসিত নদীতরঙ্গের ন্যায়, তাঁহার প্রেম-স্রোত তখন অতিপ্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত!

শাহাজাদী রুবিয়া, নর্ম্মদাতীরের প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, রাজধানীতে আসিলেন। তিনি অসুস্থতার ভাণ করিলেন বটে—কিন্তু তাঁহার মনের প্রকৃত অসুখ যে কি, তাহা বুঝিতে আমার কিন্তু দেরী হইল না। আমার নিকটেই তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছিলেন, এই আহত ইস্কান্দার খাঁ পূর্ব্বে দিল্লীশ্বর আকবরশাহের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, আর এখন তিনি তাঁহার পিতা মালবেশ্বরের পুরী-রক্ষক, সহকারী সেনাপতি। রুবিয়া এ সংবাদে বড়ই আশান্বিতা হইলেন। এই ইস্কান্দার খাঁ, যখন পুরীর মধ্যেই থাকে, তখন কোন না কোন উপায়ে, একদিন তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইতে পারে। এই উন্মাদিনী আশার ছলনায়, শাহাজাদী রুবিয়া মুগ্ধচিত্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন আমাকে নির্জ্জনে পাইয়া রুবিয়া বলিলেন—"কুলসম! তুই ত সব জানিতে পারিয়াছিস্ বহিন্! আমি এ বুকের মধ্যে আর জ্বলন্ত আগুন পুরিয়া রাখিতে পারি না। পিতা আমার হাত পা বাঁধিয়া, জলে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজকন্যা হইলে কি হয়, আমি

বড়ই অভাগিনী। পিতা আমার ইচ্ছার ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন, এজন্য আমি বড়ই অসুখী।”

তাঁহার মনের প্রকৃত কথা কি জানিবার জন্য, আমি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম—“তাহা হইলে আহম্মদনগরের সুলতান কি শাহাজাদী রুবিয়ার মনের মতন নহেন?”

শাহাজাদী বলিলেন—“কুলসম! আমার কাছে আর সে রাজকুলকলঙ্ক বর্ব্বরটার নাম করিস না! তার যেমন আকৃতি, তেমন প্রকৃতি। দিনরাতই সেরাজীর নেশায় সে বিভোর! রাজবংশে জন্মিলে কি হয়, রাজকুলোচিত কোন গুণই তাহার নাই। এ ধনী সুলতান অপেক্ষা, গুণবান দরিদ্র স্বামীও আমার সহস্র বার স্পৃহনীয়।”

এই কয়েকটী কথায়, আমি তাঁহার প্রকৃত মনোভাব জানিতে পারিলাম। বুঝিলাম—বর্ষার স্রোত প্রচণ্ডবেগে সৈকতদেশ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে ভাঙ্গন বন্ধ করিবার, আর কোন উপায় নাই।

একদিন শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে, সুখময়ী মেদিনী হাসিতেছে। রুবিয়া একদৃষ্টে উন্মুক্ত বাতায়নপথ হইতে, নগ্ন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। সে এমন সময় কে যেন দূর হইতে বলিয়া উঠিল—“রুবিয়া! রুবিয়া! স্বর্গের দেবী।” সে স্বর শাহাজাদীর কর্ণে পৌঁছিবামাত্রই, তিনি বাতায়নপথ ত্যাগ করিলেন।

ইহার পর কি উপায়ে, এক বিশ্বাসী তাতারীকে পাঠাইয়া, ইস্কান্দার খাঁকে রঙ্গমহলে আনা হয়, তাহার মনোভাব পরীক্ষার জন্য, শাহাজাদী নিজে বাঁদি সাজিয়া, অপর এক বাঁদিকে সিংহাসনে বসাইয়া, কি কৌশলে তাঁহার মনের প্রকৃত কথা জানিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে ইস্কান্দার খাঁর মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে।

রাজকন্যা যখন শুনিলেন, যে তাঁহার পিতা সুলতানকে আনিবার

জন্য, খাঁ সাহেবকেই সেনাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তখন তিনি অতল নিরাশা সাগরে নিমগ্না হইলেন। আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "কুলসম! বহিন্! এখন উপায় কি? সুলতান রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলে, এ বিবাহ যে কোন মতেই বন্ধ হইবে না! কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই না হয় জহর খাইয়া, অথবা নর্ম্মদায় ঝাঁপ দিয়া আমি সর্ব্ব জ্বালা জুড়াইব।"

শাহজাদীর মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম—কথাটা নিতান্ত অর্থশূন্য নয়। শান্ত প্রকৃতির বুকে, তাহা যেন মহাঝড়ের পূর্ব্ব সূচনা। আমি তাঁহার মনের কথা শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলাম বটে, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। রাজপুরী মধ্যে থাকিলে, এ মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইস্কান্দারকে না পাইলে, রুবিয়া নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে। এই সব কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে বাজ্ বাহাদুর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"রুবি! এ কয়দিন দেখিতেছি, তোমার শরীর ভাল যাইতেছে না। মুখ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। আমার অভিলাষ ও আদেশ, তুমি নর্ম্মদাতীরের হাওয়া-মহলে গিয়া থাক। সেখানে থাকিলে, তোমার চিত্তের বিষণ্ণতা যাইবে। তোমার ইচ্ছা হয়, এই কুলসম বাঁদীকে তুমি সঙ্গে লইতে পার।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, বাদশাহের এ আদেশ খোদার করুণা। শাহজাদীও এই ব্যপারটীকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী বোধ করিয়া, বৃথা কাল ক্ষয় না করিয়া, সেইদিন অপরাহ্নেই নর্ম্মদা-তীরের মর্ম্মরপ্রাসাদে গমন করিলেন। ইস্কান্দার সাহেবকেও সংবাদ দেওয়া হইল, যেন তিনি মীনা-মস্‌জেদের নিকট অপেক্ষা করেন।

রাজকন্যা আমাকে ছাড়িয়া একা থাকিতে স্বীকৃতা না হওয়ায়, রুমি নামক একজন বিশ্বাসী তাতারী-বাঁদীকে, আমি সে রাত্রে মীনামস্‌জেদের নিকট পাঠাইলাম। ইস্কান্দার খাঁ প্রাসাদের মধ্যে আসিলেন। সাগরের

সহিত নদীর মিলন হইল। প্রেমের সহিত প্রীতি, মাধবীলতার সহিত সহকারের মিলন হইল। মেঘের বুকে বিদ্যুৎ খেলিল। আসঙ্গলিপ্সায় পূর্ণাহুতি পড়িল। ইহার পর কি মহা বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা জানেন। নির্ম্মম অদৃষ্টের কঠোর হস্ততাড়িত হইয়া, আমি ও ইস্কান্দার দুইজনেই বন্দী হইয়া কারানিক্ষিপ্ত হইলাম।

বাজ্ বাহাদুরের আদেশে, আমাদের দুইজনেরই পৃথক্ কারাগার ব্যবস্থা হইয়াছে! যে তাতারী প্রহরীগণ আমার আজ্ঞার অধীন ছিল, এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনে, তাহারা এখন আমারই উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। বেগম মহলের জনপ্রাণীর সহিত আমার দেখা হয় না। কেবল ইস্কান্দার খাঁকে যে তাতারী রঙ্গমহলে আনিয়াছিল, সেইই প্রাতে ও সায়হ্নে, আলোকবর্জ্জিত কারাকক্ষে আসিয়া আমার খাবার রাখিয়া যায়।

চারিদিকে দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর। উপরের দিকে এক স্থানে কেবল মাত্র একটী ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি। তাহাতেই দিবা ও রজনীর বিকাশ ও বিলয় বুঝিতে পারি। সমস্ত কক্ষ সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জন ও বায়ু-প্রবাহ শূন্য। সেই কারাকক্ষের উত্তর দিকে এক ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বার। আর সে লৌহময় দ্বার আবার সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ। নিজের কথা ভাবিবার বড় অবকাশ পাই না। ইস্কান্দারের কি হইল, রুবিয়ার কি হইল—ইহা ভাবিয়াই চিত্ত দিন রাত ব্যাকুল হইয়া উঠে। বাজ্ বাহাদুর মালবের স্বাধীন নৃপতি। তাঁহার রাজ্যে,তিনিই দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। আলোক সমাগম বিহীন,সঙ্গীহীন, কারাকক্ষে বসিয়া, কখন বা কল্পনার বিভীষিকাময় চক্ষে দেখি, রাজদেশে ইস্কান্দারের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। তাহার শোণিতাক্ত ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে গড়াইতেছে। আর শাহজাদী রুবিয়া! তাহার কথা ভাবিতে গেলে, যেন প্রাণের আমূল কম্পিত হয়—হৃৎপিণ্ড খসিয়া পড়ে।

এইরূপে আমার দুই তিন দিন কাটিল। দিন কাটে ত রাত কাটে

না—রাত্ত যদি কাটে ত দিন যাইতে চাহে না। বাঁদী রূপে রঙ্গমহলের মধ্যে থাকিবার সময়, আমি সহরের মধ্যে গিয়া, বৃদ্ধ সেখজীকে রোজ দুইবার করিয়া দেখা দিয়া আসিতাম। এতদিন না যাওয়ায়—সে যে ভয়ানক উদ্বেগে দিন কাটাইতেছে, চারিদিকে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এ চিন্তা আমাকে বড়ই কাতর করিল। সে ত বাদশার রঙ্গমহালের কোন সংবাদই জানে না। হায়! সে যে আমায় একদিন না দেখিতে পাইলে, বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে!

একদিন আমার পরিচিতা, সেই বাঁদী আমাকে খাবার দিতে আসিয়া আমার কাণের কাছে চুপী চুপী বলিল—"মা! তোমার অনেক নিমক খাইয়াছি। তাতারীরা নেমকহারাম নয়। তুমি পলাইবে?"

তাতারি, এ কয়দিন আমার সঙ্গে কোন কথাই কহে নাই। আমিও স্নেহময়ী রুবিয়ার কোন সংবাদই পাই নাই। তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেই, সে ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সঙ্কেতে জানাইত, রাজাদেশে তাহার কথা কহা নিষেধ।

আমি বলিলাম—"ছাড়িয়া দেয় কে? এত সাহস ও ক্ষমতা কার?"

সে বলিল—"কুলসম বিবি আমি যে উপায়ে পারি, তোমাকে পুরীর বাহির করিয়া দিব। আমার কথায় বিশ্বাস কর।"

আমি বলিলাম—"যদি একথা প্রকাশ হয় রুমি? তাহা হইলে তুমিও মরিবে আর আমিও যে জন্মের মত জাহান্নমে যাইব।"

রুমিয়া বলিল—"যাহা হয় হউক, আমি মরিতে ডরাই না। কিন্তু তুমি আজই চলিয়া যাও। এই প্রেমাভিনয় ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী বলিয়া, বাদশা তোমার উপর ভয়ানক রাগিয়াছেন। স্ত্রীলোক হইলেও তোমার মার্জ্জনার আশা নাই।"

আমি। না রুমি! অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। কর্ম্মফল এড়াইতে কেহ

কখনও পারে নাই। তোমাকে বিপন্ন করিয়া আমি নিজে মুক্তি চাহি না। আমি যেমন আছি, তেমনই থাকি। এ কয়দিন আমি শাহাজাদীর কোন সংবাদ পাই নাই। তিনি কোথায়—আর কেমন আছেন বলিতে পার কি?

রুমিয়া। অবশ্য তাঁহাকে তোমার মত কারাগারে যাইতে হয় নাই। কিন্তু তিনি ভয়ানক পীড়িতা। বাদশা-বেগম রূপমতী, বিমাতা হইয়াও তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কন্যাধিক যত্নে সেবা করিতেছেন।

আমি। শাহাজাদীর অসুখটা কি! হাকিমে কি বলে?

রুমিয়া। রাণীর আদেশে দেশের হাকিম জড় হইয়াছিল। কিন্তু বাদশা কি ভাবিয়া তাহাদের বিদায় দিয়া, শাহজালাল ফকিরের দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছেন! জান ত ফকিরের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

আমি। যখন বাদশাহের কোপ বহ্নি হইতে নিস্তার পাইয়া, করুণাময়ী রূপমতী বেগমের স্নেহময় ক্রোড়ে রুবিয়া আশ্রয় পাইয়াছে, তখন আমি তাহার ভাবনায় নিশ্চিন্ত হইলাম। রুমিয়া! তাহা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে এ স্থান ত্যাগ কর। দিল্লীতে তোমারর অনেক চাকরী জুটিবে।

রুমিয়া, কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তার পর বলিল—"আচ্ছা তাহাই হইবে।"

আমি। কিন্তু বাহিরে যাইবার ছাড় কই?

রুমি, তীব্র-হাস্যের সহিত বলিল—"তোমায় বাঁচাইবার জন্য আমি বাদশা-বেগমের পাঞ্জা খানা চুরি করিয়াছি মা! এই দেখ সেই পাঞ্জা!"

সহসা অদূরে প্রহরীর সাবধান-বিন্যস্ত, পদশব্দ শ্রুত হইল। তাতারী বলিল—"আর না—আমি এখন চলিলাম। ঐ পাঞ্জা খানা তুমিই এখন লুকাইয়া রাখিয়া দাও। আমি ঠিক সময় বুঝিয়াই আসিব।"

রুমিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে কারাগারের দ্বারে চাবি দিল। কারাগারের প্রহরী আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই,

সেখান হইতে সে অদৃশ্য হইল। আর আমি অভাগিনী সেই কারা কক্ষতলে শুইয়া, রুবিয়ার কথা নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সম্ভবতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেন না চারিদিক নিস্তব্ধ। কে যেন দ্বারের পার্শ্ব হইতে বলিল—"কুলসম বিবি! জাগিয়া আছ?" বুঝিলাম—এ রুবিয়া!

আমি বলিলাম—"এ পোড়া চোখে কি আর ঘুম আছে বাছা! সব ঠিক ত?"

"হাঁ—তা না হইলে, আমি এ গভীর রাত্রে কষ্ট করিয়া আসিতাম না। পাঞ্জাখানা তোমার ওড়নার মধ্যে লুকাইয়া লও। এস আমার সঙ্গে। আর এই ছোরাখানাও বুকের কাপড়ে লুকাইয়া রাখ।"

"কেন—বিপদের কোন সম্ভাবনা আছে নাকি?"

"নাই বা বলি কি করিয়া? বাদশার রঙ্গমহাল! চারিদিকে ভীমকায় প্রহরীগণ ঘুরিতেছে। এখান হইতে যতক্ষণ না নিরাপদে বাহিরে গিয়া পৌঁছিতেছি, ততক্ষণ ভাবনা যাইতেছে না!"

দুইজনে নিঃশব্দে দুইটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ পার হইলাম। তারপর একটী দালানে আসিবামাত্রই, জানি না—কি কারণে, আমার হৃৎকম্প হইল! আমি মুখের অবগুণ্ঠনটা ভাল করিয়া টানিয়া দিলাম।

রুমি পশ্চাৎ হইতে এই সময়ে আমার অঞ্চলাকর্ষণ করিয়া বলিল—"বিবি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমরা বাদশাহের চোখে পড়িয়াছি। দাও দাও, শীঘ্র পাঞ্জাখানা আমাকে দাও। তুমি কোন কথা কহিও না, ভয়ের কোন কারণই নাই। যাহা করিবার, তাহা আমিই করিতেছি।"

রুমি, সবলে আমার হাত হইতে পাঞ্জাখানা কাড়িয়া লইল। যে

মূর্ত্তি দেখিয়া রুমি ভয় পাইয়াছিল, সে মূর্ত্তি কাছে আসিয়া বলিল—"কে তোরা ? এ রাত্রে কোথায় যাইতেছিস্ ?"

ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু রুমি, একটুও টলিল না। সে আভূমি-প্রণত এক কুর্ণীস করিয়া বলিল—"খোদা দীনদুনিয়ার মালেক! তিনি শাহ-ইন্-শা বাজ্ বাহাদুরকে দীর্ঘজীবী করুন।"

সত্যসত্যই মালবেশ্বর বাজ্ বাহাদুর আমাদের সম্মুখে। আমি শুনিয়াছিলাম, তিনি অনেক সময়ে প্রয়োজন মতে, গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে পুরীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। শোনা ঘটনা, কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

বাজ্ বাহাদুর তাতারীকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"রুমি! এত রাত্রে কোথায় যাইতেছিস্ তুই ? তোর সঙ্গে ও আওরৎ কে ?"

রুমি, পাঞ্জাখানা তখনই বাহির করিয়া সসম্মানে মস্তকের উপর স্পর্শ করিয়া বলিল—"গোস্তাখি মাফ্ হয় জাঁহাপনা! বাদশা-বেগমের ফরমায়েস্। ইহাঁকে মহলের বাহিরে রাখিয়া আসিতে যাইতেছি।"

"ইনি কে ?"

"এক ওম্‌রাহ পত্নী। বেগম সাহেবার অন্তরঙ্গ। শাহাজাদীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া, ইনি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।"

মালবেশ্বর, মহিষীর পাঞ্জা দেখিয়া, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের মত স্থির হইয়া, সেইখানেই দাঁড়াইলেন। কেবলমাত্র প্রশ্ন করিলেন—"তুই ত বাদশাবেগমের মহল হইতে আসিতেছিস্। বলিতে পারিস্—শাহাজাদী রুবিয়া এখন কেমন আছে ?"

রুমিয়া, আবার এক লম্বা কুর্ণীস করিয়া বলিল—"খোদার মেহেরবানে, শাহাজাদীর তবিয়ৎ এখন বহুৎ ভাল আছে। সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।"

"বহুত খুব।" এই কথা বলিয়া মালবেশ্বরের সেই দালানের পার্শ্বে

একটী কক্ষমধ্যে বিশ্রামার্থে প্রবেশ করিলেন। রুমিয়া অর্থপূর্ণ ভাবে আমার গা টিপিল। সে সঙ্কেতের অর্থ হইতেছে এই—"ভয় নাই! বিপদ যা—তা কাটিয়া গিয়াছে।"

আমি ও রুমিয়া অতি দ্রুতপদে সেই দালানটী পার হইয়া, আবার এক দুর্ব্বামণ্ডিত প্রাঙ্গণে পড়িলাম। সেই প্রাঙ্গণ-সীমান্তের, পাষাণ প্রাচীর দ্বারে, একজন ভীমকায় ইরাণী-খোজা পাহারা দিতেছে। আমি সভয়ে বলিলাম—"রুমি! এইবার বুঝি আমরা ধরা পড়ি।"

রুমি ভীষণ ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করিল করিল। সে অস্ফুটস্বরে আমার কাণে কাণে বলিল,—"যখন খোদ বাদশার হাত এড়াইয়াছি, তখন আর কাহাকেও ভয় করি না। বহিন্! চুপ করিয়া থাক তুমি। একটু ভাল করিয়া ঘোমটাটা টানিয়া দাও। এ বান্দরের বাচ্ছাকে, আমার কোন ভয়ই নাই। কারা প্রহরীকে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া বে-এক্তার করিয়া ফেলিয়াছি। একে প্রেমের কথার নেশায় হঠাইব।"

দুইজন স্ত্রীলোককে অন্ধকারে আসিতে দেখিয়া, রঙ্গমহলের প্রহরী এখ্‌তিয়ার খাঁ হাঁকিল—"কে যায়?"

রুমিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া হাত নাড়িয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "মর্ পোড়ারমুখো! আজ যে একাবারে মানুষ চিনতে পাচ্ছিস্ নি। আমি যে তোর জান্‌পেয়ারী রুমিয়া বেগম! মর্! মুখপোড়া! ভাঙ্গ খেয়েছিস্ নাকি?"

এখ্‌তিয়ার খাঁ একগাল হাসিয়া বলিল—"ওঃ তুমি! এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ জানি? তোমার সঙ্গে উনি কে?"

রুমিয়া, কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল—"চোপ্‌রও গোলাম! কে যাইতেছে, তোর সে খপরে কাজ কি? এই দেখ্‌ বাদশাবেগমের পাঞ্জা! ফের কথা কহিবি ত কাল সকালে তোর নকরী থাকিবে না। বাদশাবেগমকে সব কথা বলিয়া দিব।"

প্রহরী, নিকটবর্ত্তী আলোকে, পাঞ্জাখানা পরীক্ষা করিয়া সসম্মানে তাহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল,—"রুমি! বাদশার স্বভাব ত জানিস্! কাজেই আমাদের খুবই দেখিয়া শুনিয়া চলিতে হয়! দোহাই তোর! আমি যে তোকে রুখিয়াছি, তাহা যেন বাদশাবেগম জানিতে না পারেন।"

রুমিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—"ওরে বান্দা! আমায় কি তুই বোকা পেয়েছিস ? এ কথা কি বেগমের কাণে তুলতে আছে। তোকে আমি কত ভালবাসি তা জানিস—ত ?"

এথ্তিয়ার খাঁ—দাড়ি চোম্রাইয়া গোঁপে বারবার তিনবার তা দিয়া, গাম্ভীর্য্যের সহিত শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল, "তা আর জানি না ? এসো আমার জান্-পেয়ারী।"

সেই মূর্খ প্রহরী, স্বহস্তে পুরীর গুপ্ত দ্বার খুলিয়া দিল। আমি ও রুমিয়া রাজপথের স্নিগ্ধ মুক্ত বায়ুতে আসিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এ রঙ্গ দেখিয়া, অত বিপদের সময়ও আমার হাসি আসিল।

রুমিয়া আমায় বলিল—"কুলসম বিবি! এখনও আমরা নিরাপদ নই। কাল প্রভাতে হয় ত সকল রহস্যই বাহির হইয়া পড়িবে। যে উপায়েই হোক, আজ রাত্রেই, আমাদের এ সহর ত্যাগ করা চাই।"

আমি বলিলাম—"তাহা হইলে উপায় ? পথিমধ্যে যদি আমরা ধরা পড়ি, তাহাহইলে তোকে আর আমাকে কুত্তার মুখে যাইতে হইবে!"

রুমিয়া বিষণ্নমুখে, উৎসাহহীন ভাবে বলিল—"আমিও তাই ভাবিতেছি। পুরীর মধ্যে থাকিলে, হয় ত বাদশার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াও বাঁচিতে পারিতাম। কিন্তু কাল প্রাতে, এ পলায়ন ব্যাপারের কথা চারিদিকে জানাজানি হইয়া পড়িলে, আমরা এ রাজ্যমধ্যে কোথাও আশ্রয় পাইব না। বাদশাহের কারাগার পলায়িত বন্দীকে, কে আশ্রয় দিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিবে বল ?"

আমরা খুব দ্রুত চলিতে লাগিলাম। সহসা স্রোতের গর্জ্জন শুনিয়া, রুমিয়া বলিল—"বহিন্! সোজা পথে না আসায় আমাদের পথ ভ্রম হইয়াছে! ভীষণ স্রোতস্বতী নর্ম্মদা আমাদের সম্মুখে।"

নিরাশভাবে চীৎকার করিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম—"তাহাহইলে এখন উপায়?"

সহসা সেই নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া, এক বলিষ্ঠকায় আগন্তুক, আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,—"উপায় সেই খোদা! কিন্তু তোমরা দেখিতেছি,—স্ত্রীলোক! এ রাত্রে কোথায় যাইতেছ মা?"

রুমিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"বাবা! আপনি যেই হোন্ আমাদের আশ্রয় দিন।"

"কে তোমরা—আগে পরিচয় দাও।"

"মিথ্যা বলিব না—ইহার নাম কুলসম।"

"কুলসম?"

"হাঁ—কুলসম!"

"রুবিয়ার বাঁদী—কুলসম?"

"হাঁ—তাই।"

"কুলসম বিবি! খোদা আমায় তোমাকে মিলাইয়াছেন। তোমরা দুজনেই আমার সঙ্গে এস।"

আমি স্বল্পান্ধকারে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলাম, তাহা এক ফকিরের। আমি ভক্তিভরে ভূমিতলে বসিয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া বলিলাম, "প্রভু! এ অন্ধকারেও আপনাকে আমি চিনিয়াছি। এ ভীষণ বিপদে আমাদের রক্ষা করুন।"

সেই ফকির আর কেহই নহেন খোদ—শাহজালাল। শাহজালাল প্রবুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মা! কোন ভয় নাই—আমার সঙ্গে আস্তানায় আইস।

তোমাদের নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া আমি সকল কথা শুনিব। আর গুলসানাও তোমার জন্য সেখানে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছে।”

আর কোন কথা না কহিয়া, ফকিরসাহেব দ্রুতপদে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। আমরা সেই অন্ধকাররাশির মধ্য দিয়া, নিশঃব্দে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পর—আমরা তাঁহার আস্তানায় উপস্থিত হইলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আমাদিগকে শ্রম-ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত দেখিয়া, ফকির কক্ষমধ্য হইতে সুমিষ্ট ফল, স্নিগ্ধ সলিল আনিয়া, আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করাইলেন। তখন রজনীর শেষ যাম। তিনি সস্নেহ স্বরে বলিলেন—“মা! খোদার নাম স্মরণ করিয়া, আজ রাত্রে নিদ্রা যাও। কাল প্রভাতে তোমাকে সকল কথাই বলিব।” এই কথা বলিয়া শাহজালাল সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

রুমিয়া বলিল—“বহিন্! খোদার অপার মহিমা দেখিলে ত! এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাও।”

আমি রুমিয়ার কথায় কোন উত্তর করিলাম না। সেই ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে—দুইটী পর্ণশয্যা। আমি তাহার একটী আশ্রয় করিলাম। কিন্তু পাপচক্ষে নিদ্রা আসিল না। শেষ রাত্রে যদিও বা একটু নিদ্রা আসিল, তাহা আবার বিচিত্র স্বপ্নময়। আমি স্বপ্নে দেখিলাম—রুবিয়া মরিয়াছে! তাহার সেই অতি সুন্দর, পুষ্প স্পর্শময়, সুকোমল দেহ, পাষাণের মত কঠিন হইয়াছে। যে চোখে প্রেমের উৎস বহিত, যে ওষ্ঠাধরের স্পন্দনে, সজীব প্রেমভাব ফুটিয়া উঠিত, যে অম্বুজ-নেত্রের মধুরিমাময় দৃষ্টিতে, সমগ্র বিশ্বের উপর ভালবাসা উচ্ছসিত হইয়া পড়িত—সেই সুন্দর বরাঙ্গ,” সেই ভাবাময় আঁখি, সেই প্রফুল্ল শতদলসম সমুজ্জল মুখ, যেন অতি বিশীর্ণ,

অতি মলিন, অতি পাণ্ডুবর্ণ। ঝটিকা-প্রহত, সুগন্ধ প্রসূনরাশি, যেমন রূপ-রস-গন্ধবিহীন হইয়া অনাদরে মাটিতে পড়িয়া থাকে—সেও যেন সেইরূপ পড়িয়া আছে।

আমি স্বপ্নের ঘোরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"খোদা! খোদা! করিলে কি প্রভু? এত সুন্দর যে রুবিয়া, তাহাকে মৃত্যুর অধীন করিলে কেন?"

এমন সময়ে কে যেন, আমার শিয়রে বসিয়া, মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিল "না—না! রুবিয়া মরে নাই। অত সুন্দর যে, তাহার কখনই মৃত্যু হইতে পারে না।"

হতভাগিনী আমি চক্ষু মেলিলাম। দেখিলাম আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সৌম্যমূর্ত্তি সেই ফকির শাহজালাল!

শাহজালাল বলিলেন—"রুবিয়ার হৃদয়, খোদা যে কি উপাদানে গড়িয়াছেন, তাহা আমি যতটা বুঝিয়াছি, সেরূপ আর কেহই বুঝে নাই। যে রুবিয়া, স্বর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর শৃঙ্খল কাটিয়া উড়াইয়া দেয়, যে পর্ব্বতের বিরাট্ সৌন্দর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, যে পুণ্যসলিলা নদীর বুকে তরঙ্গলীলা দেখিয়া, তাহাকে খোদার প্রেমের উচ্ছাস ভাবিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করে, যে দুঃখীকে দেখিলে, অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দেয়, যে দয়া ও মমতার পূর্ণমূর্ত্তি, তার কি মৃত্যু আছে মা?"

আমি বলিলাম,—"প্রভু! আপনার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়। কিন্তু শুনিয়াছি, সে যে সংকট ব্যাধি-পীড়িতা।"

শাহজালাল স্থিরভাবে বলিলেন,—"আমিই সেই ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছি যে মা!"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"বলেন কি? আপনি?"

শাহজালাল বলিলেন—"হাঁ আমি !"

"কেন এ নিষ্ঠুর কাজ করিলেন প্রভু ?"

"নিষ্ঠুর কাজ নয় কুলসম্ ! পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ এই দুইজনের, মিলনের জন্য আমি এ কঠোর অনুষ্ঠান করিয়াছি। রুবিয়াকে বাঁচাইবার জন্যই, তাহাকে এই কল্পিত মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়াছি !"

"কিন্তু রুবিয়া যদি মরিয়া যায় !"

"জানিও বৎসে ! ইচ্ছা-সাধিত মরণের পরও জীবন আছে। এ সম্বন্ধে গুরুর কৃপায় কিছু কিছু শিখিয়াছি। সে ভরসা না থাকিলে, এ ভয়ানক কাজ হয় তো করিতাম না।"

আমি কম্পিত হৃদয়ে বলিলাম—"প্রভু ! সে কল্পিত মৃত্যুর বিলম্ব কত ?"

শাহজালাল গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আজ রাত্রেই তাহার মৃত্যু হইবে। তার পর কবর। কবরের পর, তুমি ও আমি উপলক্ষ্য রূপে তাহাকে বাঁচাইব।"

আমি এ ভয়ানক কথা শুনিয়া, এক রকম দিশাহারা হইয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম—"প্রভু ! আপনি খোদার অনুগৃহিত, সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ ! আমি অধমা রমণী। আমি এখনও এ মহা রহস্যের কোন মর্ম্মই বুঝিতে পারিলাম না।"

শাহজালাল নিরুদ্বেগ ভাবে বলিলেন,—"আমি কার্য্যকালে তোমায় সব কথা বুঝাইয়া দিব। তোমাকে যাহা করিতে বলিব, বিনা সঙ্কোচে তাহাই করিয়া যাইও। তাহা হইলে রুবিয়াকে আবার ফিরিয়া পাইবে।"

আমি শাহজালালের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

(ইস্কান্দারখাঁর কথা)

যে নবকিশলয়ের শ্যামল সৌন্দর্য্য দেখিয়া রুবিয়া আমার মোহিত হইত, যে শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনীর বিশাল কুন্তলে, তারাহারের জ্যোতিঃ দেখিয়া সে পুলকিত হইত, তাহাদের সবই আছে, কিন্তু সে নাই! সরস সুবাসামোদিত সুখময় কোমলস্পর্শ পুষ্পঘ্রাণে, যে প্রাণে অতুল আনন্দ উপভোগ করিত, সে ফুল আছে—কিন্তু সে নাই। কোথায় সে গেল, কেন সে গেল? কেন সে প্রেমের আদর-আবাহন, প্রীতির বাঁধন সবলে ছিঁড়িয়া. মূহুর্ত্তমধ্যে এই জ্বালাময় ইহলোক হইতে অপসৃত হইল, এ কথা আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? যতই এইভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই সেই প্রসিদ্ধ ফকির শাহজলালের উপর আমার রাগ হইতেছিল।

কেন? শুনিবে কি? পাছে—আমি রুবিয়ার সমাধি-ব্যাপার দেখিতে যাই, পাছে রাজবাহাদুরের সিপাহীদের হাতে পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হই, এই ভয়ে, সেই বৃদ্ধ ফকির তাঁহার আস্তানার মধ্যবর্ত্তী এক তয়খানার কক্ষ মধ্যে, আমায় কৌশলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যে ফকির শাহজালাল, মুসলমানের চক্ষে প্রত্যক্ষদেবতা, তিনি বিপদের সময় করুণাবশে আমাকে আশ্রয় দিয়াও, এতটা লাঞ্ছনা করিতেছেন কেন? এ ছার প্রাণ গেলেই বা তাঁহার কি ক্ষতি ছিল? রুবিয়া যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন এ প্রাণ রাখিবার প্রয়োজনই বা কি?

সেই তয়খানার মধ্যে, একটী ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা স্থিরভাবে জ্বলিতেছে। কক্ষ দ্বারটী বাহির হইতে অর্গলাবদ্ধ। দুশ্চিন্তায় ক্লান্তি, ক্লান্তিতে অবসাদ. অবসাদে নিদ্রা আসিল। নিদ্রা-স্বপ্ন আনিল। স্বপ্নে দেখিলাম—রুবিয়া যেন আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে রূপ, যেন স্বর্গীয় শুভ্র-

প্রভায় উজ্জ্বলিত। সে চক্ষে—যেন মধুবর্ষী প্রেমময় ভাষা। আর সে সুন্দর মুখ, মৃত্যুকলঙ্কহীন এবং অতি সমুজ্জ্বল।

আমি কম্পিত হৃদয়ে চক্ষু মুদিয়া ধীর স্বরে বলিলাম—"রুবিয়া! রুবিয়া! তুমি কি বেহেস্তে গিয়াছিলে? আমায় সেখানে লইয়া চল রুবিয়া!"

"সে বলিল, না মরিলে সেখানে যাওয়া যায় না তো ইস্কান্দার?"

"মরিতেও আমি প্রস্তুত!"

"আমার জন্য তুমি এত উন্মত্ত কেন?"

"কেন—তা জানি না। মনকে অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হৃদয়ের সর্ব্বত্রই ইহার কারণানুসন্ধানের জন্য তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি, কোথাও এ প্রশ্নের উত্তর পাই নাই!"

"বেশ—তবে কিছুদিন এখানে অপেক্ষা কর।"

"কতদিন?"

"যতদিন না তোমার জীবনান্ত হয়!"

"জীবন ত আমার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হইলেই তাহা শেষ করিতে পারি!"

"কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ! তাহা হইলে তোমায় যে জাহান্নমে যাইতে হইবে। আমি বেহেস্তের প্রজা—জাহান্নমের তো নয়! বেহেস্তে না গেলে ত আমায় পাইবে না।"

"কে জানে আর কতদিন বাঁচিব! কিন্তু অত দীর্ঘকাল ত তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না।"

"না পার, তোমার এখানেও এমন একজন আছে, যাহাকে তুমি এখনও প্রাণ ভরিয়া ভালবাস।"

"কে—সে?"

"সুন্দরী শ্রেষ্ঠা গুলসানা!"

"গুলসানা! গুলসানা! না—না, তার কথা আর তুলিও না। একদিনের ভ্রমে যাহা করিয়াছি, তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

"যদি সেই গুলসানা, এখনি আসিয়া তোমায় বলে, ইস্কান্দার! তুমি যে আমার!"

"না—না, সে তা বলিবে না। আমিই তার রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলাম সে মজে নাই। সে সতী সাধ্বী। সে পবিত্র প্রেমানুরোধে, এক সামান্য পাঠান সেনাপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়া, রাজবাহাদুরের মত ঐশ্বর্য্যবান রাজার সম্রাজ্ঞী হইবার আশাও একদিন ত্যাগ করিয়াছিল। আর সে এখন আমারই কর্ম্মদোষে পথের ভিখারিণী। সে মহত্বে দেবী—মূর্ত্তিমতী করুণা সে।"

"বুঝিয়াছি! এটা তোমার মনের প্রকৃত কথা নয়। এখন আমি চলিলাম। তুমি সুখে নিদ্রা যাও।"

আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "না—না রুবিয়া! যাইও না! দেখ, তোমার জন্য ভাবিয়া কাঁদিয়া আমার দেহ শক্তিহীন, প্রাণ শান্তিহীন, নেত্রে অশ্রুধারা, আর বক্ষে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদী অতি তীব্র কম্পন। একবার আমার কাছে বসো রুবিয়া! তোমাকে শরীরি রূপে দেখিবার আশা তো এ জীবনে আমার একটুও নাই। এস তুমি প্রাণাধিকে! এস জীবন্ময়ি! এস সুস্মিতে! এস হৃদয়রঞ্জিনী! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব।"

রুবিয়া যেন আমার কাতরতা দেখিয়া, করুণার্দ্র স্বরে বলিল—"ভাল কথা! তোমার সুখের জন্য আরও কিছুক্ষণ থাকিব। কিন্তু একবার চোখ চাহিয়া দেখি, আমি এখন কত সুন্দর হইয়াছি!"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, যে সত্য-সত্যই রত্নালঙ্কার বিভূষিতা, বিচিত্র কারুকার্য্যময় উজ্জ্বল কৌষেয়-পরিধানা, এক অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা সুন্দরী রমণী আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমার চিত্ত

তখন উদ্ভ্রান্ত, দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতাবিহীন! আমি তাহাকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া বলিলাম—"কে তুমি ?"

"এখনও চিনিতে পারিলে না—আমি গুলসানা!"

"এ কঠোর রহস্য কেন গুলসানা ? এ ভগ্ন হৃদয়ে, শেলাঘাত করিতে আসিয়াছ কেন ? আমি তোমার উপর যে সব অত্যাচার করিয়াছি, তুমি কি এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছ ?"

"একটা কথা তোমায় সত্য বলিতে হইবে ? সেটা আমি আগে জানিতে চাই। তারপর আমি কেন আসিয়াছি, তাহা বলিব।"

"কি কথা ?"

"সত্য বল দেখি, আমি সুন্দরী, কি তোমার রুবিয়া সুন্দরী ?"

"কেন—কেন! সে প্রশ্নে তোমার অধিকার কি ?"

"আছে বলিয়াই বলিতেছি।" এই কথা বলিয়া গুলসানা এক ভুবন-মোহন কটাক্ষ হানিয়া, আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বল দেখি! ইস্কান্দার! আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশী সুন্দরী ?

আমি তাব্র বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলাম—"জানি না গুলসানা! যে পবিত্র ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধে আমরা এখন আবদ্ধ, তাহা সত্ত্বেও তোমার এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি অধিকার ? যদি নিতান্তই এর উত্তর চাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিব না। যদি তোমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে তাহা একবার আমার এ হৃদয়ের অতি নিভৃত কেন্দ্রে প্রসারিত কর। যে হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর, এক মোহিনী প্রতিমার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য-দীপ্তিতে উজ্জ্বলিত, সেই উজ্জ্বল দীপ্তির দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। সে দীপ্তি যে মুছিবার নয় গুলসানা! যদি হৃদয়ের সর্ব্বদিক প্রসারিণী, সেই প্রোজ্জ্বল হেমকান্তির স্মৃতি বিলোপ করিতে পারিতাম, হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত সে হৈমপ্রতিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে

পারিতাম, তাহাহইলে তোমায় বুঝাইতাম, এ জগতের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী! করুণাময়ী! কোথায় আজ তোমার সে করুণা, যাহার সহায়তায়, তুমি দুইবার এ ছার প্রাণ বাঁচাইয়াছ! কোথায় আজ তোমার সেই নারীগর্ব্বময় তেজ, যাহার প্রভাবে আমি আকবরশাহের সেনাপতি হইয়াও, একদিন তোমার কাছে অতি ঘৃণিত ও হেয় হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

গুলসানা মনোযোগের সহিত নির্ব্বাক্ভাবে আমার কথাগুলি শুনিতেছিল। সহসা সে মৌন-ভঙ্গ করিয়া, সেই রক্তোৎপল নিন্দিত ওষ্ঠাধরে মৃদু-হাস্য আনিয়া বলিল—"বুঝিয়াছি ইস্কান্দার! রুবিয়া এখন আমায় তাড়াইয়া দিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। আর তাহা জানিতে পারিয়াই, আমি এই ভীষণ কাজ করিয়াছি।"

আমি সাগ্রহে, সোৎসুকে, শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম—"কি ভীষণ কাজ করিয়াছ গুলসানা? আবার কি করিয়াছ তুমি সর্ব্বনাশী?"

গুলসানা বিকট ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিল—"ইস্কান্দার! জান না কি তুমি—আমিই রুবিয়ার মৃত্যু ঘটাইয়াছি!"

"তুমি? তুমি হৃদয়হীনা পিশাচী! কেন এ নিষ্ঠুর কাজ করিলে?"

গুলসানা বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, দর্পভরে বলিল—"কেন করিলাম শুনিবে? তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ—ইস্কান্দার! যে আমি পাঠান-কন্যা। আজ আমি যে পথে বসিয়াছি, রাণী হইতে দেওয়ানা হইয়াছি, সে কা'র জন্য ইস্কান্দার? প্রতারক! কৃতঘ্ন! পাষাণ! তুমি কি মনে ভাবিয়াছ, প্রতিশোধপরায়ণা পাঠান-কন্যা, তোমার অতীত অত্যাচারের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছে! দুই দুই বার সে তোমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু কেন তা জান? তোমাকে স্বহস্তে হত্যা করিবার জন্য?"

আমি উত্তেজনার সহিত বলিলাম—"আমার হত্যা করিবে, প্রতিশোধ

লইবে, আমার শোণিতে স্নান করিবে—একথা আগে বল নাই কেন গুলসানা? তোমার শাণিত অস্ত্রে বিভিন্ন হইবার জন্য, এ জ্বালাময় হৃদয় আমি যে স্বেচ্ছায় পাতিয়া দিতাম। এখন দাও, একবার আমার সেই বিগতপ্রাণা রুবিয়াকে দেখিতে।”

গুলসানা তাহার বক্ষ-মধ্য হইতে, এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল—“মনে ভাবিও না, ইস্কান্দার খাঁ! আমি তোমার সহিত রহস্য করিতে আসিয়াছি! রুবিয়ার সহিত আর তোমার দেখা হইবে না। এই শাণিত ছুরিকা তোমার সকল আকাঙ্খার শান্তি করিবে।”

আমি বলিলাম—“গুলসানা! স্নেহময়ী ভগিনী! কঠোর রহস্য রাখ। আমাকে মুক্ত করিয়া দাও। তোমার পায়ে ধরি. একবার জন্মের মত রুবিয়াকে দেখিতে দাও! না—দাও, তোমার ঐ ছুরিকা রক্ত কলঙ্কিত করিও না। আমার এই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, এই বক্ষে প্রোথিত করিয়া, আমাকে সকল যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার কর।”

আমি সবলে কটিদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা আকর্ষণ করিলাম। গুলসানা, তখনই ক্ষিপ্রগতিতে আমার হাত ধরিয়া ফেলিল। হাস্যমুখে বলিল, “ইস্কান্দার! এখন বুঝিলাম, তুমি কেবল রুবিয়ার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হও নাই! তাহার গুণেও অনুরক্ত। তোমার এ প্রেম—অনাবিল, পবিত্র, স্বার্থ-গন্ধ-রহিত। আমি শাহজালালের আদেশেই, তোমায় আজ এই ছলনাময় কৌশলে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। যাহা হউক—তুমি এখন মুক্ত—রুবিয়াকে তুমি পাইবে। শাহজালাল তোমায় এই পত্রখানি দিয়াছেন। এই পত্রের উপদেশ অনুসারে কাজ করিও।”

গুলসানাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, আমি তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলাম—“গুলসানা! আর একটু দাঁড়াও! আর একটা কথা শোন। বল—বল আমার রুবিয়া কোথায়?”

গুলসানা বলিল—"সাধু শাহজালালের কৃপায়, এ যাত্রা সে মৃত্যুর মুখ হইতে জীবনের সীমায় ফিরিয়া আসিয়াছে। শাহজালাল, এই আস্তানার বাহিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট তুমি সব কথাই শুনিতে পাইবে।" গুলসানা তখনই সে কক্ষ ত্যাগ করিল। আমি আবার স্বাধীনতা পাইয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভীমান্ধকার রাশি মথিত করিয়া, আমি অতি দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলাম। সম্মুখেই কলনাদিনী, স্নিগ্ধ-তরঙ্গময়ী, শুভ্রকায়া, প্রসারিত-বক্ষা—নর্ম্মদা। নর্ম্মদাতীর হইতে কিছু দূরেই বাদশাহী সমাধিক্ষেত্র। সে কবরখানা উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর পরিবেষ্টিত ও প্রহরী সুরক্ষিত। মনে ভাবিলাম—প্রহরীই থাক্, আর মৃত্যুই সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হউক, আমি রুবিয়াকে একবার স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইব।

আমি সমাধিক্ষেত্রের পশ্চাতের দিকের বালুকাময় তীরভূমি অতিক্রম করিয়া, প্রবেশদ্বারের দিকে যাইবার জন্য যেমন অগ্রসর হইয়াছি, অমনই কে যেন বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বলিল—"উন্মাদ! কোথায় যাইতেছ তুমি? তোমার কি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইবার ভয়ও নাই?"

এ কণ্ঠস্বর শাহজালালের। আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম—"প্রভু! প্রভু! আমি কাণ্ড-জ্ঞানবিহীন উন্মাদ। একবার আমাকে রুবিয়ার সমাধির কাছে যাইতে দিন।"

"কখনই দিব না। কেন ইচ্ছা করিয়া তুমি মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবে? রুবিয়া কোথায়? সমাধির মধ্যে সে ত নাই! এস তুমি আমার সঙ্গে।"

"বলেন কি?"

"বৎস ! আমাকে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিও।"

"তাহা হইলে রুবিয়ার মৃতদেহ কোথায় ?"

"তাহার মৃতদেহ পুনর্জীবিত হইয়াছে।"

"কে সে বিগতপ্রাণ দেহ পুনরায় প্রাণময় করিল ?"

"আমি ! খোদার ইচ্ছায়, রুবিয়ার কল্পিত মৃত্যু আমারই দ্বারা সৃজিত। কিন্তু খোদা চিরদিন করুণাময় ! তাঁহার কৃপা হইলে মৃতও জীবন পায়। ইস্কান্দার ! তুমি গুলসানার নিকট হইতে আমার একখানি পত্র পাইয়াছ ?"

"আপনার পত্র আমার এই উষ্ণীষের মধ্যে।"

"এখান হইতে আট ক্রোশ দূরে, এক পীরের আস্তানা আছে। সেখানে ফৈজী মহম্মদ বলিয়া একজন সাধু বাস করেন। তিনি আমার প্রিয়তম শিষ্য। তাঁহার নিকট তোমার গমন সংবাদ পাঠাইয়াছি। সেখানে গেলেই, তিনি তোমাকে আশ্রয় দিবেন।"

"বলুন—প্রভু ! সেখানে গেলে, রুবিয়াকে দেখিতে পাইব কি না ?"

"পাইবে !"

"রুবিয়ার সঙ্গে আর কে আছে ?"

"কুলসম !"

আমি শাহজালালের পদ-প্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম—"এ জীবন আপনার কাছে চিরদিনের জন্য বিক্রীত রহিল। আমি সামান্য মানব। আপনার চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, অকারণে সন্দেহ করিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি। আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

আমি ফকিরের পদবন্দনা করিয়া, সে স্থান হইতে বিদায় লইলাম। তাঁহার ব্যবস্থামত, নদীতীরে গিয়া একটি সজ্জিত অশ্ব পাইলাম। শাহজালালের ব্যবস্থা এত সুন্দর, যে সেই অপরিচিত অশ্বরক্ষক, বল্গাটি আমার হাতে দিয়াই, একটি সেলাম করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকারে মিশাইল।

নদীতীর দিয়া এক প্রস্তর মণ্ডিত ক্ষুদ্র রাজপথ বরাবর উত্তর মুখে চলিয়া গিয়াছে। আমি সেই পথে ঘোড়া ছুটাইলাম।

আমার অশ্ব, স্বেদজলে প্লাবিত। দ্রুতগমন-সঞ্জাত শ্রমে, তাহার মুখ দিয়া শুভ্র ফেণা বাহির হইতেছে। আমার শরীরও শক্তিহীন এবং ঘর্ম্মাক্ত। প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া যেন অসংখ্য অগ্নি-শিখা বাহির হইতেছিল। অশ্ব-বল্‌গা আর সংযত রাখিতে পারিতেছিলাম না। আর আমার সেই শ্রান্ত অশ্ব কশাঘাত স্বত্বেও এক কদমও অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না।

সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র সহর। সহরের নাম ত জানি না। জানিবার ইচ্ছাও হইল না। দেখিলাম—সম্মুখেই একটী মোসাফের-খানা। প্রভাতালোকে, আমি ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত অবস্থায়, এই সরাইখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তাহার প্রকাণ্ড দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্রই, দেখিলাম—এক রমণী সেই সরাইখানার অপর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া, আমার দিকেই আসিতেছে।

তাহাকে দেখিয়াই আমি অশ্ব-বল্‌গা সংযত করিলাম। কেন না, সে মূর্ত্তি আমার পরিচিত! সে মূর্ত্তি—কুলসমের!

আমি বিস্ময়াপ্লুত চিত্তে, আবেগভরে, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"কুলসম! কুলসম!"

কুলসমও আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, বিস্ময়-বিমুগ্ধ-ভাবে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে আমায় চিনিতে পারিয়া বলিল—"একি খাঁ সাহেব? হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! রুবিয়া দস্যু হস্তগত!"

"কার এত সাহস কুলসম—যে মালবেশ্বরের কন্যা শাহাজাদী রুবিয়াকে লুঠ করিয়া লয়!"

"তাহার গায়ে ত লেখা ছিল না সাহেব—যে সে শাহাজাদী রুবিয়া। আর আমার বোধ হয়, রুবিয়াকে যে ডাকাতে লুঠ করিয়াছে, সে বাজে

ডাকাত নয়। নিশ্চয়ই এ ডাকাতি, রুবিয়ার নির্ব্বাচিত স্বামী সেই পাপিষ্ঠ সুলতানের কার্য্য।"

একথা শুনিয়া আমি যেন অকূল পাথারে পড়িলাম। কুলসমকে সাগ্রহে প্রশ্ন করিলাম—"তোমাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল না?"

"আমি রুবিয়া এবং শাহজালালের এক বিশ্বস্ত অনুচর ব্যতীত আর কেহই আমাদের সঙ্গে ছিল না।"

"তুমি পলাইলে কিরূপে?"

"ডাকাতেরা আগেই আমাকে এক গাছের গায়ে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। আর সেই অবসরে ছদ্মবেশী সুলতান, রুবিয়াকে সহসা অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া, জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।"

"তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে?"

"ডাকাতেরা ভাবিয়াছিল, তাহারা আমাকে খুব দৃঢ়ভাবেই বাঁধিয়াছে। কিন্তু আমার প্রকৃত অবস্থা তাহা হয় নাই। তাহারা চলিয়া যাইবার পরই আমি চেষ্টা করিয়া, আপনিই বন্ধন-মোচন করি। তার পর ঘুরিতে ঘুরিতে, এইমাত্র এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। সাহেব! এখনও তাহারা বেশী দূর যায় নাই। এই পথ ধরিয়া আপনি উত্তর মুখে চলিয়া যান। হয়ত তাহাদের দেখিতে পাইবেন।"

আমি আর বৃথা কালক্ষয় না করিয়া, দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে রুবিয়া, আমার জীবনসর্ব্বস্ব, আমার নিরাশাময় জীবনের সুখস্বপ্ন, যে এই জ্বালাময় প্রাণের অমিয় শান্তিধারা, সেই রুবিয়া আজ দস্যুহস্তে! আর অপদার্থ আমি, বৃথা সৈনিক-দর্প লইয়া, তরবারির ভার বহিয়া বেড়াইতেছি? কি ঘৃণা! কি লজ্জা! কি পরিতাপ!

জঙ্গল আর শেষ হয় না। পথও যেন আর ফুরাইতে চায় না। জঙ্গল-পথের কষ্টও আর শেষ হয় না। সর্ব্বাঙ্গ—স্বেদজলে প্লাবিত। আমি উত্তরীয় দ্বারা কপাল হইতে স্বেদরাশি মুছিয়া ফেলিলাম। সেই শ্বাপদসংকুল, নির্জ্জন অরণ্যানী মথিত করিয়া, কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—"রুবিয়া—রুবিয়া!"

এই সময়ে সেই শব্দহীন, নির্জ্জন বনপ্রদেশ মথিত করিয়া কে যেন বলিল,—"কে কোথায় আছ? এক বিপন্না রমণীকে রক্ষা কর!"

যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, আমি সেই দিক লক্ষ্য করিয়া, তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইলাম। কিয়দ্দুর এইভাবে অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া একেবারে গতিশূন্য হইলাম।

দেখিলাম—সেই গভীর অরণ্যানী-মধ্যস্থ, এক নির্জ্জন ভগ্ন সমাধি-স্তম্ভ পার্শ্বে বসিয়া, আমার জীবনানন্দরূপিণী রুবিয়া! তাহার সে রূপ নাই, কান্তি নাই। মুখমণ্ডল বিশীর্ণ ও শ্রমক্লান্তিপূর্ণ। নেত্রদ্বয় ভয়চকিত।

রুবিয়া আমাকে চিনিতে পারিয়া, আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিল—"ইস্কান্দার! ইস্কান্দার! তুমি? তুমি এখানে আসিলে কেমন করিয়া?" সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তখনই সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু তখন বিলাপের সময় নয়! আমি রুবিয়ার মূর্চ্ছিত দেহ ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়া, এক পাষাণময় উন্মুক্ত স্থানে, রক্ষা করিলাম। যে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর তীরে অশ্বকে বাঁধিয়াছিলাম, সে নদী এই ঘটনাস্থল হইতে বেশী দূরে নয়। সেই সুনির্ম্মল তোয়পূর্ণা স্রোতস্বিনী হইতে, উষ্ণীষ বস্ত্র ডুবাইয়া বারি সংগ্রহ করিলাম। রুবিয়ার সেই মূর্চ্ছাপীড়িত আয়ত নেত্রদ্বয়ে, সুন্দর মুখে, সুকৃষ্ণ অলকারাজিতে, গৌর-দেহে, স্নিগ্ধ-সলিল-ধারা ঢালিয়া, উষ্ণীষবস্ত্র নিংড়াইয়া লইয়া মৃদুভাবে ব্যজন করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা শুশ্রূষার পর সে পূর্ণ চেতনা লাভ করিল।

উঠিয়া বসিয়া, রুবিয়া প্রসন্নমুখে বলিল—"এখন আমি সুস্থ হইয়াছি। আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। এখন উপায় কি ইস্কান্দার?"

আমি বলিলাম—"উপায়ের অভাব কি রুবিয়া? যখন আমরা দু'জনে আবার মিলিয়াছি, যখন খোদা দুই দুই বার তোমাকে বিপদের গ্রাস হইতে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন ভাবনার বিষয় কিছুই নাই। রুবিয়া! প্রাণাধিকে! যে অনন্ত অফুরন্ত প্রেম-মন্ত্রে, বিধাতার এই বিরাট বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে, আমরা সেই প্রেমের শক্তিতে কোন নির্জ্জন গহনবনে এক নূতন প্রেম-রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিব।"

রুবিয়া, সেই বিমলিন, বিশীর্ণ অথচ সৌন্দর্য্যভরা ওষ্ঠাধরে, মৃদুহাস্য আনিয়া বলিল—"জান না তুমি ইস্কান্দার! আমরা এখনও কি ভীষণ বিপদজালে বিজড়িত! মনে রাখিও, এখনও আমরা মালবরাজ্যের সীমার মধ্যে।"

আমি সাগ্রহে বলিলাম—"হৌক, তাহাতে ভয় করিও না। তোমার সম্বন্ধে সব কথাই আমি সাধু শাহজালাল ও কুলসমের নিকট শুনিয়াছি। যখন তুমি অমন ভীষণ মৃত্যু হইতে বাঁচিয়াছ, তখন এস প্রিয়ে! সেই মহিমময় খোদার করুণার উপর একান্ত নির্ভর করি।"

রুবিয়া এ কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সে ধীর ভাবে বলিল—"তাহা হইলে এখন যাইবে কোথায়?"

"কেন কুলসমের কাছে।"

"কুলসমের কাছে? সেও ত আমার মত ডাকাতের হাতে বন্দিনী।"

"না—খোদার কৃপায় সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। চল—আমরা এখনই এই বনের বাহির হইয়া যাই।"

"আবার যদি ডাকাতে আক্রমণ করে?"

"আমার এই শাণিত কৃপাণ তোমায় রক্ষা করিবে।"

"সে ডাকাত কে তা জান ? সেই পাপিষ্ঠ আলি সুলতান।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে রুবিয়া ?"

"সেই শয়তান ছদ্ম-বেশে থাকিলেও আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি ! তাহার কণ্ঠস্বরে সে ধরা পড়িয়াছে।"

"তুমি তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইলে কি উপায়ে ?"

"সেই নরাধম আমায় অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া, ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়। উদ্ধারের অন্য উপায় না দেখিয়া কোমলপ্রাণা রমণী হইয়াও, আমাকে কঠোর নিষ্ঠুরতা করিতে হইয়াছে। আমি তাহারই কটি নিবদ্ধ ছুরিকা খুলিয়া লইয়া, সহসা তাহার বাহুতে আঘাত করায়, সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায়। তাহার সঙ্গীরা অনেক পশ্চাতে ছিল। সেই সময়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া, আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া, গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করি।"

"রুবিয়া ! দুই বার যে খোদা তোমাকে দয়া করিয়া, অতি ভীষণ বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নাম লইয়া আমার সঙ্গে এস।"

আমরা দুই জনে সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। রুবিয়া আমায় স্কন্ধের উপর ভর রাখিল। অতি ধীর পদে, আমরা সেই বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সহসা সেই নির্জ্জন বনস্থলী বিকম্পিত করিয়া, অসংখ্য অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। একা আমি—অসংখ্যের বিরুদ্ধে কি করিতে পারি ? আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম—"রুবিয়া ! রুবিয়া ! বোধ হয় তোমাকে বাঁচাইতে পারিলাম না।"

সহসা দশ বার জন পদাতিক আসিয়া, আমাদের চারিধার বেষ্টন করিল। তাহাদের মধ্য একজন দীর্ঘকায় বর্ষাধারী পুরুষ, গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"অই পাপিষ্ঠ ইস্কান্দারকে এখনই বাঁধিয়া ফেল্।

আর আমাদের সঙ্গে যে শিবিকা আছে—তাহাতে এই হতভাগিনীকে তুলিয়া নে।”

যে ব্যক্তি এই কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন—তাঁহাকে দেখিয়াই আমি মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁপিয়া উঠিলাম! উৎকণ্ঠায়, উত্তেজনায়, আমার ধমনীসমূহে যেন রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গেল! আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলাম। কেন না—স্বয়ং মালবেশ্বর রাজবাহাদুর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত!

আমার যখন চেতনা হইল—দেখিলাম, আমি এক অন্ধতমসময় কক্ষে পর্ণশয্যার উপর পড়িয়া আছি। সেই কক্ষের রুদ্ধ বায়ুপ্রবাহই, যেন অতি ভীষণ পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ। ব্যাকুলতার সহিত, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, “আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। কে কোথায় আছ, আমায় মৃত্যু আনিয়া দাও!”

কেহই এ কথার উত্তর করিল না। সেই কারাকক্ষ একেবারে নিস্তব্ধ।

কিন্তু জীবনের এ বিপদময় অতি আসন্ন অবস্থাতেও, রুবিয়ার সংবাদের জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। হায়! কে আমাকে তাহার সংবাদ দিবে? দারুণ ভাবনায়, রাত্রিটা কাটিল। আর প্রভাত বিকাশে সেই কারাগহ্বরে সমুজ্জ্বল আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল।

প্রভাতের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে, প্রহরীরা আসিয়া আমার দরবারে লইয়া গেল। এর পর আমার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, পরে প্রকাশ পাইবে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

(ফকির শাহজালালের কথা।)

আমি সংসারত্যাগী উদাসীন। খোদার দাস—খোদার সেবক। তবুও দেখিতেছি, খোদার এ ভোগের সংসারে সর্ব্বত্যাগী—সন্ন্যাসীও, মায়ার ক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারে না। সে অনেক সময় মনে

ভাবে বটে—যখন স্ত্রী-পুত্র নাই, সংসারের কোন বন্ধনই নাই, তখন আমি সম্পূর্ণরূপে মায়ামুক্ত! কিন্তু এটা তাহার মহাভ্রম! মায়া যে কেবল স্ত্রী-কন্যা-পুত্র লইয়া—তাহা নয়। মায়াতে সৃজিত, পুষ্ট, অনুপ্রাণিত, এ সংসারে থাকিতে গেলে স্বতঃপরতঃ ভাবে মায়ার খেলায়, মিশিতেই হইবে।

যে সকল স্থানে—প্রধান প্রধান মুসলমান স্বাধীন-সাম্রাজ্য ছিল, সেই সেই স্থানের নরপতিগণের সহিত আমি মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতাম। কথার ছলে, প্রজাপালনের গুরুতর দায়িত্ব, আত্ম-বিগ্রহের শোচনীয় পরিণাম, এই সব কথা তাঁহাদের বুঝাইতাম। যাহাতে ভারতে স্বাধীন মুসলমান সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ না হয়, তাহার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। বলিলে যদি স্পর্দ্ধা না করা হয়, তাহা হইলে আমার পরামর্শেই, আকবরশাহ মালব-জয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। এইজন্য মালবের স্বাধীন রাজা বাজ্-বাহাদুর আমাকে বড়ই সম্মান করিতেন কেবল মালব কেন, এই সুযোগে আমি দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও আহম্মদনগর রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম।

সোহানী-পত্নী-গরীয়সী গুলসানা, যখন অবস্থা বিপর্য্যয়ে আমার আশ্রয় লইলেন, তখন আমার সুপ্ত স্নেহ-প্রবৃত্তি একটু ভিন্ন পথে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পাঠান-বীর সোহানী আমার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার গরীয়সী পত্নী রাজরাণী গুলসানা, তখন ঘটনাচক্রে পথের ভিখারিণী। এ বিপত্তিকালে তাহাকে আশ্রয় না দিলে, আমাকে মহাপাতকে পড়িতে হইবে এই ভাবিয়া, আমি আবার সংসারের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। গুলসানাকে কন্যাবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

গুলসানা এক দিন আমায় বলিল—"পিতঃ! এই ইস্কান্দার যেমন

আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তেমনি আমি আকবরসাহের নিকট বিচার-প্রার্থিনী হইয়া, স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লইয়াছি। দিল্লীতে স্বপদে নিযুক্ত থাকিলে আজ এই হতভাগ্য ইস্কান্দারখাঁ, নিজের শৌর্য্য-বীর্য্যে একহাজারী মন্সবদার হইতে পারিত। কিন্তু আমিই তাহা হইতে দিই নাই। আমরা উভয়েই উভয়ের অধঃপতনের কারণ। আর সে তাহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া, আমায় ভগিনী সম্বোধন করিয়াছে। আমি তাহাকে এখন ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করি। এখন সে আমার শত্রু নহে। প্রতিহিংসার ও অত্যাচারের দেনা-পাওনার জের, আমরা আপনা আপনি মিটাইয়া লইয়াছি। আশা করি, আপনিও তাহাকে আমার ন্যায় মার্জ্জনা করিবেন।” গুলসানার এই অনুরোধে আমি ইস্কান্দারের অপরাধ ভুলিয়া, তাহাকে আমার স্নেহময় কোলে তুলিয়া লইলাম।

বাজবাহাদুরের রূপবতী মহিষী রূপমতী বেগম, আমার মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। মাতৃহীনা রুবিয়াও আমার পার্শ্বে বসিয়া, আগ্রহের সহিত ধর্ম্মকথা শুনিত। আমি পূর্ণ-সংসারীর মত স্নেহ-প্লাবিত হৃদয়ে, অনেকবার সেই বালিকা রুবিয়াকে কোলে তুলিয়া লইয়াছি। রাণী রূপমতী বিমাতা হইয়াও, রুবিয়াকে যে গর্ভজাত কন্যার মত স্নেহ করিতেন, তাহা কেবল এ অধমেরই উপদেশে।

রূপমতী বেগমের খাস-বাঁদী কুলসমের কথা, আমি গুলসানার মুখেই প্রথম শুনি। নর্ম্মদা-তীরে, এক নিভৃত স্থানে, আমার আস্তানা ছিল। রাণী রূপমতী, কখনও কখনও সেই আস্তানায়, কুলসমকে আমার সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইতেন। কখনও বা তিনি আস্তানার দরিদ্র অতিথিদের সেবার জন্য, প্রচুর খাদ্যাদি পাঠাইয়া দিতেন। এই জন্য কুলসম আমার বিশেষ পরিচিত। আর এই কুলসম অনেক সময়ে তাহার পূর্ব্ব প্রভু-পত্নী গুলসানাকে দেখিবার জন্য, নানা অছিলায়

আমার আস্তানায় আসিত ও গুলসানার সহিত নানা কথায় সময়ক্ষেপ করিত।

এক দিন কুলসম গুলসানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। দেখিলাম, সেদিন তাহার মুখের অবস্থা অতি বিষণ্ন। বুঝিলাম, সে কোন দারুণ চিন্তা-পীড়িত। কুলসম চলিয়া যাইবার পর, গুলসানা আমার কাছে আসিয়া বলিল—"পিতঃ! আমি এক মহাবিপদে পড়িয়াছি!"

আমি সস্নেহে বলিলাম—"যে বিপদ তোমার হইয়া গিয়াছে, তার চেয়ে আর বেশী বিপদ কি হইতে পারে মা?"

কুলসমের নিকট, রুবিয়ার প্রেমকাহিনী সম্বন্ধে গুলসানা যাহা কিছু শুনিয়াছিল, সবই অকপটে ও বিনাসংকোচে আমায় খুলিয়া বলিল। তার পর সে দুইটি হাত জোড় করিয়া, নতজানু হইয়া আমার সম্মুখে বসিয়া বলিল—'পিতঃ! রুবিয়া এই ইস্কান্দার খাঁকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছে। যাহাতে বাজবাহাদুর জোর করিয়া সেই হীনচরিত্র সুলতানের সহিত রুবিয়ার বিবাহ না দিতে পারেন, তাহার চেষ্টা আপনাকে করিতে হইবে।"

আমি গুলসানার নিকট কোনরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু তাহাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলাম। সেই রাত্রে নর্ম্মদা তীরের প্রাসাদে, যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটে—তাহা সকলেই জানেন। আমি সেই দিন রাত্রে, প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত—বাজবাহাদুরের কক্ষে ছিলাম। যখন শুনিলাম, সেই রাত্রেই তিনি কন্যাকে, সুলতান সম্বন্ধে নানা কথা বুঝাইবার জন্য, নর্ম্মদাতীরের প্রাসাদে যাইতেছেন—তখনই আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম।

দ্রুতপদে আমি আস্তানায় ফিরিয়া আসিয়া, গুলসানাকে এই ভয়ানক বিপদের কথা বলিলাম। গুলসানা এ কথা শুনিয়া বড়ই চিন্তিতা হইল।

রুবিয়ার কক্ষে—ইস্কান্দারকে দেখিতে পাইলেই, বাজবাহাদুর যে তখনই তাহাকে হত্যা করিবেন, এই ভাবিয়া গুলসানা বড়ই শঙ্কিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমর্ষভাবে সে বলিল—"পিতঃ! দেখিতেছি, এ ব্যাপারে বিষম সর্ব্বনাশের সূচনা হইবে! ইস্কান্দার দূরে থাক, বাজবাহাদুর তাঁহার কন্যাকেও মার্জ্জনা করিবেন না। বাজবাহাদুরের হৃদয়ের উপর যদি আমার একটুও শক্তি থাকে, আজ তাহার মহা পরীক্ষার দিন! আমি এখনই প্রাসাদে চলিলাম।"

আর কিছু না বলিয়া, গুলসানা তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। বোধ হয়, ঠিক সময়েই সে প্রাসাদে পৌঁছিয়াছিল। গুলসানা কি করিয়া সে যাত্রা ইস্কান্দারের জীবন রক্ষা করে, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। আমার আস্তানা হইতে, এই প্রাসাদ খুব নিকটে।

ইস্কান্দার তখনকার মত বাঁচিল বটে—কিন্তু রুবিয়ার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। দারুণ মর্ম্মযাতনায়, অপমানে, লাঞ্ছনায়, আতপ-তাপবিদগ্ধ স্বর্ণ-লতিকার ন্যায়, রুবিয়া দিনে দিনে শুকাইতে লাগিল। নিরাশায় তাহার কোমলপ্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে পীড়িত হইল।

আমি একবার রূপমতী বেগমকে চিকিৎসা করিয়া, তাঁহাকে কোন সাংঘাতিক পীড়া হইতে বাঁচাইয়াছিলাম। সেই অবধি আমার চিকিৎসার উপর বাজবাহাদুরের অনন্ত বিশ্বাস। পীড়িতা রাজকন্যা রুবিয়ার চিকিৎসাভার, কাজেকাজেই আমার উপর পড়িল।

আমার চিকিৎসার গুণে, রুবিয়ার অবস্থা একটু ভাল হইল। সে একদিন নির্জ্জন অবসর পাইয়া, আমার পা দুখানি জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—'পিতঃ! আপনি আমায় বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন না। সত্য বটে—আমি বাদ্‌সাজাদী। কিন্তু আমার মত হতভাগিনী এ দুনিয়ায় আর নাই। আহম্মদনগরের সুলতান, যদি আমার স্বামী হন,

তাহাহইলে তাহা আমার পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণারও অধিক হইবে। মৃত্যু ভিন্ন আমার উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নাই। পিতঃ! আপনি জীবনের পরিবর্ত্তে আমাকে মৃত্যু দিন।"

সন্ন্যাসী হইয়াও আমি তাহার গভীর মর্ম্মবেদনা বুঝিলাম। তাহাকে বলিলাম—"মা! তুমি মৃত্যু চাহিতেছে, তাহাই তোমায় দিব! এই মৃত্যু-পথ দিয়াই, তুমি ইস্কান্দারের সহিত মিলিতা হইবে। তোমার সম্বন্ধে সব কথাই কুলসম আমাকে বলিয়াছে।"

তাহার পর আমি যাহা করিলাম, তাহা অতি বিপদজনক! জীবন মরণের প্রচুর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া, খোদার নাম করিয়া, রুবিয়াকে এক তীব্র বিষাক্ত রসায়ন সেবন করিতে দিলাম। এ রসায়নের ক্রিয়াশক্তি অতি ভয়ানক। ইহা সেবনে, প্রথম দিবস হইতে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর লক্ষণ সর্ব্বদেহে বিকশিত হয়। এই কল্পিত মৃত্যুর ঔষধ এবং এই মৃত্যু হইতে বাঁচাইবার দাওয়াও আমার জানা ছিল।

আমার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে, সমস্ত কথাই আমি গুলসানাকে খুলিয়া বলিলাম। আর ইহা ভিন্ন রুবিয়ার উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া, সেও আমার কার্য্য-প্রণালী সমর্থন করিল। ইহার একদিন পরে, কুলসম কারাগার হইতে পলাইল। কি উপায়ে সে আমার আস্তানায় আসে, তাহাও পাঠক জানেন। পরিশেষে আমার চেষ্টায়, খোদার ইচ্ছায়, রুবিয়া মরিল। পাষাণ-হৃদয় বাজবাহাদুর, কন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে, বালকের মত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শাহাজাদীর উপযুক্ত সম্মানের সহিত—রুবিয়া সমাধিস্থ হইল।

তাহার সুন্দর কান্তিময় দেহ, তুষারশীতল মৃত্তিকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। সমাধির সময়, রুবিয়ার শবদেহ বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও কৌষেয়-বসনে

সজ্জিত করা হইয়াছিল। পাছে নীচ প্রকৃতির তস্করে, এইগুলি অপহরণ করে, এই জন্যই সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে পাহারার বন্দোবস্ত ছিল।

কিন্তু খোদা আমার সহায়। সহসা বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝা উঠিল। প্রহরীরা যতক্ষণ পারিল, ঝড়ের সহিত যুঝিল। শেষ তাহারা আর্দ্রবস্ত্রে, আমারই আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত। প্রবল ঝটিকা-পীড়নে, তাহাদের যেন দম বন্ধ হইবার মত হইয়াছে।

তাহাদের আশ্রয় দিলাম, পরিধান-জন্য শুষ্ক বস্ত্র দিলাম, খাদ্য দিলাম। বলিলাম—"তোমরা আজ এইখানেই রাত্রিযাপন কর। এই ভয়ানক দুর্য্যোগে, কে আর শব-দেহের অলঙ্কার চুরী করিতে আসিবে?"

আমি আস্তানার এক নিভৃতাংশে গিয়া, গুলসানা, রুমি ও কুলসমকে লইয়া রুবিয়ার উদ্ধারের পরামর্শ করিতে লাগিলাম। কুলসম দেখিয়া আসিল, প্রহরীরা অঘোরে ঘুমাইতেছে।

বলা বাহুল্য—গুলসানা কুলসম এবং আমার এক বিশ্বস্ত শিষ্যের সহায়তায়, আমি সেই ঝটিকাময়ী রজনীতেই, সমাধিগর্ভ হইতে রুবিয়াকে উদ্ধার করিলাম। অন্য এক প্রকার শক্তিসঞ্চারক ঔষধ সেবন করাইয়া, তাহাকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আনিলাম।

সেই স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরে, আমার এক প্রিয় শিষ্যের আস্তানা। আমি একখানি পত্র লিখিয়া, আমার এক বিশ্বাসী শিষ্য ও কুলসমকে, রুবিয়ার সঙ্গে দিলাম। খনিত সমাধির অবস্থা, ঠিক পূর্ব্বের মত করিয়া রাখিয়া, আমি ও গুলসানা আস্তানায় ফিরিলাম। তখন রজনীর শেষ যাম। তখনও সেই প্রহরীদ্বয় অকাতরে ঘুমাইতেছে।

এই ঘটনার একদিন পরে, যখন শুনিলাম—ইস্কান্দার খাঁ বন্দীরূপে রাজসভায় আনীত, আর তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে; তখন আমি বড়ই কাতর হইয়া উঠিলাম। সমগ্র বিশ্ব যেন আমার চোখের সম্মুখে

ভঁাটার মত ঘুরিতে লাগিল। বাজবাহাদুর যাহা ধরেন, তাহা ত ছাড়েন না! কি করিয়া ইস্কান্দারের জীবন রক্ষা করিব, তাহাই তখন আমার প্রধান চিন্তা হইল।

হায়! কেন রুবিয়াকে পুনর্জীবিত করিলাম! ইস্কান্দার মরিলে রুবিয়ার দশা কি হইবে? হায়! রুবিয়া! হা! রুবিয়া।

আমি গুলসানাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। গুলসানা বলিল— "দেখি এ ক্ষেত্রে আমার দ্বারা কি হয়? আজ আমার নারীশক্তির শেষ পরীক্ষা। আজ দেখিব, আমার মত ছার রমণীর শক্তি বেশী, কি বাজবাহাদুরের শক্তি বেশী। চলুন আমরা এখনই দরবারে যাই।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমাকে সহসা দরবার কক্ষ মধ্যে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, মালবেশ্বর বাজবাহাদুর, আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। গুলসানাকে আমি অন্তরালে রাখিয়া গিয়াছিলাম।

মালবেশ্বর আমার সহিত আর কোন কথা না কহিয়া, তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আহম্মদনগরের সেই দুর্দ্দান্ত সুলতানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শাহাজাদা! আপনি আজ আমার নিকট বিচারার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি ন্যায় ও ধর্ম্মের আসনে বসিয়া, এই রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছি। আপনার আরজ্ কি বলুন?"

সুলতান অগত্যা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া, বিকৃত-স্বরে বলিলেন— "এই ইস্কান্দার খাঁ আপনার কন্যা এবং আমার বাক্‌দত্তা পত্নী, রুবিয়াকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। চক্রান্ত দ্বারা, এ তাহাকে ভীষণ মৃত্যুর অধীন করিয়াছে। পিশাচের দ্বারা যে কাজ সম্ভব নয়, মানুষ হইয়া সে তাহা

করিয়াছে। এ অপরাধ আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা হইয়াছে বলিয়াই, আমি আপনার কাছে আজ বিচারপ্রার্থী।"

রাজবাহাদুর—শৃঙ্খলাবদ্ধ ইস্কান্দার খাঁর দিকে চাহিয়া বলিলেন "গোলাম! ইস্কান্দার! অপরাধ স্বীকার কর্। তাহা না হইলে, তোর অতি শোচনীয় মৃত্যু ব্যবস্থা করিব।"

ইস্কান্দার তেজ-দর্পিত ভাবে বলিল—"যদি প্রাণের বিনিময় প্রকৃত বিবাহ হয়, যদি সুপবিত্র প্রেম ও ভালবাসা, দাম্পত্যজীবনের পবিত্র মন্ত্র হয়, যদি রত্নহার বিনিময়ে বিবাহ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই রুবিয়া আমার ধর্ম্মপত্নী! সে স্বেচ্ছায় আমায় পতিত্বে বরণ করিয়াছে। জানিবেন সাহান-শা! আমি রুবিয়ার অমূল্য প্রেমের নিকট, এ জীবনকে অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করি। আমি স্বীকার, করিতেছি—এ ব্যাপারে আমিই কেবল মাত্র অপরাধী।"

এই কথা শুনিয়া আমি বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"সাহান শা! যদি আপনি খোদার নামে শপথ করিয়া এ রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই নিরপরাধ ইস্কান্দার খাঁকে ছাড়িয়া দিন। এ সংসারে অনাবিল পবিত্র প্রেম, খোদারই প্রেরিত। যদি এ ব্যাপারে কেহ দোষী থাকে—সে আমি। আমিই উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইস্কান্দারের সহিত রুবিয়াকে মিলিত করিবার জন্য, তাহার এই কল্পিত-মৃত্যু ঘটাইয়াছি। আবার আমিই তাহাকে সমাধি-গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া, মৃত্যুর পথ হইতে পুনরায় জীবনের পথে আনিয়াছি। জাঁহাপনা! যদি আপনি রাজ-দণ্ডের মর্য্যাদা রাখিতে চান, তাহা হইলে আমারই শোচনীয় প্রাণদণ্ড করুন।"

রাজবাহাদুর বজ্র-গম্ভীরনাদে বলিলেন—"আপনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী! এই কুৎসিত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া, আপনি পবিত্র ইস্লাম্-

ধর্ম্মের উপর কলঙ্কক্ষেপ করিয়াছেন। সমাজের চক্ষে, ধর্ম্মের চক্ষে, রাজার চক্ষে, আপনি আর সন্ন্যাসী নহেন। মৃত্যুই আপনার উপযুক্ত শাস্তি! কিন্তু আমি সে ব্যবস্থা করিব না। আপনি আজীবন কারাবদ্ধ হইয়া থাকিবেন—এই আমার আদেশ। প্রহরীগণ! এই ভণ্ড-সাধুকে এখনি বন্দী কর।”

আমি তখনই হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া দিলাম। রাজাদেশে প্রহরী আমায় ধরিতে যাইতেছে, এমন সময় কোথা হইতে গুলসানা জ্বলন্ত বিদ্যুতের মত সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া, দর্পিতস্বরে বলিল—“সাবধান! মালবেশ্বর! ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, সাধু সন্ন্যাসীর অবমাননা করিও না। প্রচণ্ডশক্তিশালী ভারতেশ্বর আকবরসাহ এই সন্ন্যাসীর অনুগত শিষ্য। জাননা কি বাজবাহাদুর! সম্রাট্ আকবরসাহ বহুদিন হইতে তোমায় শৃঙ্খলিত করিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন! যে মহাত্মা এতদিন পর্য্যন্ত তোমার রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে তোমার এই ব্যবহার? যে ইস্কান্দার খাঁ—বিনা স্বার্থে, একদিন তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, আজ কিনা তুমি তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছ? এই কি তোমার কৃতজ্ঞতার “ঋণ-পরিশোধ?” আর এই পাপিষ্ঠ নরাধম সুলতান, যে ছদ্মবেশী দস্যুরূপে, তোমার কন্যার সতীত্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, আহম্মদনগরের প্রকৃত সুলতানকে. সিংহাসনের যথার্থ অধিকারীকে নৃশংসভাবে গুপ্ত-হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছে, সে তোমার বিচারে নির্দ্দোষী! ছি! ছি! বাজবাহাদুর! তুমি অতি অপদার্থ! এখন বুঝিতেছি, তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ না করিয়া আমি ঠিক কাজই করিয়াছিলাম!”

গুলসানার কথায় সমস্ত ঘটনা-স্রোত ফিরিয়া দাঁড়াইল। আহম্মদনগরের সুলতান, বিমর্ষমুখে সভাস্থল হইতে গুপ্তভাবে সরিয়া পড়িলেন।

বাজবাহাদুরও মর্ম্মে মর্ম্মে, তীব্র জ্বালা অনুভব করিলেন। তিনি দেখিলেন, গুলসানার চক্ষুর্দ্বয় তখনও বিদ্যুতের মত জ্বলিতেছে।

বাজবাহাদুর তীব্র বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন–"গুলসানা! তোমার ধৃষ্টতা বহুবার মার্জ্জনা করিয়াছি। কিন্তু নারীর পক্ষে এইরূপ ধৃষ্টতা অতি লজ্জাকর! এখনি এ স্থান ত্যাগ কর।"

গুলসানা ধীরভাবে যুক্তকরে বলিল—"আমি যদি জাঁহাপনার নিকট কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার বিচার আপনি করিতে পারেন। কারাগার, প্রাণদণ্ড, যাহাই ব্যবস্থা করিবেন—তাহাতেই আমি স্বীকৃত। কিন্তু জাঁহাপনা! মনে আছে কি, একদিন আপনি এক নির্জ্জন নিশীথে, এই অভাগিনীর পবিত্র বিশ্রামকক্ষে, চোরের মত প্রবেশ করিয়া, অতি কাতর ও বিনীত ভাবে এক ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন? আর এই অভাগিনী, নিজের নারী-সম্মানকে অক্ষত রাখিয়া,আপনাকে সে ভিক্ষা দিয়াছিল! সেইজন্য আজ আপনার নিকট আমি আর একটী ভিক্ষা চাহিতেছি। না—দেন, আপনার সভাসদগণ সমক্ষে, এই জগতের সমক্ষে, আপনার সেই কাতর ভিক্ষার অদ্ভুত কাহিনী, এখনিই ব্যক্ত করিয়া দিব।"

ভীমকায় ক্রুদ্ধ অজাগর, সহসা মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ হইলে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, গুলসানার মুখে এই কথা শুনিয়া, বাজবাহাদুর সেইরূপ স্থিরভাব ধারণ করিলেন।

অপ্রতিভ ভাবে, ধীরস্বরে তিনি বলিলেন—"গুলসানা! আমি এতদিন বুঝি নাই, কিন্তু আজ বুঝিলাম, নারীর শক্তি কত বেশী! দর্পভরে—উন্নত মস্তকে আজীবন চলিয়াছি, কাহারও নিকট অবনত হই নাই, কিন্তু আজ তোমার নিকট হইলাম। গুলসানা! গুলসানা! শান্ত হও। তোমার জিহ্বাকে বাকৃশক্তিহীন কর। আর বিষোদ্গীরণ করিও না। আর—না, যথেষ্ট হইয়াছে!"

সাহজালালের চরণ-বন্দনা করিয়া সম্রাট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার আদেশে ইস্কান্দার তখনই বন্ধনমুক্ত হইল। বাজবাহাদুরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, গুলসানা বলিল—"কই মালবেশ্বর! এ অভাগিনীর কাতর প্রার্থনা ত পূর্ণ করিলেন না?"

বাজবাহাদুর বলিলেন—"বল তোমার কি প্রার্থনা গুলসানা?"

গুলসানা হাসিয়া বলিল—"রাণীগিরি অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছি যে—জনাব! আমাকে আপনার প্রাসাদে না হয় দুই একদিনের জন্যও রাণীগিরি করিতে দিন। আদেশ করুন, যে আমি এ প্রাসাদে দুই দিন যেরূপ ব্যবস্থা করিব, যাহা কিছু করিব, তাহা আপনার কৃতকার্য্য বলিয়াই যেন বিবেচিত হয়। আপনার কর্ম্মচারীদের এখনই সেই আদেশ দিন।"

বাজবাহাদুর গুলসানার প্রসন্নমুখ দেখিয়া, অনেকটা প্রফুল্ল হইলেন। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"তোমার মনের কথা কি তাহা আমি বুঝিয়াছি। তাহাই স্বীকার করিলাম। কাল হইতে সাত দিনের জন্য, তুমি এই প্রাসাদের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলে। কেহই তোমার ইচ্ছায় বাধা দিবে না।"

আমি কিন্তু এ ব্যাপারের কোন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সত্যই কি গুলসানা মায়াবিনী! গোটাকয়েক সামান্য কথায়—সে এত বড় একটা মলুকের মালেককে একেবারে কিছুই নয় করিয়া ফেলিল!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

(ইস্কান্দার খাঁর শেষ কথা)

সে দিনের দরবারকক্ষ, আজ শত সহস্র আলোক-মালা-মণ্ডিত হইয়া, বিচিত্র নন্দনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অসংখ্য উজ্জ্বল ও চঞ্চল আলোক-রেখা,—সেই রত্নখচিত মর্ম্মর দালানের স্তম্ভগাত্রে পড়িয়া, অতি বিচিত্র শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিক, সদ্য-প্রস্ফুটিত সুরভিভার

মণ্ডিত, পুষ্পমালিকার পরাগচূর্ণে পূর্ণ। স্বর্ণ ও রৌপ্যময় কৃত্রিম প্রস্রবণ-সমূহ হইতে শতধারে উৎসারিত হইয়া, গোলাপবারি ছুটিতেছে। এ সেই গুপ্ত দরবারগৃহ—যেখানে ভাগ্যচক্র-নিপীড়নে, পূর্ব্বদিনে আমি বন্দীরূপে রাজবাহাদুরের সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

রাজাজ্ঞায় আজ আমি রাজোচিত বিচিত্র বহুমূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিত। আর রাজবাহাদুরের পার্শ্বচর যত আমীর, ওমরাহ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং মালবের গণ্যমান্যগণ, সেই বিচিত্র আলোকজ্বলিত সুসজ্জিত মিলনসভায় উপস্থিত।

সহসা গভীর দামামাধ্বনি হইল। সকলেই বুঝিল, মালবেশ্বর দরবারে আসিতেছেন। বাদসাহকে দেখিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজবাহাদুরের সঙ্গে আমার আনন্দময়ী—রুবিয়া। উজ্জ্বল বেশভূষায়, উজ্জ্বল রত্নালঙ্কারে—রুবিয়া যেন স্বর্গের অপ্সরীর মত দেখাইতেছিল।

রাজবাহাদুর সভাস্থলে আসিয়া, সকলের মধ্যে দাঁড়াইলেন। ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"মহাপ্রাণ ইস্কান্দার খাঁ! তুমি একদিন আমার এ ক্ষুদ্র জীবন রক্ষা করিয়াছিলে। সে ঋণ আমি এত দিন পরিশোধ করিতে পারি নাই। সেই জন্য আজ আমার স্নেহময়ী কন্যা রুবিয়াকে তোমার করে সমর্পণ করিয়া, আমি আমার জীবনরক্ষার "ঋণ-পরিশোধ" করিলাম। আমি পুত্রহীন। সেইজন্য তুমিই আমার অবর্ত্তমানে, এই মালব সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।"

চারিদিক হইতে শত সহস্র কণ্ঠে, সেই দরবারগৃহে আনন্দ কোলাহল উঠিল। নানাবিধ আমোদপ্রমোদের পর, গভীর রাত্রে, সেই বিরাট-সভা ভঙ্গ হইল। আমরা অন্তঃপুরে চলিয়া আসিলাম।

মালবেশ্বরীর বিলাস-মন্দির "শীশ-মহলেই" আমাদের বিবাহ-বাসর। শীশ-মহলের প্রশস্ত উঠানে, এক সুন্দর কৃত্রিম ক্রীড়াকানন। অতি

শুভ্র মর্ম্মরবেদীর উপর, সেই গভীর নিশীথে আমি ও রুবিয়া, পাশাপাশি বসিয়া, এক অপার্থিব সুখসম্ভোগ করিতেছি। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া, প্রেমোচ্ছ্বাস-রুদ্ধ-কণ্ঠে, লজ্জা-বিজড়িত অস্ফুট প্রেমমাখা স্বরে, রুবিয়া আমায় ডাকিল—"ইস্কান্দার!"

অদূরে স্বর্ণপিঞ্জর মধ্যে একটা বাকসিদ্ধ হীরামন পাখী দুলিতেছিল। সেও ডাকিল—"ইস্কান্দার।"

আমি রুবিয়াকে গভীর-আলিঙ্গন নিপীড়িত করিয়া বলিলাম,—"রুবিয়া! রুবিয়া! সেই একদিন, আর আজ একদিন।"

রুবিয়া বলিল—"সত্যই ইস্কান্দার! সেই একদিন, আর আজ একদিন।

আমি প্রেম-মুগ্ধ কণ্ঠে বলিলাম—"সেদিন বিরহের, আজ মিলনের। কে জানিত, আজ এই সুখের নন্দনকাননে, আমরা পতি-পত্নীরূপে মিলিত হইব?"

রুবিয়া একবার ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিল! যোড়হস্তে বলিল—"খোদা! মেহেরবান্! আমাদের এ সুখে যেন আর কোন বাধা না হয়! আমরা যেন তোমারই পবিত্র প্রেম-মুগ্ধ হইয়া, তোমার এই সোণার সংসারে মানুষের কর্ত্তব্য কিছু করিতে পারি।"

সহসা এই সময়ে, অদূরে যেন কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, দুইটী রমণীমূর্ত্তি। গুলসানা আর কুলসম, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

গুলসানা কাছে আসিয়া তাহার সেই বিষাদ-মলিন মুখে, একটু হাসি আনিয়া বলিল—"ইস্কান্দার! আজ তোমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছি, তাহার কাছে আমার এ সামান্য উপহার অতি তুচ্ছ! আমার নিজের এই অকিঞ্চিৎকর রত্নালঙ্কারগুলি, রুবিয়াকে স্নেহোপহার দিলাম। এ গুলি আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রুবিয়াকে পরিতে দিও।"

এই কথা বলিয়া, গুলসানা বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিল। তাহার পর রুদ্ধস্বরে বলিল—"সংসারের সহিত আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হইয়াছে। ভাই ইস্কান্দার! আমি জন্মের মত বিদায় লইতে আসিয়াছি! আমার ফুলসনকে দেখিও, এই আমার পক্ষে শেষ অনুরোধ। তোমার বিমল স্নেহের "ঋণ-পরিশোধ" করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। ধরিতে গেলে প্রকারান্তরে তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। আজ যদি আমি, বিলাসসুখ- সম্ভোগে মত্ত থাকিয়া, রাজরাণীরূপে কালযাপন করিতাম, তাহা-হইলে হয়ত খোদাকে ভুলিতাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ও রুবিয়া জীবনে চিরসুখী হও। আমায় বিদায় দাও ভাই ইস্কান্দার!"

আমি রুদ্ধস্বরে বলিলাম—কোথায় যাইবে তুমি গুলসানা? আমার মত হতভাগ্যকে এত করুণা করিয়া, তার প্রতিদান না লইয়া কোথায় যাইবে চঞ্চলে? না—না তোমাকে যাইতে দিব না। আমিই তোমার যত কষ্টের মূল। যে মহা পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের উপায়ও স্থির করিয়া রাখিয়াছি। বাজবাহাদুর, এ মালবরাজ্য আমাকে দিয়াছেন। তুমি এ রাজ্যের—রাজরাজেশ্বরী। আমি তোমার আজ্ঞা-বাহী দাসরূপে, এ রাজ্য শাসন করিব। গুলসানা আর ও সব নিষ্ঠুর কথা বলিও না। রাজ্যেশ্বরী হইয়া তুমি মালব সিংহাসনের শোভাবৃদ্ধি কর। আমি ভৃত্যরূপে তোমার রাজ্যরক্ষা করি। তোমার পায়ে ধরিতেছি।"

গুলসানা সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ছি! ছি! ওসব করিতে নাই। আমি ফকির সাহেবের সহিত পবিত্র মক্কাধামে হজব্রত পালনে চলিলাম। যদি ফিরিয়া আসি, আবার দেখা হইবে।"

আর কিছু না বলিয়া বা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সেই মহিমময়ী দেবীপ্রতিমা গুলসানা, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি নিশ্চল পাষাণবৎ

সেই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটী মর্ম্মভেদী আকুল নিশ্বাসে মর্ম্মযাতনা প্রকাশ করিলাম।

দিনের পর দিন গেল। মাসের পর মাস গেল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত ও বসন্ত কাটিল—সেই সঙ্গে বৎসর কাটিল, তবু আমার চিত্ত হইতে গুলসানার স্মৃতি মুছিল না।

সাহজালাল ফকির এক বৎসর পরে, আবার মালবে ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিলাম—"প্রভু! আপনি ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু গুলসানা কোথায়?"

সাহজালাল একটু তিরস্কারপূর্ণস্বরে বলিলেন—"হায়! হতভাগ্য! এখনও তুমি তাহার স্মৃতি লোপ করিতে পার নাই। সেই সুন্দর দেহ, তুষার-শীতল কবরের পবিত্র মৃত্তিকা মধ্যে, চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে। সে তোমাদের কাঁদিবার জন্য রাখিয়া হাস্যমুখে বেহেস্তে চলিয়া গিয়াছে।"

আমি দারুণ মর্ম্মযাতনায়, কেবল চোখের জলই ফেলিলাম। কিন্তু গুলসানার স্মৃতি লোপ করিতে পারিলাম না। এ জীবনেও পারিব না। কেন—তাহা জানি না, বলিতে পারি না সেকথা বুঝাইবার শক্তিও নাই।

আমি নর্ম্মদাতীরে মীনা-মসজেদের নিকট গুলসানার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য, প্রচুর অর্থব্যয়ে এক স্ফাটিকপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলাম। তাহার মধ্যে গুলসানার এক স্বর্ণময় উজ্জ্বল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলাম। সেই নবনির্ম্মিত "শীশ্-মহলে" গুলসানা সহস্র মূর্ত্তিতে বিরাজিতা হইল। লোকে সেই স্মৃতিচিহ্নকে বলিত "শীশ্-মহল"। কিন্তু আমি মনে মনে বলিতাম—"ইহাই তাহার তসবীরের মূল্য"—ইহাই মৎকর্ত্তৃক গুলসানার "ঋণ-পরিশোধ।"

সম্পূর্ণ।